তীর্থদর্শন।

(তৃতীয় অংশ।)

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

শ্রীহরিচরণ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা।

৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট্;

রামনারায়ণ যন্ত্রে শ্রীকালীপ্রসন্ন বসু দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

শক ১৮১৪।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৬	বিজয়নগ্রামে	বিজয়নগরের
৬	৫	আমরা প্রথমে	আমরা
৬	৭	বিজয়নগ্রামে	বিজয়নগরের
৯	১৭	বন্দ্যোবস্ত	বন্দোবস্ত
১১	২	হইলে	করিলে
১২	৮	শত অষ্টোত্তরবার	অষ্টোত্তর শতবার
১২	১১	শিবায়ঃ	শিবায়
১৪	১১	শংশূদ্রের	সংশূদ্রের
১৭	১৯	বন্দ্যোবস্ত	বন্দোবস্ত
২৩	১	অরুচিকর	অরুচি
২৩	৫	সনক বিষ্ণুর শাপে	সনকমুনির শাপে
২৪	১৫	অর্ব্বভূত	ওঙ্কার
২৪	১৬	কুটস্থ	কূটস্থ
২৫	৮	প্রকৃত	প্রাকৃত
২৬	৬	দেহিরা	দেহীরা
২৬	৭	শরীরি	শরীরী
২৬	১০	মুক্তিপ্রদ ও সত্বগুণ সংসারপ্রদ,	মুক্তিপ্রদ। আবার সত্ব রজঃ ও তমোগুণ সংসারপ্রদ,
২৬	১২	ধনজতোক্ষ	অধোক্ষজ
২৬	১৯	ক্রূদ্ধ	ক্রুদ্ধ
২৮	১৬	হয় নাই	হই নাই
২৮	১৭	এই	এ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯	১৬	শ্রবনে	শ্রবণে
৩০	৯	দানবারী	দানবারি
৩০	১০	তিনি দেবগণের	দেবগণের
৩০	১২	রাক্ষসতনয়!	দৈত্যতনয়!
৩০	১৫	ভগবদ্	ভগবদ্ভক্ত
৩৪	১৭	অন্তর্দ্ধান হইলে	অন্তর্দ্ধান করিলে
৩৫	১২	বারিধীতে	বারিধিতে
৩৯	১৭	অক্ষরেখার উত্তর ১৫। ৯।৩ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত।	উত্তর ১৫।৯।৩ অক্ষরেখা ও পূর্ব্ব ৭৮।৪৬।৫৯ দ্রাঘিমায় অবস্থিত।
৪০	২	অহোবলা হয়, প্রমাণ হইতেছে যে,	অহোবল হয়, তবে প্রমা হইতেছে যে,
৪০	১৪	বিমনি পত্তন	ভীমনি পত্তন (সর্ব্ব এইরূপ।)
৪২	১১	অষ্টবিংশতি যুগের সপ্তুতিতম যুগ	অষ্টাবিংশতি যুগের সত যুগ
৪৩	৫	সম্বোধন	সম্বোধন
৪৪	৯	দেবীর	দেবের
৪৫	৪	চন্দনোনুলেপন	চন্দনানুলেপন
৪৭	১৭	দিয়াছি	দিয়াছিলেন
৪৮	১৬	যোল জন	ষোল জন
৫০	১	শ্রীশৈল	সিংহাচল
৫৯	১৭	নন্দরাজ	আনন্দরাজ
৬১	২	অপ্পাজী	সীতারাম
৬২	১১	নারায়ণ বাবুকে	নারায়ণ রাজুকে
৬২	১৪	বাবু	রাজু

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৫	১৯	পর্ব্ববৎ	পূর্ব্ববৎ
৬৬	১১	এবং আয়	এবং মিউনিসিপালিটীর আয়
৭১	হেডিং	সিংহাচল	বিজয়নগর
৭৭	১৩	অধোদিকে ব্রহ্মারমূর্ত্তি ও উর্দ্ধদিকে বিষ্ণুর মূর্ত্তি	অধোদিকে বিষ্ণুরমূর্ত্তি ও উর্দ্ধদিকে ব্রহ্মারমূর্ত্তি
৭৮	৩	এস্থরখালের	এল্লুরখালের
৭৮	৮	বকিংহাম গেটনামক	বকিংহাম পেটনামক (সর্ব্বত্র এইরূপ।)
৮০	১৪	৬৪০ অব্দে	৬৩৫ অব্দে
৮০	১৬	২০ মাইলের	৬০ মাইলের
৮৩	২	মেল্লুর	নেল্লুর
৮৪	১৩	ভবানক্ষার	ভবান্যম্মার
৮৫	২	১৫১৫ অব্দে	১৫৬৫ অব্দে
৮৫	১৩	১০৩ হইতে ১২২২	১০৩০ হইতে ২২২২
৮৬	১৫	এলোর	এল্লুর
৮৭	৪	বেজবাড়া	বিজয়বাড়া (সর্ব্বত্র এইরূপ)
৮৯	১২	পাপবিশাল	পাপবিনাশন
৯২	৫	সর্ব্বাকৃতি	সর্পাকৃতি
৯৭	৩	নমুচি	বিত্র
৯৭	৭	বিষ্ণু ফেন নিক্ষেপ পূর্ব্বক উক্ত অসুরকে বধও	বিষ্ণু সমুদ্রফেনমধ্যে প্রবেশ করিলে ইন্দ্র তাহা নিক্ষেপ করিয়া উক্ত অসুরকে বধ করিল। বিষ্ণুও

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৯	৫	বেন্‌বাটাদ্রি	ব্যেঙ্কটাদ্রি
১০১	১২	শঙ্করাটী	শঙ্করাচারী
১০২	৯	দেবাদি	দেবাদিদেব
১০৬	১৯	বিজয়নগর	•
১০৬	২০	নগর	বিজয়নগর
১০৮	১১	প্রথিত	কথিত
১০৮	১৯	স্তম্ভে	স্তম্ভ
১০৯	১৮	বুক্কাবেল গাঁও	বুক্কারায়া বেলগাঁও
১১০	৪	আনয়ন করিয়া,	আনয়ন করিয়াছিলেন।
১১১	১৫	অন্ত্রদেশ	অন্ধ্র দেশ
১১১	১৮	কোন্দাপল্লী বিজয়-নগর রাজ্যের উ-ত্তর সীমা	বিজয়নগর রাজ্যের উ-ত্তর সীমা কোন্দাপল্লী
১২২	৫	আবুলগফুরের কাপ্তেন	আবুলগফুরের এবং কা-প্তেন
১২৩	১১	কুপ	কূপ
১২৪	৪	বধের জন্য	বধ হয়।
১২৪	১৬	নাবালক পুত্রের অধিকার	নাবালকত্ব
১২৯	৭	১৫।৭	১৫।৫২
১৩১	২	১৪৭৯ খৃঃ	১৪৮৯ খৃঃ
১৩২	১৫	৭০০৬ টাকা	৭৬০০ টাকা
১৩৩	১	একটি গবর্ণমেণ্ট, একটি মিশন্,	আটটি গবর্ণমেণ্ট, চারিটি মিশন্,
১৩৫	৬	ঢালু আছে।	ঢালু পোস্তা আছে।
১৩৭	১০	পোতাশ্রয় পাঞ্জিম	পোতাশ্রয় এবং পাঞ্জিম

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩৭	১৪	১৫॥০ মাইল	
১৩৮	১	জংসন ব্রিটিশ	জংসন পর্য্যন্ত ১৫ মাইল ব্রিটিশ
১৩৮	১৬	১২০০	১২০০০
১৪২	২	পরিদর্শক	পরিব্রাজক
১৪৪	১৭	ভানর্জানমেরির	বর্জিন মেরির
১৫০	১৯	বৎসর হইল	বৎসর হইতে
১৫৫	১	২০০০ হাজারের	২০ হাজারের
১৬১	২	উপবন	বিপণি
১৬৭	১২	কয়েক	এক
১৬৭	১৬	২০ মাইল। এ দিকে	২০ মাইল পূর্ব্বদিকে
১৭০	৫	গুহপ্রতিষ্টিত	গুহকর্ত্তৃক প্রথম পূজিত
১৭০	১৪	৩০এ অক্টোবর	পর দিবস ৩০শে অক্টোবর
২৭২	৩	অর্থাৎ কুক্কুরযান	০
১৭৫	৬	দ্রাক্ষারামা	দক্ষারাম (সর্ব্বত্র এইরূপ)
১৭৭	৩	তথায়	তথা হইতে ২০মাইল দূরে
১৮০	৭	করিঙ্গবন্দর	তীর্থালমুণ্ড
১৮০	৮	করিঙ্গর	তীর্থালমুণ্ডের
১৮০	১১	প্রায়শ্চিত্ত করিলে কোটীগুণ ফল লাভ হয়।	যে যাহা করিবে তাহার কোটিগুণে বৃদ্ধি হইবে
১৮২	১৪	কটাপে কল	কপাটে কল
১৮৬	১৫	(পশ্চিম ঔপকূলিক)	(পূর্ব্ব ঔপকূলিক)
১৯৬	১০	হস্তেগত	হস্তগত

ভূমিকা।

তীর্থদর্শনের তৃতীয়াংশ প্রকাশিত হইল; ইহাতে দাক্ষিণাত্যের কতিপয় প্রসিদ্ধ স্থানের বিবরণ প্রদত্ত হইল; তন্মধ্যে বিশাখপত্তন তন্নামক ডিষ্ট্রীক্টের রাজধানী; বিজয়নগর তন্নামক রাজাদিগের আবাসভূমি। বিশাখপত্তনের অন্তর্গত 'সিংহাচলে' দৈত্যপ্রবর প্রহ্লাদ 'বরাহ-নৃসিংহস্বামীর' মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। বিজয়-নগরের অন্তর্গত 'পদ্মনাভে' শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব-দিগকে দর্শন দেন। বিজয়নগর হইতে ৭ মাইল দূরে রামতীর্থে শ্রীরামচন্দ্র অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পীঠাপুরে 'পদগয়া', চামার্ল-কোটার নিকট কুমারারামে 'ভীমেশ্বর', রাজ-মহেন্দ্রীতে কোটিলিঙ্গ, গোদাবরীতে 'কোটি-ফলী' 'দক্ষারাম' ও 'ভদ্রাচল', বিজয়বাড়াতে 'কনকদুর্গা', মঙ্গলগিরিতে 'নরসিংহস্বামী, হাম্পিতে 'পদ্মাবতীশ্বর' ও ঋষ্যমুকাদি, ধার্ব্বারে 'হনুমন্তস্বামী' এবং বেণুগ্রামে কল্মেশ্বরাদি হিন্দু-দিগের তীর্থ। উন্দাবল্লী কৃষ্ণা আনিকটের দুই মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা এক সময়ে হিন্দু-তীর্থ ছিল; এক্ষণে যবনের অত্যাচারে নষ্ট হইলেও, হিন্দুর পূর্ব্ব-কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে।

তথায় অনন্তশয়নে বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শনের উপযুক্ত
মর্ম্মগোয়া ও পাঞ্জী পর্টুগিজদিগের ভারতরাজ্যে
রাজধানী; গোয়াইজদিগের আচার ব্যবহা
দেখিতে হইলে, তথায় যাওয়া আবশ্যক। হুবলি
লিঙ্গায়ৎদিগের তীর্থস্থান। বিজয়নগরে মাধবা
চার্য্য ষড়্দর্শন সংগ্রহ করেন এবং তাহার অনুজ
ভ্রাতা সায়ণাচার্য্যের তত্ত্বাবধানে ঋগ্বেদ-ভাষ
প্রণয়ন করেন। বিজয়পুর এক সময়েহিন্দুতীর
ছিল। কিছুকাল পরে ইহা আদিলসাহীদিগের
রাজধানীতে পরিণত হয় এবং এক্ষণে তাহাদিগেরই
স্মৃতি জাগরূক করিয়া দিতেছে; সকল স্থানের
পৌরাণিক প্রবাদ যথাসাধ্য সংগৃহীত হইয়াছে।
স্কন্দপুরাণান্তর্গত ভীমখণ্ডে দক্ষারামের মাহাত্ম্য
এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত গৌতমীমাহাত্ম্যে গোদা-
বরীর, সপ্তগোদাবরী-সঙ্গমের, কোটিফলীর ও ভদ্রা-
চলের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। তত্তৎ স্থলের
উৎপত্তি বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। এক্ষণে,
মহোদয়গণ! পূর্ব্বের ন্যায় তীর্থদর্শনের তৃতীয়াংশ
পাঠ করিলে শ্রমকে সফল জ্ঞান করিব।

শ্রী—

সূচীপত্র।

পরিশিষ্ট।

তীর্থদর্শন

(তৃতীয় অংশ।)

নামক বদলি উপলক্ষে মাদ্রাজ হইতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ নেবিগেশন্ কোম্পানীর গোয়ালপাড়া ষ্টীমারযোগে বিশাখপত্তনে আসিতে বাধ্য হই। ১৮৯০ খৃঃ ১৩ই আগষ্ট বুধবারে আহারান্তে ষ্টীমারে উঠি এবং শনিবারে বিশাখপত্তনে আসিয়া পৌঁছি। এই আমাদের প্রথম কালাপানিতে ষ্টীমারে যাত্রা। আমরা তিন দিবস ষ্টীমারে বাস করিয়াছিলাম। সমুদ্র যাত্রায় আমোদ ও কষ্ট দুইই আছে। নীলাম্বু দর্শন ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে করিতে আসাই আমোদ, কিন্তু স্বধর্ম্মনিরত হিন্দুদিগের আহারাভাবই কষ্ট। আমরা বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ষ্টীমারে পাকশাক করিয়া আহার করিয়াছিলাম, তাহাতে কষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছিল। ডেক্-আরোহী গরিব যাত্রীদিগের বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে, তাহারা দিবসে না পায় বসিতে, রাত্রে না পায় শুইতে, ইহার উপর আবার খালাসী অবতারদিগের অত্যাচারের ক্রুটি নাই। অহিন্দু ডেক্-যাত্রীরা অর্দ্ধ টাকা খরচ করিলে, দুই বেলা অন্ন আহার

পাইয়া থাকে। হিন্দু ডেক্-যাত্রীরা আপন আপন সঞ্চিত ফল, মিষ্টান্নাদিতে কোন প্রকারে দিন-যাপন করে। ষ্টীমার রাত্রে চলিত, দিনে বন্দরে নোঙ্গর করিয়া থাকিত। বৃহস্পতিবার মসূলিপত্তন বন্দরে এবং শুক্রবার কাকনাড়া বন্দরে ধরিয়াছিল। বৃহস্পতিবার রাত্রে হাওয়া উঠিয়া একপশলা বৃষ্টি হইয়া যায়, সেই সময়ে জাহাজ বেশ দুলিয়াছিল। আমরা নূতন যাত্রী হইলেও সমুদ্র-পীড়া, বা গা বমী বমী করা, কিংবা জল-বমি হওয়ার কষ্ট জানিতে পারি নাই। ডেক্-যাত্রী-দিগের মধ্যে অনেকেই সেই কষ্টে ভুগিতে হইয়াছিল। দূর হইতে বিশাখপত্তনের সুপ্রসিদ্ধ ডল্‌ফিন্-নোজ্ পাহাড়ের শিরোদেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাহাড়ের অর্দ্ধ মাইল দূরে জাহাজ নঙ্গর করিলে, আমরা বোটে করিয়া পোর্ট আফিসের ঘাটে আসিয়া নামিয়াছিলাম।

ঘাটের উপর পোর্টআফিসের ইমারত, ইহার উত্তর-দিকে এক পাহাড়শৃঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মতের তিনটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ১ম,—পাহাড়ের উপর পূর্ব্বদিকে কোন মুসলমান সিদ্ধ পুরুষের সমাধির উপর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আপামর সাধারণ লোকের বিশ্বাস বঙ্গোপসাগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উপর উক্ত দার্গা

সাহেবের সম্পূর্ণ আধিপত্য আছে, প্রত্যেক দেশীয় অর্ণবপোত সমুদ্রাভিমুখে যাত্রাকালীন এবং প্রত্যাগমন সময়ে তিনবার আপন আপন বোটের পতাকা উঠাইয়া ও নামাইয়া দার্গা সাহেবকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং প্রত্যেকেই সমুদ্রযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রৌপ্যনির্ম্মিত প্রদীপ প্রদান করিয়া থাকেন, প্রত্যেক শুক্রবারে দার্গার সম্মুখে দীপাবলী দেওয়া হইয়া থাকে; দার্গাটী সমৃদ্ধিশালী তাহার সন্দেহ নাই। ২য়,—এই দার্গার পশ্চিমদিকে পাহাড়ের উপর হিন্দুদিগের বেঙ্কট-স্বামীর মন্দির। বিশাখ পত্তনের হিন্দু-ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা তিরুপতিস্বামীর অনুকরণে উহাতে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৩য়,—পাহাড়ের সর্ব্ব পশ্চিমদিকে রোমান-কেথলিক-চার্চ। ইহা কোন্ সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা অবগত নহি।

বন্দরের ঘাট হইতে উত্তরদিকে বিশাখপত্তন সহর। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিশাখ-স্বামীর অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়ের নাম হইতে সহরের নামকরণ হইয়াছে। কার্ত্তিকেয়-স্বামীর মন্দির এক্ষণে সাগর-গর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে, যে স্থানে ঐ মন্দির ছিল, তথায় অদ্যাপি হিন্দুরা যোগ উপলক্ষে সাগর স্নান করিয়া থাকেন। সহরের নাম

হইতে জেলারও নামকরণ হইয়াছে। এই জেলা পূর্ব্বে কলিঙ্গ দেশের অন্তর্গত ছিল। প্রথমে পাণ্ডববংশীয় শ্রী-কা-কোল রাজার অধীনে ছিল, তৎপরে অঙ্করায়-বংশীয় মাহেন্দ্রী রাজাদিগের অধীনে ছিল। তদনন্তর উড়িষ্যার গজপতি রাজাদিগের অধীনে আইসে। ষষ্ঠ-দশ শতাব্দীর মধ্যে গোলকন্দার কুতবশাহীবংশীয়। ৪র্থ,—বাদসাহ এব্রাহিম্‌ শ্রী-কা-কোল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লয়েন, তদবধি মুসলমান শাসনকর্ত্তা শ্রী-কা-কোল থাকিয়া, বিশাখপত্তন শাসন করিত। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশাখপত্তনে প্রথম ইংরাজেরা বন্দর স্থাপন করেন। ১৬৭৯ খৃঃ আরঙ্গজেব বাদসাহের সহিত ইংরাজ বণিকদিগের মনান্তর ঘটিলে, ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে মুসলমান প্রতিনিধি বিশাখপত্তনে কোম্পানির কর্ম্মচারিদিগকে বন্দী করিয়া, কুঠী লুঠপাট করিয়া লয়েন, কিন্তু পর বৎসর জুলফিকর-খাঁ বাদসাহের হইয়া, গোলকন্দার সুবার অন্তর্গত মান্দ্রাজ, মসলিপত্তন্‌, মদপল্লম্‌, বিশাখপত্তন্‌ প্রভৃতি সমুদ্রতীরে ইংরাজ কোম্পানীকে অবিবাদে বাণিজ্য করিবার আদেশপত্র প্রদান করেন। পরে ১৬৯২খৃঃ এপ্রেল মাসে জুলফিকর-খাঁ বিশাখপত্তন-বন্দরে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া,

বহিঃশত্রু হইতে কোম্পানিকে সম্পত্তি রক্ষা করিবার আদেশপত্র প্রদান করিলে, তাহারা তথায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ১৭৫৭ খৃঃ বুসী সাহেব কর্ণাটিকের শাসনকর্ত্তা হইয়া, ইংরাজদিগের নিকট হইতে বিশাখপত্তন কাড়িয়া লয়। পর বৎসর বুসী হাইদ্রাবাদ অভিমুখে গমন করিলে, বিজয়নগ্রামে আনন্দরাজ ফরাসিদিগের হস্ত হইতে বিশাখপত্তন কাড়িয়া লয়েন, কলিকাতা ও মান্দ্রাজ হইতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে সংবাদ দিয়া আনাইয়া ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে মিঃ জনষ্টনের হস্তে বিশাখপত্তন দুর্গ সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই অবধি বিশাখপত্তন ইংরাজ শাসনাধীনে রহিয়াছে। ১৭৮৯ খৃঃ নিজাম্ সলাবৎ-জঙ্গের সহিত মসূলিপত্তনে যে সন্ধি হয়, তাহাতে কৃষ্ণা হইতে শ্রী-কা-কোল পর্য্যন্ত ইংরাজের রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

বিশাখপত্তনের পুরাতন দুর্গের সীমার মধ্যে ডিষ্ট্রীক্ট জজের কোর্ট, কলেক্টরের কোর্ট, ট্রেজরি মাজিষ্ট্রেট কোর্ট, সব্ মাজিষ্ট্রেট কোর্ট, ডিষ্ট্রীক্ট মুনসেফ্ কোর্ট, পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ্ আফিস্ ও ফ্লেগষ্টাফ্ বিদ্যমান রহিয়াছে। এখন হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে সমুদ্রতীরে বল্‌টেয়ার নামক স্থানে ইংরাজদিগের সৈন্যনিবাস ছিল।

এক্ষণে জেলার সাহেবরা তথায় বাস করিয়া থাকে; এবং ডিবিসনেল পব্‌লিক ওয়ার্কস্‌ ইঞ্জিনিয়ার অফিস ও ইষ্ট কোষ্ট রেলওয়ের হেড্‌ আফিস্‌ হইয়াছে।

বল্‌টেয়ারে বাসোপযোগী গৃহ না পাওয়াতে, আমরা প্রথমে বিশাখপত্তনের পেগোডা ষ্ট্রীটের গোসাল্‌-সেদা নামক পুরাণ উদ্যানবাটীতে থাকিতে বাধ্য হইয়া-ছিলাম। পূর্ব্বে ইহাতে বিজয়নগ্রামে রাজারা আসিয়া অবস্থিতি করিতেন। পরে বল্‌টেয়ারে তাঁহাদের বাটী তৈয়ার হইলে, ইহা বিক্রয় হইয়া যায়। ঘরগুলি প্রশস্ত হইলেও মেরামত সাপেক্ষ। বিশাখপত্তনের জল বায়ু খুব উত্তম নহে, এখানকার জল স্বভাবতঃ লবণাক্ত, কেবল কয়েকটি মাত্র কূপে মিষ্টজল পাওয়া যায়। সহরটী সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়া, বিশুদ্ধ বায়ু আট-মাস পশ্চিম-দক্ষিণদিক হইতে বহিয়া থাকে এবং চারি মাস পূর্ব্ব-উত্তরদিক হইতে বহিয়া থাকে। অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে এখানে ঘোর বর্ষা হইয়া থাকে। থার্ম্মো-মিটার ৯০ নব্বই ডিগ্রীর উপরে উঠেনা এবং ৬০ ডিগ্রীর নীচে নামেনা, কিন্তু সমুদ্রতীর হইতে দূরে থার্ম্মোমিটার ১০০ একশত ডিগ্রীর উপরও উঠিয়া থাকে। এইস্থানে ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা, বসন্ত, কুষ্ঠ এবং শ্লীপদ (গোদ)

ইত্যাদি নানাবিধ পীড়া বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

খাদ্য সামগ্রী বঙ্গদেশের ন্যায়। উত্তম আতপ তণ্ডুল আটসের হইতে দশসের, ঘৃত দেড়সের হইতে একসের তিন পোয়া, চিনি চারিসের হইতে ছয়সের, দাল নয়সের হইতে তেরসের, ময়দা আটসের, দুগ্ধ আটসের হইতে দশসের টাকায় বিক্রয় হয়। তরকারি আলু, বেগুন, ছোট ছোট পটল, উচ্ছে, করলা, ঝিঙে, কাঁচাকলা, মোচা ও নানাবিধ শাক্ সবজী যথেষ্ট পাওয়া যায়। নারিকেল, আতা, পেয়ারা, বাতাবি, গোঁড়া ও পাতিনেবু ইত্যাদি নানাবিধ ফলও পাওয়া যায়। ভাঙ্গন, বাটা, ইলিস্, বিবিধ প্রকার চিঙ্গড়ি ও নানা চিত্র বিচিত্রবিশিষ্ট ছোট ছোট মৎস্যও যথেষ্ট পাওয়া যায়। সমুদ্রতীরে প্রায় সকল স্থানেই ধীবর-দিগের বাস, তাহারা অসীম সাহসী, সামান্য কাষ্ঠের ভেলা করিয়া, সমুদ্রের উপর ৩।৪।৫ মাইল পর্য্যন্ত যাইয়া মৎস্য ধরিয়া থাকে। কলিকাতায় ঘুসুড়ির চড়ায় বর্ষাকালে বানের যেরূপ উর্ম্মি লাগিয়া থাকে, সমুদ্র কিনারার সর্ব্বদাই সেইপ্রকার উর্ম্মি হইতেছে। সেই উর্ম্মির উপর দিয়া কাষ্ঠভেলা দ্বারা উহারা অনায়াসে

যাতায়াত করিতেছে, উহা কখন একদিক মানুষ প্রমান উঠিতেছে, অপরদিক জলের নিম্নে যাইতেছে, অথচ তাহারা টলিতেছে না, পায়ের উপর ভর দিয়া খাড়া হইয়া থাকে।

সমুদ্রে বড় বড় কচ্ছপ ধরা পড়ে, তাহাদের পৃষ্ঠের খুলির আয়তন দুই হইতে তিন ফুট হইয়া থাকে। উহা মেছনি ও মাটিকাটা কুলিদিগের ঝুড়ির কার্য্য করিয়া থাকে।

এখানে হিন্দুদিগের চারিটি প্রধান দেবালয় আছে। প্রথমে যে দেবালয়টি পেগোডা নামক ষ্ট্রীটের ধারে তাহা কোদণ্ড-রামস্বামীর, তথায় ধনুক হস্তে রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতা বিরাজমান্ রহিয়াছেন।

অন্ধ-পল্লীনিবাসী চণ্ডীক-যজ্ঞ-রাও এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি রাজা গোদানারায়ণ গজপতি রায়ের পিতার মাতামহ ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার নিকট সম্বন্ধীয় কোন আত্মীয় এ, ব, নরসিংহ রায়ের অধিকারে আসিয়াছে। প্রতিষ্ঠাতা দেবালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বত্রিশ শত টাকা আয়ের দুইখানি গ্রাম অর্পণ করিয়া যান। দেবের নিত্য সেবার নিমিত্ত চারিজন তৈলঙ্গী বৈদিক, দুই দ্রাবিড় বৈদিক, চারিজন অর্চ্চক,

দুইজন রসুইয়া ব্রাহ্মণ, চারিজন বাদ্যকর, চারিজন গায়ক, আটজন বাহক ও চারিজন মশালধারী নিয়মিত মাসিক বেতনে নিযুক্ত আছে। প্রত্যহ সাতসের চাউলের অন্ন প্রস্তুত হইয়া, ভোগ এবং সকালে ও রাত্রে নিয়মিত রূপে বেদপাঠ ও হোম হইয়া থাকে। আমরা সন্ধ্যার সময় পূজা ও পূজার নিয়ম দেখিয়া ও বেদগান শুনিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলাম।

২য়। প্রধান রাস্তার উপর জগন্নাথস্বামীর মন্দির। এখানকার গরুড় পদ্মনাভ নামে কোন বর্দ্ধিষ্ঠ বণিক পুরুষোত্তমের জগন্নাথদেবের অনুকরণে এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তিনিই নিত্য সেবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। আষাঢ় মাসে শুক্ল দ্বিতীয়ায় দেবের রথোৎসব হইয়া থাকে।

৩। ঈশ্বরস্বামী অর্থাৎ শিবমন্দির। এখানকার বণিকগণ ইহা স্থাপন করেন। তাঁহারা চাঁদা করিয়া দেবের নিত্য সেবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন। এখানেও বেদপাঠের উত্তম বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যহ অভিষেকের সময় যজুর্ব্বেদী "নমকং চমকং" মন্ত্র পাঠ হইয়া থাকে। দেবীর পূজার সময় 'শ্রীসূক্ত', 'ভূসূক্ত' পাঠ এবং কর্পূরালোকে আরতির সময় 'পরাহিত'

মন্ত্র পাঠ হইয়া থাকে। মন্ত্রপুষ্প প্রদান সময়ে "মন্ত্রপুষ্প" পাঠ হয়, এইরূপ সকল মন্দিরেই হয়, তবে বিষ্ণুমন্দিরে অভিষেকসময়ে 'পুরুষসূক্ত' পাঠ হইয়া থাকে। বিষ্ণু ও শিবমন্দিরে দেবীপূজায় একই প্রকার 'শ্রীসূক্ত' পাঠ হইয়া থাকে।

৪র্থ। * বেঙ্কটস্বামীর মন্দির। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

এখানে অনেক স্মার্ত্ত বৈদিক পণ্ডিত বাস করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই যজুর্ব্বেদীয় আপস্তম্ভ-গৃহ্য-সূত্র-মতাবলম্বী এবং অনেকেই বেদ ও উপনিষদ্ উত্তম-রূপ আবৃত্তি করিতে পারেন। তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া, কয়েক দিবস বেদপাঠ শুনিয়াছিলাম। তাঁহারা তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, নমকং, চমকং, অরুণসূক্ত, পুরুষ-সূক্ত, শ্রীসূক্ত, ভূসূক্ত, অশ্বমেধ প্রকরণ ও আশীষ-মন্ত্র সমস্বরে আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাঁহারা অতি অল্পেই সন্তুষ্ট হন। নবরাত্রের সময়ে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী এই চারি দিবস দুই ঘণ্টা করিয়া স্বস্তি পাঠ করিয়াছিলেন।

বেদপাঠ করিবার সময় ব্রাহ্মণেরা দুই সারিতে

---

* Vencat.

বিভক্ত হইয়া উপবেশন করেন। একদল একচরণ আবৃত্তি হইলে, অপর দল দ্বিতীয় চরণ আবৃত্তি করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহারা শ্বাস লইতে সময় পান ও দুই হইতে চারি ঘণ্টা অনায়াসে বেদগান করিয়াও ক্লান্ত হইয়া পড়েন না। দশটি বৈদিক একত্রে বেদ গান করিতে থাকিলে, পাঁচশত ফুট অন্তর হইতে উক্ত বেদধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বেদ পাঠের প্রথা নাই; বিবাহাদি কার্য্যে যে সকল বৈদিক মন্ত্র ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাও প্রকৃতরূপে উচ্চারিত হয় না। এপ্রদেশের অর্চ্চকেরা সংস্কৃত না জানিলেও, পূজার বৈদিক মন্ত্র যথা,—নমকং চমকং পুরুষসূক্ত, ভূসূক্ত, মন্যুসূক্ত, পরাহিতসূক্ত ও মন্ত্রপুষ্পাদি অতি পরিষ্কাররূপে পাঠ করিয়া থাকেন। বেদের চর্চ্চা যাহা কিছু এই প্রদেশেই আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! তৈলঙ্গ ও তামিল প্রদেশে কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক, তাঁহারা আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র মানিয়া চলেন।

এইস্থানে বলা আবশ্যক, শারদীয় পূজাকে এ প্রদেশে নবরাত্র ব্রত কহিয়া থাকে। আমরা যদিও ঠিক নবরাত্র ব্রত করিতে পারি নাই, কিন্তু ষষ্ঠী হইতে

নবমী পর্য্যন্ত যথানিয়মে পূজা করিয়াছিলাম। সাতজন বৈদিক ব্রাহ্মণ ব্রতী ছিলেন। তন্মধ্যে একজন পৌরহিত্য করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি তন্ত্রধারক হইয়াছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ললিত-পারায়ণের অর্থাৎ অগস্ত্যকৃত হয়গ্রীব মূর্ত্তির স্তোত্র প্রত্যহ তিনবার পাঠ করিয়াছিলেন। চতুর্থ ব্যক্তি ঋগ্বেদোক্ত মন্যুসূক্ত চারিদিনে অষ্টাধিক শতবার পাঠ এবং পঞ্চম ব্যক্তি প্রত্যহ শত অষ্টোত্তরবার শ্রীসূক্ত পাঠ করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ ব্যক্তি মহিম্ন ঋষি ওরফে পুষ্পদন্তকৃত মহিম্নস্তব চারি দিবসে বার বার পাঠ করেন। সপ্তম ব্যক্তি পঞ্চ অক্ষরী শিবমন্ত্র "ওঁ নমঃ শিবায়ঃ" চারি দিবসে দ্বাদশ সহস্রবার ধ্যান করিয়াছিলেন। স্বর্ণপ্রতিমা স্থাপন করিয়া, ষোড়শোপচারে পূজা হইয়াছিল। নৈবেদ্যের হাঙ্গামা বিশেষ ছিলনা, রাত্রিতে পূজান্তে অন্নের প্রধান ভোগ হইত। সন্ধ্যার সময় বারজন বেদগায়ক স্বস্তি পাঠ করিতেন।

রবিবার সন্ধ্যাকালে, তাঁহারা চিত্তি, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভৃগুবল্লী ও নারায়ণ উপনিষদের প্রথমাংশ গাইয়াছিলেন। সোমবার সন্ধ্যার সময় 'নক্ষত্র-ইষ্টি' ও 'অগ্নিহোত্র পন্নম্‌' গাইয়াছিলেন। মঙ্গলবার রাত্রে

পুরোডাশের প্রথম অর্দ্ধ ও নারায়ণ উপনিষদের অবশিষ্টাংশ, 'বিশ্বরূপ ঘন' গাইয়াছিলেন। বুধবারে 'অরুণম্', 'অপবদন্তি ক্রমন্', যজুর্ব্বেদ ব্রাহ্মণের তৃতীয় অষ্টকের প্রথম ও দ্বিতীয় 'পন্নম্', দ্বিতীয় অষ্টকের প্রথম ও পঞ্চম 'পন্নম্', চতুর্থ অষ্টকের সপ্তম্ 'পন্নম্,' ইত্যাদি অরুণয়ের প্রথম পন্নম্ সগুমিত মন্ত্রের প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় পন্নম্ যথাক্রমে গাইরাছিলেন।

উক্ত প্রকার বেদগানকে এপ্রদেশে স্বস্তিবচন কহে। স্বস্তি গান শেষ হইলে, আরতি হইত, তৎপরে মন্ত্র-পুষ্পের সহিত শ্রীসূক্ত ভূসূক্ত পাঠান্তে পুষ্পগুলি প্রদানান্তর পূজা শেষ হইত। তৎপরে আমন্ত্রিত সকলে মিষ্টান্ন গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলে, পূর্ব্বোক্ত অন্নের মহানৈবেদ্য ভোগ দেওয়া হইত, তাহার পর ব্রতীগণ উহা আহার করিতেন।

দশমীর দিবসে পঞ্চাশজন বৈদিক ব্রাহ্মণ আসিয়া, নিরঞ্জণ কার্য্য সমাধা করেন। তাঁহারা পৃথক ঘরে অন্নাদি পাক করিয়া, দেবীকে ভোগ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎপরে সকলে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া সমস্বরে বেদ গাইয়া অন্ন আহার করিলে, নিরঞ্জণ কার্য্য সমাধা হইল।

এখানে বলা আবশ্যক, সপ্তশতী পারায়ণের পণ্ডিতাভাবে সপ্তশতী পাঠ হয় নাই, যেহেতু বৈদিক ব্রাহ্মণেরা পুরাণাদিতে অনভিজ্ঞ।

এ প্রদেশে বৈদিকদিগের মধ্যে পশুবলির প্রথা নাই, তবে কদাচ পুত্রেষ্টি কামাদিযাগে বলি হইয়া থাকে।

দক্ষিণদেশে অনেকগুলি দেবালয় সন্দর্শন করিয়া, অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কোথাও পশুবলির কথা শুনি নাই। বিজয়নগরের মহারাজের বাটীতে নবরাত্রব্রতে তিন দিবসে তিনটি পশুবলি হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে তৈলঙ্গী বৈদিক ব্রাহ্মণ লিপ্ত থাকেন না, উৎকল ব্রাহ্মণেরা বলিকার্য্য সমাধা করেন। মহিস্থরে চামুণ্ডা দেবীর মন্দিরে নবরাত্র ব্রতে অথবা অন্য কোনও সময়ে পশুহনন হয় না। নারায়ণবনের মহিষমর্দ্দিনীর ও রামেশ্বরের মহাভদ্রকালীর মন্দিরে পশুবলি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু পূজারী ব্রাহ্মণ একার্য্যে লিপ্ত থাকেন না। পূর্ব্বে গোয়ালিয়ারে অবস্থানকালে জানিতাম যে, সেখানেও ব্রাহ্মণেরা পশু বলি করেন না। এক্ষণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, মহারাষ্ট্র দেশ হইতে দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বলিদানের প্রথা

নাই; কেবল উৎকল দেশ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ও উত্তর ভারতে এ প্রথা প্রচলিত আছে।

অন্যত্র বলিয়াছি, শ্রীরামানুজ মতাবলম্বী শূদ্রেরা, ছাগ, কুক্কুট, মেষ এবং সর্ব্বপ্রকার মৎস্য যথেষ্ঠ পরিমাণে ব্যবহার করে।

এ অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ পরিশ্রমশীলা, তাহারা আপনারাই গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা অপর জাতীর জলগ্রহণ করেন না, ব্রাহ্মণী দেবীরা জলাশয় হইতে মস্তকে করিয়া জল আনয়ন করেন, কিন্তু কৃষ্ণাজেলার স্ত্রীলোকেরা স্কন্ধে করিয়া জল আনয়ন করে। ব্রাহ্মণ ও শৎশূদ্রের স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্য পথ দিয়া দেব দর্শনে ও পরস্পরের বাটীতে যাতায়াত করেন, কিন্তু তামিল দেশের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় সকল কার্য্যে পথে বাহির হন না।

তৈলঙ্গ দেশে ব্রাহ্মণীদিগের বস্ত্র-পরিধান-প্রণালী দ্রাবিড় ব্রাহ্মণীদিগের তুলনায় ভিন্ন, ইহারা কাছা দিয়া থাকে কিন্তু কাছা দিবার প্রথা অন্য প্রকার এ জেলায় কঞ্চুক অর্থাৎ কাঁচুলি পরিধানের প্রথা না থাকিলেও, যাঁহারা গোদাবরী ও কৃষ্ণাজেলা হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের স্ত্রীগণ উহা পরিধান করেন। এখানে বলা

আবশ্যক এইস্থান হইতে উত্তরাভিমুখে কঞ্চুকের ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে। মস্তক অবগুণ্ঠন করিবার প্রথা নাই, সধবাদিগের ললাটে সিন্দূরের পরিবর্ত্তে কুঙ্কুম ও গলায় মঙ্গলসূত্র ও বাম হস্তে লৌহের পরিবর্ত্তে পদদ্বয়ের মধ্যমায় রূপার বা কাংসের কড়া ব্যবহার হইয়া থাকে।

দেশীয় বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এই স্থানে একটি হাইস্কুল এবং এফ, এ, পর্য্যন্ত একটি কলেজ আছে। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী নিঃসহায় বালক বালিকাদিগের জন্য দুটিই অরফেনেজ আছে, তাহার একটিতে একশত ত্রিশটি বালক ও অপরটিতে একশত কুড়িটী বালিকা শিক্ষা পাইতেছে। অপর যে দুইটি মিসন্‌স্কুল আছে, তাহাতে সকল বর্ণের বালকেরা শিক্ষা পাইয়া থাকে। কলেজবাটীর সন্নিকটে সাধারণ দরিদ্রাবাস আছে। তথায় শতাধিক অন্ধ, খঞ্জ, আতুর এবং বৃদ্ধ জাতিনির্ব্বিশেষে গ্রাসাচ্ছাদন পাইয়া থাকে।

একটি হস্‌পিটেল আছে, ইহাতে আপামর সাধারণে যথেষ্ট চিকিৎসা এবং ঔষধাদি পাইয়া থাকে।

এই স্থান হইতে চারি মাইল দূরে লবণের কারখানা দেখিতে যাই। এপ্রেল হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত কার

খানার কার্য্য চলিয়া থাকে, অতএব আমরা লবণ প্রস্তুত হওয়া দেখিতে পাই নাই। খাল খনন পূর্ব্বক সমুদ্রের জল আনাইয়া প্রতি বৎসর উক্ত কয়েক মাসের মধ্যে দুইলক্ষ হইতে আড়াই লক্ষমণ লবণ প্রস্তুত হয়, লবণ তৈয়ার করিতে প্রতি মণে দেড় আনা খরচ হয়। কারখানা হইতে বাজারে আসিতে প্রতিমণ দুই টাকা এগার আনা দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট ডিউটী অর্থাৎ কর আড়াই টাকা হিসাবে লয়েন বাকি তিন আনার মধ্যে পব্লিক্ ওয়ার্কস্-নালা মেরামত ও অস্থায়ী চালার নিমিত্ত ইংরাজী চারি পাই এবং কন্ট্র্যাক্টর দুই আনা আট পাই পাইয়া থাকেন। ঠিকাদারও ফিমণে খরচ বাদে এক আনা লাভ করিতেপারে মাত্র। গবর্ণমেণ্টের মনপলি (একচেটীয়া) নামে যে লবণের কারখানা আছে, সরকারের তত্ত্বাবধানে তাহাতে প্রায় একলক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হয়। ইহার উদ্দেশ্য এই, ঠিকাদারকে দেখান হইতেছে যে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং লবণ প্রস্তুত করিতে সমর্থ এবং যদি ঠিকাদার লবণ প্রস্তুত করিতে নিয়মিত যত্ন না করে, তাহা হইলে তাহাদের ঠিকা কাড়িয়া লইয়া গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং নিজ বন্দোবস্তে প্রস্তুত করিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রি করিবেন উক্ত কারখানা হইতে গবর্ণমেণ্টের

ছয় হাজার হইতে দশ হাজার টাকা আয় হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট ডিউটী হিসাবে প্রতি বৎসর লবণ হইতে পাঁচলক্ষ টাকার উপর পাইয়া থাকে। যদি লবণের কর দিতে না হইত, তাহা হইলে অর্দ্ধ আনায় একসের পাওয়া যাইত।

ডল্‌ফিন্‌-নোজ নামক পাহাড়ের উপর অনেকগুলি পাকা বাটীর চিহ্ন রহিয়াছে, উপরে উঠিতে পরিষ্কার পাকা রাস্তাও আছে। ঐ স্থানে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। এখন তাহার পরিবর্ত্তে তথায় এ, বি, নরসিংহরায়ের ফ্ল্যাগ্ ষ্টাপ্ রহিয়াছে। উক্ত পাহাড়ের উপত্যকায় রাজা জি, ন, গজপতি রায়ের পুষ্পোদ্যান। এখানে কয়েকটী ঝরণা আছে, গ্রীষ্মকালে অনেকেই ঝরণার বিশুদ্ধ জলে স্নান করিতে আইসেন। পাহাড়ের উপর হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়।

এখান হইতে চারি মাইল দূরে সিংহাচলের পূর্ব্ব দক্ষিণ গায়ে একটী ঝরণা আছে, পূর্ব্বে ঐস্থানে মাধব স্বামীর মন্দির ছিল। এই ধারা পুণ্যতীর্থ বলিয়া অনেকে ইহাতে স্নান করিতে আইসেন, পর্ব্বতের যে স্থান হইতে ধারা গড়াইয়া আসিতেছে তথায় নানাবিধ সুশোভিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ থাকায় স্থানটি অতি

মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছে। আমরা এক দিবস উক্ত ধারায় স্নান করিতে গিয়াছিলাম, স্নানের সময় কোন বৈদিক ব্রাহ্মণ যথারীতি সঙ্কল্প ও তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। আমরা ধারায় স্নান করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। মাধবস্বামী হইতে (অথবা মধুরেব ইতি মাধব) মাধবধারা এই নাম করণ হইয়াছে। তথায় নিত্য বসন্ত বিরাজমান, ধারার অদূরে একটী গুহা আছে, সাধারণ লোকের বিশ্বাস অদ্যাপি ঐ গুহায় মাধবস্বামী বিদ্যমান আছেন। বিজয়নগরের বর্ত্তমান মহারাজের পিতামহ নারায়ণ রায়ু বারাণসী যাইবার পূর্ব্বে, মশালের আলোকের সাহায্যে উক্ত গুহায় প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মশালের আলোক পুনঃ পুনঃ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়েন।

বিশাখপত্তনের অন্তর্গত সিংহাচলে পদ্মনাভ বিজয়নগরের নিকট রামতীর্থ, ইত্যাদি কয়েকটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান সন্দর্শন করিয়াছিলাম। তাহাদিগের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ পশ্চাৎ লিখিত হইবে। দুই মাস মাত্র এইস্থানে অবস্থিতি করিয়া ছিলাম, অতএব বিশেষ কিছুই জ্ঞাত হইতে পারি নাই।

সিংহাচল।

১৮৯০ খৃঃ ১৩ই সেপ্টেম্বর শনিবার তারিখে ভগবান বরাহ-নৃসিংহস্বামীর সন্দর্শনে যাই। বিশাখপত্তন হইতে পশ্চিম-উত্তর ১০ মাইল দূরে সিংহাচল নামক পাহাড়ের পশ্চিম অংশে স্বামীর মন্দির। পূর্ব্বোক্ত মাধব-ধারা উক্ত পাহাড়ের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত, তথা হইতে স্বামী দর্শনে যাইবার নিমিত্ত বাঁধান সিঁড়ি আছে; পাহাড়ের নিম্ন ভাগ হইতে শিখরদেশ পর্য্যন্ত ১৮০০ ধাপ এবং শিখরদেশ হইতে পশ্চিমদিকে ৭০০ সাতশত ধাপ নামিলে সিংহাচল নামক পল্লীতে আসা যায়, যাঁহারা উক্ত ধাপ দিয়া উঠিতে সমর্থ তাঁহারাই মাধব ধারা হইয়া স্বামী সন্দর্শনে যাইতে পারেন। পশ্চিমদিক দিয়া উঠিবার যে সকল ধাপ আছে, তাহা প্রশস্ত এবং ১৫টি হইতে ২০টি ধাপের পর বিশ্রাম কারণ চাতাল আছে। আমরা যদিও ধাপের সংখ্যা গণনা করি নাই বটে, কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিলাম যে নিম্ন হইতে সিংহাচল পল্লীর সম্মুখের ফটক পর্য্যন্ত ৮৮০টি

মাত্র ধাপ আছে, আমরা উক্ত ধাপদিয়া উঠিয়াছিলাম। ধাপের ধারে ধারে অনেকগুলি ছোট ছোট ঝরণা দেখিতে পাওয়া যায়। অর্দ্ধেক রাস্তা পার হইলে হনুমন্তদ্বার নামক ফটকের নিকট পিচিকা ও আকাশধারা নামে দুইটী ঝরণা আছে, তাহার পর বেত্রবতী ও বেগবতী নামে দুই ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত ধারার মধ্যদিয়া অতি অল্প পরিমাণে জল নির্গত হইতেছে।

আমরা সিংহাচল পল্লীতে আসিয়া প্রথমে পশ্চিমবাহিনী গঙ্গাধারার দিকে গমন করি। বামদিকে গোদাবরী ও দক্ষিণদিকে চক্রধারা পার হইয়া গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম ধারার সন্নিকটে পৌঁছিয়া কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামের পর শরীর শীতল হইলে পুণ্যতোয়া পশ্চিমবাহিনী গঙ্গাধারায় অবগাহন করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছিলাম।

বরাহ- নৃসিংহস্বামীর আবির্ভাব ও তাঁহার পূজাপদ্ধতি ক্ষেত্রমহাত্ম্যে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা এস্থলে বলা আবশ্যক বোধে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। বরাহনৃসিংহদেব লক্ষ্মীর সহিত এই ক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিলে পর গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী [illegible] হইয়া

এই স্থানে আবির্ভূতা হইয়াছেন। এই গঙ্গা ধারায় স্নান করিয়া তর্পণ করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্র-তীর্থে শত ভার স্বর্ণ দানে যে ফল, এখানে সামান্য দানে সেই ফল। কার্ত্তিক মাসে গয়াধামে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যে ফল, এখানে একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে সেই ফল। অন্যত্র দশ হাজার গো দানে যে ফল, এস্থানে একটি গো দানে সেই ফল। মাঘ মাসের মকর সংক্রান্তিতে প্রয়াগের ত্রিবেণী স্নানের যে ফল, এখানে গঙ্গা ধারায় স্নান করিলে সেই ফল। তিন প্রহরে তিনবার গঙ্গা ধারায় স্নান করিলে কুষ্টরোগীও অব্যাহতি পাইয়া থাকে। প্রয়াগে ত্রিবেণীতটে ও গয়ায় ফল্গুনদীতটে ও বিষ্ণুপাদপদ্মে শ্রাদ্ধ এবং পিণ্ডদান করিলে যে ফল, এই ধারায় কন্যা মাসে পিতৃপক্ষে পিণ্ডদানে সেই ফল।

ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের বিষয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন এবং উহা মহাভারতে শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে সবিশেষ বর্ণিত থাকিলেও, সিংহাচলে ভগবানের আবির্ভাবের বিষয় বর্ণনা করিতে হইলে তদ্বিষয় পুনঃ প্রয়োজন হইতেছে। সেই প্রাচীন ভক্ত প্রবরের উৎপীড়নের কথা শুনিতে

বোধ হয় পাঠকদিগের অরুচিকর হইবে না; বিশেষ ভগবানের কথা পুরাতন হইতে পারে না।

পুরাকালে জয় বিজয় দ্বারপালদ্বয়, সনকাদি ঋষিদিগকে বিষ্ণু-আলয়ে প্রবেশ করিতে বাধা দেওয়ায় সনক বিষ্ণুর শাপে, হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ হিরণ্যাক্ষ গদা সাহায্যে ত্রিভুবন জয় করিলে, দেবতাদিগের হিত কামনায়, বিরিঞ্চি, ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে ভগবানের নাসারন্ধ্র হইতে মহাবিষ্ণু, ক্ষুদ্র বরাহরূপে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভয়ঙ্কর বরাহমূর্ত্তি ধারণ করেন। তদনন্তর পাতালপুরে গমন করিয়া দংষ্ট্রাঘাতে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন কনিষ্ঠের অকস্মাৎ মৃত্যু সংবাদে হিরণ্যকশিপু, বিষ্ণুদ্বেষী হইয়া ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশে বিন্ধ্যগিরির এক নিভৃত স্থানে অযুত বৎসর ঘোর তপস্যার পর পিতামহকে সন্তুষ্ট করিয়া অভিলষিত বরপ্রাপ্ত হইলে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ত্রিভুবন নিজ অধীনে আনিয়া একাধিপত্য স্থাপন করেন; এমন কি ইন্দ্র প্রভৃতি দিক্পালগণও তাঁহার আজ্ঞাকারী ছিলেন। প্রহ্লাদ নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। পঞ্চম বর্ষে মৌঞ্জীবন্ধনের পরই তাঁহাকে দৈত্যগুরু কাব্যের পুত্র ষণ্ডামার্কের

নিকট অধ্যয়নার্থ পাঠান হইয়াছিল। প্রহ্লাদ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও স্বভাবতই বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন প্রথমতঃ গুরু খড়িতে স্বরবর্ণ লিখিয়া প্রহ্লাদকে "নমঃ শিবায়" কহিয়া স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিতে কহিলে তিনি কিছুতেই উক্ত বাক্য উচ্চারণ করিলেন না অথবা বর্ণমালার অক্ষরও শিখিলেন না। তিন দিবস মিষ্ট বাক্য এবং ভয় প্রদর্শনের পর গুরু তাঁহাকে "নমঃ শিবায়" উচ্চারণ করাইতে অক্ষম হইয়া, হিরণ্যকশিপুকে তদ্বিষয় জ্ঞাপন করিলে, দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। পরে প্রহ্লাদ রাজসভায় উপস্থিত হইলে তিনি পুত্রকে অঙ্কে লইয়া মস্তক আঘ্রাণ করণান্তর মধুর ভাবে কহিলেন, পুত্র অদ্য গুরুসন্নিধানে কোন্ অক্ষর শিখিয়াছ? প্রহ্লাদ কহিলেন, ব্রহ্মবাচক প্রণব নামে যে অক্ষর তাহাই শিক্ষা করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত অন্য বর্ণ অক্ষর নহে। বাচ্য ও বাচক অক্ষর, অর্দ্ধভূত অক্ষর, আর কূটস্থ অক্ষরই নারায়ণ ও অত্যুত্তম, তাঁহার ধ্যান করিলে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে তাঁহার ধ্যান করে সে অনায়াসে ইহ ও পরলোক হইতে পরিত্রাণ পায়। যাহাকে বর্ণমালার অক্ষর কহিতেছেন তাহা শিক্ষা করিলে, ইহলোক কিম্বা পরলোক কিছুই প্রাপ্ত হওয়া

যায় না, ইহা প্রকৃত জানিয়া আমি বর্ণমালার অক্ষর ত্যাগ করিয়াছি। হে দেবতারিপু-বরীয়! "ওঁ নমঃ নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র ধ্যান করিলে অষ্টসিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। পিত! গুরু অন্য অক্ষর শিখাইতে চাহেন উহা শিখিতে আমার ইচ্ছা নাই। আপনিও "ওঁ নমঃ নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র ধ্যান করিতে থাকুন। যিনি উক্ত অষ্টাক্ষর মন্ত্রের শিক্ষা দেন তিনি গুরুর গুরু; আর যিনি নীতিমার্গ উপদেশ দেন তিনি প্রকৃত গুরু।

হিরণ্যকশিপু পুত্রের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঘৃতযুক্তাগ্নি সদৃশ জ্বলিয়া উঠিলেন; পরে পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! অতঃপর অঙ্ক হইতে প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, এই ক্ষুদ্র বালকের চেষ্টা দেখিলে। পরে পুত্রের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, রে মূঢ়! এই অচ্যুত ভক্তিপর বাক্য অনাকর্ণিত হইয়াও তুই কোথায় পাইলি, আমি তোর বাক্যে বিস্মিত হইয়াছি। গুরুর উপেক্ষায় শিশুর চিত্তবিপর্য্যয় হইয়া থাকে, তাহাই তোর ঘটিয়াছে। শিষ্যদিগকে তাড়ন দ্বারা শিক্ষিত না করিলে তাহারা ইষ্ট-সম্ভাষণ করিয়া বিগড়াইয়া যায়, বালকদিগকে আদর দেওয়া

উচিত নহে, তাহা হইলে তাহারা নষ্ট হইয়া যায় অতএব সর্ব্বদা তাড়ন করিলে সদ্গুণান্বিত হইবে; নীতিবেত্তারা এইরূপ কহিয়া থাকেন।

প্রহ্লাদ পিতার বাক্য শুনিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, বালক কি তাড়নে গুণপ্রাপ্ত হইয়া থাকে? সকল জীবের সহজ গুণ আছে। দেহিরা প্রকৃতির দ্বারা গুণত্রয়যুক্ত হইয়া থাকে ও সেই গুণানুসারে শরীরি কর্ম্ম করিয়া থাকে। সত্বগুণ জ্ঞানের কারণ ও সুখকর, রজোগুণ তৃষ্ণা ও রাগের কারণ এবং তমোগুণ মোহ উৎপাদনের কারণ; কিন্তু নির্গুণই মুক্তিপ্রদ ও সত্বগুণ সংসারপ্রদ, ইহাই তত্বমার্গ। সাত্বিকেরা সর্ব্বভূতকে আত্মসম দেখিয়া সনজতোক্ষ পরায়ণ হইয়া থাকে। রাজসিকেরা, রাগ ও লোভের বশীভূত ও ভিন্ন বুদ্ধির পরায়ণ হইয়া সর্ব্ব ভূতকে শত্রু মিত্র ভাবিয়া থাকে। তামসিকেরা সর্ব্ব গুণবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বভূতের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারা নির্দ্দয়চিত্ত হইয়া প্রাণীহিংসাদি কার্য্যে ও চৌর্য্য বৃত্তিতে রত হয়। কিন্তু নির্গুণ ব্যক্তিরা সদা আনন্দ অনুভব করে ও পরম গতি পাইয়া থাকে।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের বাক্য শ্রবণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কিঙ্কর দিগকে ডাকিয়া কহিলেন, এই মূঢ়কে

এস্থান হইতে লইয়া যাইয়া বেত্রাঘাতে ইহাকে শাসন কর। আমার পুত্র বলিয়া উপেক্ষা করিও না। কিঙ্কর-গণ রাজার আজ্ঞায় তথা হইতে লইয়া যাইয়া বেত্রাঘাত করিতে থাকিল। বালক বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া বেত্রাঘাতে কোন কষ্ট অনুভব করিল না। যেমন হস্তীকে ফুলমালার দ্বারা প্রহার করিলে মালাই ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় হস্তী কিছুই জানিতে পারে না, তদ্রূপ বেত্র সমস্তই নষ্ট হইতে থাকিল। তদ্দৃষ্টে দৈত্য অনুচরেরা বাক্‌রোধ ও বিস্মিত হইয়া পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান রহিল। তখন হিরণ্যকশিপু অন্যান্য কিঙ্করদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে, উহাকে বধ করিতে পারিবে, সে পুরস্কার পাইবে। তখন তাহারা নানাবিধ অস্ত্রাদির দ্বারা তাহাকে প্রহার করিয়াও প্রহ্লাদের কিছুই করিতে পারিল না; অধিকন্তু বালকের দেহ হইতে অগ্নি সদৃশ প্রভা নির্গত হইতে লাগিল। তখন হিরণ্যকশিপুর আজ্ঞায় দিগ্‌গজ আসিয়া প্রহ্লাদকে দন্ত দ্বারা প্রহার করিলে তাহার দন্ত ভগ্ন হইয়া গেল ও সেই যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পলায়ন করিল। হিরণ্যকশিপু তদ্দৃষ্টে বিস্মিত হইয়া অতি বিষধর সর্প আনাইয়া পুত্রকে বিষাগ্নিতে ভস্মীভূত করিবার মানসে, সর্পকে

ছাড়িয়া দিলে সর্প সদানন্দ প্রহ্লাদকে দংশন করিবা মাত্রই তপ্ত লৌহে দংশন করণ অনুভব করিয়া, পুনর্দ্দংশনে অক্ষম হইল। তদ্দর্শনে রাজাও আপন অঙ্গে সর্প দংশন কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন শুষ্ক কাষ্ঠ আনাইয়া বালককে তদ্দ্বারা আবৃত করিয়া অগ্নি প্রদান করাইলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, রক্তাব্জের উপর চক্রবাকের ন্যায় অগ্নি মধ্যস্থ প্রহ্লাদ বিষ্ণুর ধ্যানে নিরত থাকিয়া কি এক অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল। দৈত্যরাজ বিফল-মনোরথ হইয়া মন্ত্রীসভা আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সভায় উপস্থিত হইলে তিনি চিন্তাতুর হইয়া কহিলেন, হে মন্ত্রীপ্রবরগণ! ইন্দ্র প্রভৃতি দিকপালগণ ও দৈত্যগণ সকলেই আমার আজ্ঞাবহ হইয়া রহিয়াছে। বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন জীবই নাই যে, আমার আজ্ঞা অবহেলা করিতে সমর্থ। অদ্য এই বালকের প্রভাবে যেরূপ ভীত, বিস্মিত ও সন্তপ্ত হইয়াছি, এরূপ পূর্ব্বে কখন হয় নাই। এই কুলাঙ্গার ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি আমার চিত্তচাঞ্চল্য হইয়াছে। এই কুটিল অস্ত্রে মরিল না, এত প্রবোধ দিলাম ও তাড়ন করিলাম কিছুতেই আপন কুবুদ্ধি ছাড়িল না, বহুবিধ উপায়ে উহাকে শাসন করিতে অকৃতকার্য্য হইয়াছি,

এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য আপনারা তাহার সদুপদেশ প্রদান করুন।

তখন মন্ত্রীরা এক বাক্যে কহিল দৈত্যরাজ! বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই, অস্ত্র কখন আপনাকে ব্যথা দিতে পারে নাই তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতেই জানি তবে অস্ত্র শস্ত্র হইতে আপনার আত্মজের ব্যথা কিরূপে সম্ভবে। যেহেতু কারণ গুণ-কার্য্যে সদাই বর্ত্তমান থাকে, আপনি ব্রহ্মার বরে এক প্রকার অমর হইয়াছেন, প্রহ্লাদ আপনার আত্মজ বলিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। অতএব এই দুগ্ধপোষ্য বালক হইতে আপনার ভয়ের কারণ কি? এই বালক স্বভাবতঃ ইন্দিরা-রমন-ভক্ত ও সদ্‌গুণযুক্ত অতএব উহাকে শাসন করিরার প্রয়োজন কি? পুনরায় তাহাকে গুরুগৃহে পাঠাইয়া দিন, তথায় বিদ্যা শিক্ষা করিলে অবাধ্যতা ক্রমে দূরীভূত হইবে। তৎশ্রবনে হিরণ্যকশিপু কোপ সম্বরণ করিয়া তুষ্টভাবে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দৈত্য গুরুরা প্রহ্লাদকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন ও তথায় অতি সাবধানে ন্যায় শব্দ, নীতিশাস্ত্র, অন্বীক্ষিকী শাম দাম ভেদ দণ্ড উপায় চতুষ্টয় শিক্ষা দিতে লাগিলেন, প্রহ্লাদও তৎ-

সমুদয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ব করিয়া ফেলিলেন। তখন দৈত্য গুরুরা সুযোগ বুঝিয়া প্রহ্লাদকে বলিতে লাগিলেন যে, তুমি নীতিশীল হইয়া আমাদের আদেশ মত কার্য্য করিলে আমরাও শ্রেয়ঃ লাভ করিব। আমরা তোমাকে অনুরোধ করিতেছি যে তুমি পিতৃকুলাচারী হও। সন্তান স্বধর্ম্মপরায়ণও পিতৃকুলাচারী হইলে শ্রেয়ঃ লাভ করিয়া থাকে। তুমি দৈত্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, দানববংশ নাশকারীকে ভক্তি করিতেছ কেন? তুমি এ কুমতি ত্যাগ কর। সেই দানবারী বিমতাগ্রগণ্য, তিনি দেবগণের শ্রেয়ঃপরায়ণ ও অসুরের বৈরী। তিনি কখনই তোমার ক্ষেমঙ্কর হইবেন না। অতএব হে রাক্ষসতনয়! তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ইন্দুধরের স্মরণ লও, তিনিই তোমাদিগের মঙ্গল সাধন করেন।

ভগবদ্ প্রহ্লাদ ষণ্ডামার্ক্য প্রমুখ দৈত্যগুরুদিগের কথা শ্রবণ করিবামাত্র অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণমূল আচ্ছাদন করিয়া কহিলেন; হে গুরো! আপনারা বিপ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, নিখিল বেদ ও উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মবেত্তা হইয়াছেন, তবে, "গোপাল গোবিন্দকে বিশ্বাস করিব না" এ উপদেশ কিরূপে দিতেছেন।

আপনাদের বিপরীত শিক্ষা ও পিতা মহাশয়ের যন্ত্রণা দেওয়া সত্ত্বেও আমি হরির নাম শ্রবণ করিলে পুলকিত হই। তিনি কৃপালু, ভক্তবৎসল ও দুর্ব্বলের বল; আমি তাহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারি না। সেই বৈকুণ্ঠনাথ, যাঁহাকে আপনারা দানবনাশন কহিতেছেন, তাঁহাকে স্মরণ মাত্রেই আমি সর্ব্ব ব্যথা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকি। হে দৈত্যগুরো! আপনারা কি দেখেন নাই যে পিতামহাশয় আমাকে বহু প্রকারে যন্ত্রণা দিয়াও আমার কিছুই করিতে পারেন না। সেই ভক্ত-বৎসল দেব ও দৈত্য উভয়কেই সমভাবে দৃষ্টি করিয়া থাকেন। যে কেহ তাঁহাকে ভক্তিযোগে পূজা করে, প্রভুও তাহাকে রক্ষা করেন, ইহাও আপনারা অবগত আছেন। স্বর্গ দ্বিবিধ, দৈব ও আসুর; যে স্বর্গ হরিভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই দৈব, আর যাহা হরি-ভক্তিবিহীন কর্ম্ম দ্বারা লাভ হয় তাহাই আসুর। বেদ-বেদাঙ্গ-বেত্তা হইয়াও যদি কোন ব্রাহ্মণ হরিভক্তি-বিবর্জ্জিত হয়েন, তাহা হইলে তিনি বিষ্ণুপরায়ণ চণ্ডা-লেরও সমকক্ষ হইতে পারেন না। এই সমস্ত কারণে আমি ভক্তবৎসলকে অনুক্ষণ স্মরণ না করিলে তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। প্রহ্লাদ এবংপ্রকারে আপন

গুরুদিগকে কহিলে, তাঁহারা পুনরায় কহিলেন, এসম্বন্ধে তোমার পিতাকেই অনেকটা দোষের ভাগী করিতে হইবে সন্দেহ নাই। তুমি যাহা বলিলে তৎসমস্তই সত্য; তোমার পিতা মূর্খতা প্রযুক্তই তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন। তোমার চিত্ত সর্ব্বদাই পুরুষোত্তমে ন্যস্ত রহিয়াছে তাহা আমাদের অবিদিত নাই। দীনদয়াল হরিতে ভক্তি থাকিলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, অধিকন্তু তুমি মনে মনেও তাঁহার আরাধনা করিলে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। সেই চক্রধর সকলেরই চেষ্টা অবগত আছেন। হরিকে মনে মনে না পূজিয়া কেবল বাক্যে পূজা করিলেও কর্ম্মফল ক্ষয় হয় না। শ্রুতি বলেন জ্ঞান হইতেই মোক্ষ অতএব জ্ঞান ও মানসিক পূজা একত্র হইলে শ্রেয়ঃ লাভ হয়। হে প্রহ্লাদ! তুমি মনে মনে তাঁহারই ধ্যান করিতে থাক, প্রকাশ্যে বলিবার আবশ্যক নাই, বিশেষতঃ তোমার পিতার সম্মুখে ইহার এক কথাও কহিওনা। হে দৈত্যবরতনয়! এই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা। তুমি ইহা কার্য্যে পরিণত করিলেই আমাদিগের গুরু-দক্ষিণার স্বরূপ হইবে। তাঁহারা এইরূপ প্রার্থনা করিলে হরিভক্তপ্রবর বালক প্রহ্লাদ ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া

নম্রভাবে গুরুদিগকে কহিলেন আমি এখনও বালক বিশেষ কিছুই শিক্ষা করিতে পারি নাই, যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াছি তাহাতে আমার এরূপ ধারণা হইয়াছে যে হরির নাম মুখে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। প্রহ্লাদ তৎপরে গুরুদিগকে হরিভক্তির উপদেশ দিতে থাকিলেন। তাঁহারা তাঁহার উপদেশ বাক্য শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন যে বালক হইয়া এরূপ জ্ঞান কোথা হইতে পাইয়াছে, অবশ্য পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত হইবে সন্দেহ নাই। তখন তাঁহারা পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে থাকিলেন ও আপনাদের বিপদ আশঙ্কা করিয়া কল্পিত কোপে বালককে রাজ-সমীপে লইয়া যাইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, হে দৈত্যেশ্বর! আমরা এই বালককে বাটীতে রাখিয়া বিবিধ যত্নসহকারে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিবার অনেক চেষ্টা পাইয়াছি কিন্তু এ বালক কিছুতেই তাহা শিক্ষা করিল না, সর্ব্বদাই হরির ধ্যানে নিমগ্ন থাকে, সময়ে সময়ে আমাদিগকেও হরিভক্তির উপদেশ দিতে ক্রুটি করে না। আমরা দেখিতেছি উহা নৈসর্গিক স্বভাব, দণ্ড চতুষ্টয় অবলম্বন করিয়াও উহাকে বশে আনিতে পারিনাই; অনন্যোপায় হইয়া আপনার নিকট লইয়া

আসিয়াছি, আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা করিতে পারেন। তৎশ্রবণে দৈত্যেশ্বর আপন কিঙ্কর দিগকে ডাকিয়া কহিলেন যে এই কুলাঙ্গার আমার প্রাণ ঘাতক হইবে, অতএব যে কোন উপায়ে হউক উহাকে সংহার কর, ঐ পাপিষ্ঠকে অম্বুধিতে নিক্ষেপকর ও উহার উপর বৃহৎ প্রস্তর চাপাইয়া দাও। তখন কিঙ্করেরা ভক্ত প্রহ্লাদকে তথা হইতে অম্বুধিতটে লইয়া গিয়া, সাগর জলে নিক্ষেপপূর্ব্বক বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড দ্বারা আচ্ছাদন করিল; কিন্তু পরক্ষণেই দেখিল যে, প্রস্তর খণ্ড প্রহ্লাদকে লইয়া উল্টাইয়া পড়িয়া অম্বুধির জলে ভাসিতে লাগিল। আরও দেখিল যে বালকের পার্শ্বে স্বয়ং ভক্তবৎসল হরি অভয় দিয়া কহিতেছেন, বৎস! তোমার ভয় নাই তোমার কষ্টের লাঘব হইয়া আসিয়াছে, তুমি পিতৃ গৃহাভিমুখে গমন কর। আবশ্যকমতে আমি তথায় উপস্থিত হইয়া সেই পাপিষ্ঠ নরাধমকে শাসন করিব। অতঃপর ভক্তবৎসল হরি তথা হইতে অন্তর্দ্ধান হইলে, প্রহ্লাদ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া, হরির নাম গাইতে গাইতে পিতৃ-গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে দৈত্য-কিঙ্করেরা সত্বর হইয়া, রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া হিরণ্যকশিপুর সম্মুখীন

হইয়া, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমস্ত বিবৃত করিয়া কহিল, বালক হরির নাম গাইতে গাইতে এইদিকেই আসিতেছে। হিরণ্যকশিপু তৎশ্রবণে ভয়ে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কহিলেন, ভাল তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস। প্রহ্লাদ পিতৃ-সমীপে আসিয়া, সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাতপূর্ব্বক পাদস্পর্শ করিলেন। হিরণ্যকশিপু ভয়ে বিচলিত হইয়া, পুত্রকে উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক ক্রোড়ে বসাইয়া মধুর-সম্ভাষে কহিতে লাগিলেন, পুত্র! তোমার প্রভাব অবগত হইয়াছি। তুমি মহাবল, অস্ত্র ও গজদন্ত তোমার অঙ্গে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে; সর্পাগ্নি ও কাষ্ঠাগ্নি তোমার কিছুই করিতে পারে নাই; গ্রাহসঙ্কুল বারিধীতে তোমাকে নিক্ষেপ করা হইয়াছে, কিছুতেই কিছু হইল না, তুমি পূর্ব্ববৎই অবিকৃত রহিয়াছ। তোমার কথাবার্ত্তায় তোমাকে জ্ঞানী বলিয়া বোধ হইতেছে। ত্রিভুবনে এমন কেহ নাই যে, আমার নামে শঙ্কিত হয় না। এমন কি দেবতারাও আমার বাধ্য; অতএব তুমি আমার বাধ্য হও, আমার মহিমা দেখ, আমি ত্রিভুবনে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছি। আমি তোমাকে বলিতেছি যে, দানবান্তকের স্মরণ লইও না, যদি আমার পরামর্শে

কার্য্য কর, তাহা হইলে তুমি সকল প্রকার শূরকে বশে আনিতে পারিবে ও সকল প্রকার সুখসম্ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। আমাকে আর মানসিক যন্ত্রণা দিও না, আমার সহিত সর্ব্বদা সুখসম্ভোগ করিতে থাক। তখন পূর্ণানন্দ প্রহ্লাদ কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর-হাসে কহিলেন, পিত! আপনি অকারণ ভ্রমে পড়িয়াছেন, অকারণ আমার বাক্যে বিমনা হইতেছেন। সেই ভগবান হরি দেব দানব উভয়েরই বলস্বরূপ। সেই ভক্তবৎসল হরির আরাধনা না করিলে, ঐশ্বর্য্য কিপ্রকারে সম্ভবে! স্থাবর জঙ্গম তাঁহার আজ্ঞাবহ। হে পিত! যাঁহারা ভক্ত-বৎসলকে আরাধনা করিতে নিষেধ করেন, তাঁহারাই দৈত্য ও আমার শত্রু, আর যাঁহারা সেই হরির নামোচ্চারণ করেন, তাঁহারাই সুর ও আমার মিত্র। আমি যাঁহার পূজা করিয়া থাকি, স্থাবর-চর-ভূত সেই বিষ্ণুর ব্যক্তমূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। হে পিত! সংসারকে আত্মবৎ দেখিতে প্রয়াস পান্, সুখদুঃখের কথায় বিচলিত হইবেন না। অপর সকলকে ভেদবুদ্ধিতে দেখিবেন না। যদি আপনি ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করেন, তাহা হইলে পরম সুখী হইবেন, তখন সেই হরির নাম শ্রবণ করিতে আনন্দ অনুভব করিবেন। কল্যাণময় ভগবান

বিষ্ণু আমাকে যেমন বিপদ ও শঙ্কা হইতে সদা সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করিতেছেন, তদ্রূপ আপনাকেও সতত রক্ষা করিবেন। আপনি আমাকে পীড়ন করিতে ক্ষান্ত হউন, এই মাত্র আমার প্রার্থনা। সেই দয়াময় হরি আপনার মঙ্গল করুন্। প্রহ্লাদ এইরূপ বহুবিধ সারগর্ভবাক্য কহিলেও, হিরণ্যকশিপু পূর্ব্ববিদ্বেষ বশতঃ তাচ্ছল্যপূর্ব্বক কহিলেন. আঃ পামর! কেবল, মুখে ঐ পাপকথা "হরি হরি"? বল্‌দেখি তোর হরি কোথায়? এবং কেই বা তাহাকে দেখিয়াছে। প্রহ্লাদ রসহীন পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া, মনঃক্ষুণ্ণ হইলেও ধীর ও গম্ভীরস্বরে কহিলেন, পিত! হরি এখানে বা ওখানে এবিষয়ে আপনার সন্দেহ করিবার আবশ্যক নাই। তিনি সর্ব্ব উপগতা, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বশক্তি সর্ব্বসাক্ষী ও বিভু, সেই কারণে তিনি বিষ্ণুনামে অভিহিত। তিনি মন ও বাক্যের অগোচর, স্থাবর ও জঙ্গম প্রপঞ্চের আত্মা। তৃণাগ্র পর্য্যন্তও তাঁহার শক্তি ব্যতিরেকে নড়িতে সমর্থ নহে। তিনি (আমাতে যে তাহার ভক্ত) ও আপনাতে (যিনি তাঁহার বিরোধী), সমভাবে রহিয়াছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের এমন কোন স্থান নাই যেখানে তিনি বিদ্যমান নহেন। তিনি অন্তরে ও বহির্ভাগে সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছেন; অপর কথা

দূরে থাকুক, আপনি শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক আপন অন্তরে দেখুন, সেই কল্যাণময় হরিকে দেখিতে পাইবেন। তখন হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্ধ হইয়া কহিল, তুই যাহাকে বাহিরে বিদ্যমান বলিতেছিস্, কিন্তু আমি তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না, আবার বলিতেছিস্ তিনি অন্তরেও আছেন, আচ্ছা দেখ্ এই স্তম্ভের ভিতর কোথায় তোর হরি! এই বলিয়া ক্রোধপরবশ হইয়া, দৈত্যরাজ আপন সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক একহস্তে প্রহ্লাদের কেশাকর্ষণ করিয়া ও অপর হস্তে খড়্গ লইয়া, যেমন স্তম্ভের উপর সজোরে আঘাত করিলেন, অমনি অশনিঘাত হইল ও ভূচক্র কম্পিত হইল। স্তম্ভ দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িলে, সহস্র সূর্য্যতেজ-সমন্বিত নৃসিংহমূর্ত্তি বহির্গত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে আক্রমণ করিলেন, হিরণ্যকশিপুও নানাবিধ মায়াবীমূর্ত্তি ধারণ করিতে থাকিলে, ভগবান্ হরিও সেই মূর্ত্তির সংহারক রূপ ধারণ করিতে লাগিলেন। সেই মূর্ত্তি সকল অসংখ্য ও ঘোরদর্শন। ইহাদের মধ্যে বরাহ-নৃসিংহ-মূর্ত্তিই অতি ভয়াবহ বরাহ-নৃসিংহ অর্থাৎ মুখ বরাহাকৃতি, গলা হইতে কোটীদেশ পর্য্যন্ত সিংহাকৃতি এবং অধোভাগ নরাকৃতি। উভয়ের এইরূপে তুমুল

সংগ্রাম হইতে লাগিল, এদিকে ব্রহ্মাদি দেবগণ ভয়-বিহ্বল-চিত্তে তাঁহাদিগের যুদ্ধ দেখিতে দেখিতে তাঁহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শনে অসমর্থ হইয়া, স্তুতি পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। হে দেবদেব জগৎপতি! আমরা আপনার এই ঘোরদর্শন মূর্ত্তি দেখিতে সমর্থ হইতেছি না। আপনাদিগের পদভরে মেদিনীকম্পমানা, অতএব এই ক্রূরকর্ম্মা অসুরকে সংহার করিয়া আপনার ভীষণ মূর্ত্তির অপনোদন করুন্।

তখন ভগবান্ দিবাবসান হইবার পূর্ব্বেই বলপূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে আক্রমণ করিয়া, রাজ-প্রকোষ্ঠের নিম্নভাগে আনিয়া নখদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। দৈত্যরাজ ঘোররবে চিৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

যেস্থানে এই ঘটনা হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি 'অহোবল' নামে খ্যাত হইতেছে। মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সির কারনুল জেলার মধ্যে অহোবল নামে এক পল্লী আছে, উহা অক্ষরেখার উত্তর ১৫।৯।৩ পূর্ব্বদ্রাঘিমায় অবস্থিত।

অদ্যাপি তথায় একটি পর্ব্বতশৃঙ্গে তিনটি বিষ্ণুমন্দির বিদ্যমান আছে, তাহারই একটিতে নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি রহিয়াছে। শ্রীরামানুজমতাবলম্বী শ্রীবৈষ্ণবেরা উক্ত

মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকে। যদি ইহাই স্থল-পুরাণোক্ত অহোবলা হয়, প্রমাণ হইতেছে যে, তবে হিরণ্যকশিপুর বাটী কারনুল জেলার অন্তর্গত ছিল। আমরা মহিসুরের বিবরণে বলিয়াছি যে, চামুণ্ডাদেবীর পাহাড়ের অব্যবহিত দূরে মহিষাসুর দেবী কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত মঙ্গলচারির বিবরণে দেখিতে পাইবে যে, মঙ্গলগিরির পশ্চাৎভাগে বেত্র নামক দৈত্য কঠোর তপস্যা করিয়া, ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ করে ও সেই স্থানেই বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে ইন্দ্র কর্ত্তৃক সমুদ্রফেন নিক্ষেপে নিহত হয়। তঞ্জাবুরে ও ত্রিশিরাপল্লীতে তঞ্জান্ ও ত্রিশিরা নামে দৈত্যদ্বয় বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিহত হয়। বোধ হয় অনুসন্ধানে আরও জানা যাইতে পারে যে, তারকাসুর, শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যদিগের আবাসস্থান দক্ষিণ দেশেই ছিল। বিমনিপত্তন নামক স্থানে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম কর্ত্তৃক বকাসুর নিহত হইয়াছিল। পঞ্চবটী বনও রাবণের অধীনে ছিল; অতএব ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, দক্ষিণ দেশ অসুর ও রাক্ষসদিগের ক্রীড়াভূমি ছিল।

ভগবান্ নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে সংহারপূর্ব্বক ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদকে পিতৃসিংহাসনে স্থাপনান্তর কৃত-

শৌচ নামক স্থানে গমন করিয়া, হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু দ্বিজ ছিলেন, তাঁহাকে বধ করায় ভগবান্ দ্বিজবধের পাতকী হইয়াছিলেন, অতএব তিনি পাপ-হর নামক স্থানে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হইলেন।

স্থলপুরাণের মতে পূর্ব্ব দুই স্থানে নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, কিন্তু উক্ত দুই স্থান কোথায় তাহা জানিতে পারিলাম না।

অনন্তর ভগবান শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, লক্ষ্মীর সহিত সিংহাচলে আসিয়া অবস্থান করিলেন। ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য মতে বরাহ-নৃসিংহক্ষেত্র পাহাড়ের পরিধি পঞ্চ যোজন, ইহাই প্রহ্লাদের উপর স্থাপিত হইয়াছিল ও কাল মাহাত্ম্যে পঞ্চ যোজনের পরিবর্ত্তে পঞ্চ ক্রোশমাত্র হইয়াছে, উহা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

প্রহ্লাদ জীবনের শেষভাগে আপন পুত্রহস্তে রাজ্য-ভার অর্পণ করিয়া তপস্যার্থ পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করেন ও বরাহ-নৃসিংহক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়েন; পরে ভগবান্ বরাহ-নৃসিংহদেবের দর্শনলাভ করিয়া, তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ, নৈমিত্তিক পূজার বন্দোবস্ত ও ব্রাহ্মণদিগের বাসোপযোগী পল্লী তৈয়ার করাইয়া

দেন। ক্রমে ত্রেতা, দ্বাপর, তৎপরে কলিযুগ আসিলে, তৎপ্রদেশে বহুদিনব্যাপি অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, ইহাতে সমস্ত জীব দেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করে। তখন ব্রাহ্মণেরাও তথা হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল ও উক্ত ক্ষেত্র প্রদেশ ক্রমে জঙ্গলময় হইলে, সর্পাদি হিংস্রক জন্তু সকলের আবাসভূমি হইয়া উঠিল। মণ্ডল ক্রমে ভগ্ন হইল ও যে স্থানে হরি অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই স্থানে গুল্মাদি বৃক্ষ জন্মিল ও তাহার উপর বল্মীকির ঢিপি হইল, সুতরাং ভগবান্ আবৃত হইয়া রহিলেন। অনন্তর কলির অবসানে অষ্টবিংশতি যুগের সপ্ততিতম যুগ আসিয়া উপস্থিত হইলে, চন্দ্রবংশীয় পুরূরবা রাজচক্রবর্ত্তী প্রাদুর্ভূত হইলেন ও ক্রমে ভারতখণ্ডে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে কাম-গমন নামে আকাশগামী বিমান প্রাপ্ত হয়েন। তখন হইতে তিনি কামগমনে আরূঢ় হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন। একদা তিনি কৈলাসপুরীতে ইন্দুশেখরের সন্দর্শনে গমন করেন, তথা হইতে প্রত্যাগমন সময়ে কৈলাস পর্ব্বতের রজত গিরিতে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে উর্ব্বশী নাম্নী অপ্সরা তাঁহার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে

গ্রহণ করেন ও তাঁহার সহিত বিহার করিতে করিতে কামগমনে আরূঢ় হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমনপূর্ব্বক সিংহাচলের সন্নিকটে আসিয়া পাহাড়ের মনোহর দৃশ্যে মোহিত হইয়া তথায় অবতীর্ণ হন এবং পরিভ্রমণ করিতে করিতে পুরূরবা উর্ব্বশীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে, এই স্থানটী অতি মনোহর ও সুখপ্রদ; তোমাকে লইয়া এইখানে যাবজ্জীবন বাস করিতে ইচ্ছা হয়। উর্ব্বশী সিংহাচলের পূর্ব্ব বিবরণ জ্ঞাত ছিলেন, তিনি রাজচক্রবর্ত্তীকে কহিলেন, এই স্থান পুণ্যভূমি, ভগবান্ হরি এই পর্ব্বতে লক্ষ্মীর সহিত বাস করিতেছেন। তিনি পূর্ব্ব যুগে ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের নিকট বরাহ-নৃসিংহ মূর্ত্তিতে এই স্থানে পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘোর কলিতে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষবশতঃ প্রতিবাসীগণ এ স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, সেই অবধি ইহা জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। নচেৎ ইহা বরাহ-নৃসিংহ-ক্ষেত্র, তৎশ্রবণে পুরূরবা হরির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ অন্বেষণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পশ্চিমবাহিনী গঙ্গা দেখিতে পাইলেন। উভয়ে তথায় স্নান করিয়া জলপানপূর্ব্বক তৃপ্তিলাভ করিলেন। তখন কি প্রকারে দেবদর্শন পাইবেন, তাহা

ভাবিতে ভাবিতে উর্ব্বশীকে কহিলেন যে, আমি কুশের উপর শয়ন করিয়া ব্রত করিব, যতদিন সেই ভগবানের দর্শন না পাইব, ততদিন তাঁহার চিন্তায় এই অবস্থায় থাকিব। তখন তিনি সঙ্কল্পপূর্ব্বক ব্রত গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বাভিমুখে কুশের উপর শুইয়া একাগ্রচিত্তে ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাহার তিন অহ-র্নিশি অতিবাহিত হইলে, চতুর্থ দিবসের প্রাক্কালে ভগবান্ বিষ্ণু স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে কহিলেন, হে রাজকুলশ্রেষ্ঠ! আমি দেবীর অদৃশ্য হইলেও, তোমার অগ্রভাগে এই বল্মীকিঢিপির অভ্যন্তরে গুপ্ত-ভাবে আছি। হে নরবরেন্দ্র! আমাকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া, বস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করিয়া ষোড়শোপ-চারে আমার পূজা কর, তৎপরে চন্দন অনুলেপন দ্বারা আমার আপাদমস্তক আবৃত কর, যাহাতে অপর আপামর সকলে আমাকে দেখিতে না পায়। প্রতি বর্ষে এই তিথিতে চন্দন অনুলেপন খুলিয়া তুমি আমার মূর্ত্তি দর্শন করিলে, তোমার ধর্ম্ম অর্থ ও মনস্কাম সিদ্ধ হইবে এবং অন্তে মোক্ষ পাইবে। উক্ত দিবস আপামর সকলেই আমাকে দেখিতে পাইবে। কেহ আমার বাক্য অবহেলা করিয়া, আমার গাত্র হইতে চন্দনানুলেপন

খুলিয়া আমার মূর্ত্তি দেখিতে প্রয়াস পাইলে, তাহার বংশ নাশ হইবে। কিন্তু যদি কেহ অজ্ঞানবশতঃ তাহা করে, তবে প্রায়শ্চিত্তের জন্য মহানৈবেদ্য করিয়া আমার পূজা করিবে ও পরক্ষণেই চন্দনোনুলেপন দ্বারা আমাকে আবৃত করিবে। রাজাকে এইরূপ কহিয়া, অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর রাজা জাগ্রত হইলেন ও উর্ব্বশীকে সমস্ত স্বপ্নবিষয় বিবৃত করিয়া কহিতে লাগিলেন যে, ভগবান্ পঞ্চামৃত স্নানে অভিষেক করিতে আদেশ করিয়াছেন। আর দেখ, বিমান কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া নিশ্চল হইয়া রহিয়াছেন, এই বিজন অরণ্যে একটি লোকেরও বাস নাই। এক্ষণে পঞ্চামৃত কোথায় পাই, তাহার উপায় বল। উর্ব্বশী তৎশ্রবণে অতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া কহিলেন, ভগবান্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এ অপেক্ষা সুখের বিষয় কি আছে! তাঁহার প্রীতিকর কার্য্য ত্বরায় সম্পাদন করিতে যত্নবান্ হও, কালহরণ করিওনা। নীতিবেত্তারা বলিয়া থাকেন, 'শুভস্য শীঘ্রং' 'অশুভস্য কালহরণং।' আপনি রাজচক্রবর্ত্তী আপনার অবাধ্য কে আছে? আপনার দক্ষিণ হস্তে বিষ্ণুচক্র অঙ্কিত থাকায় দেব যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি সকলে আপনার

আজ্ঞাবহ, অতএব আপনি শুভকার্য্যে বিলম্ব করিবেন না। রাজা উর্ব্বশীর বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া, আপন মহিমা স্মরণ করিবামাত্রই, দেবতারা সহস্র ঘট দুগ্ধ লইয়া ভগবানকে অভিষেক করাইতে আগমন করিলেন এবং বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সেই দুগ্ধ বল্মীক ঢিপিতে ঢালা হইতে থাকিলে, ক্রমে বল্মীক মাটি গলিয়া গেলে, পদদ্বয় ব্যতীত বরাহ-নৃসিংহদেবের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। রাজা পদদ্বয় দেখিতে না পাইয়া চিন্তাতুর হইলে, আকাশবাণী হইল, 'হে কোলয়নাথ! আমার পদদ্বয় মুনিদিগের আরাধ্য, তুমি মানব হইয়া কিপ্রকারে দেখিতে পাইবে? অতএব দেখিতে প্রয়াস পাইও না। অদ্য অক্ষয়তৃতীয়া তুমি অভিষেক দ্বারা আমার শরীরাভরণ ধুইয়া, বিচ্যুত করিয়া মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছ, অতএব তুমি বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইবে। সত্বর হইয়া পূজা সমাপন কর, তৎপরেই চন্দন অনুলেপনে আমার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দাও। পুনরায় অক্ষয়তৃতীয়ার দিন চন্দন অনাবৃত করিয়া আমাকে দর্শন করিও, তোমার কুশল হউক।'

আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া, রাজা ভক্তিসহকারে গঙ্গাজলে তাঁহাকে স্নান করাইয়া, ষোড়শোপচারে

দেবের পূজা করিলেন। তৎপরে চন্দন অনুলেপনে মূর্ত্তি আবৃত করিয়া, দেবের নৈত্যিক পূজার সুবন্দোবস্ত পূর্ব্বক ব্রাহ্মণপল্লী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। সেই অবধি বরাহ-নৃসিংহস্বামী যথানিয়মে পূজা পাইতেছেন। প্রতি বৎসর অক্ষয়তৃতীয়াতে চন্দনাবরণ অপহৃত হইলে, আপামর সকলেই স্বামীর সন্দর্শনে আইসে, অতএব সেই সময়ে বহু লোকের সমাগম হয়। এই ক্ষেত্রে শূদ্র-দিগকে স্বামী সন্দর্শনের জন্য অর্দ্ধ আনা হিসাবে গুরুকে কর দিতে হয়, ইহাতেও দেবালয়ের যথেষ্ট আয় আছে।

আমরা দেবদর্শনাভিলাষে দেবালয়ে আসিলাম। দেবালয়টি বৃহৎ ও পুরাতন বলিয়া বোধ হইল। উহা গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত দুইটি প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত, উহার চারিদিকে অতি অশ্লীল মূর্ত্তি বিদ্যমান থাকায়, কুরুচির পরিচয় দিতেছে। বিজয়নগরের বর্ত্তমান মহা-রাজার পিতামহী বারাণসী গমনের পূর্ব্বে দেবদর্শনে আসিয়া, উক্ত মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া পলস্তারা দ্বারা আবৃত করিতে আদেশ দিয়াছি, উহা তদবধি আবৃত আছে।

মন্দিরটি দুই অংশে বিভক্ত; দুই দফায় নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। মন্দিরের প্রবেশ দ্বার পূর্ব্বদিকে ও মূল-স্থান পশ্চিম দিকে। মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার নিমিত্ত

বাহিরের চতুর্দ্দিকে প্রাঙ্গণ ও তাহার ধারে বারান্দা আছে; উক্ত বারান্দার থাম কয়েকটিতে অনুশাসন খোদিত আছে, তাহার একটিতে অবগত হওয়া যায় যে, বিজয় সার্ব্বভৌম রাজা শ্রীকৃষ্ণরায় ১৫০৯ খৃঃ অন্ধ্র-দেশ জয় করিয়া, সিংহাচলক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক পশ্চিম-বাহিনী গঙ্গাধারায় স্নান ও দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। ঐ বারান্দার চারিধার ঘেরিয়া ক্ষুদ্র মন্দিররূপে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বামী রহিয়াছেন। পশ্চিম দক্ষিণ-কোণে ভাষ্য-কার শ্রীরামানুজাচার্য্য ও অপর কয়েকটি মূর্ত্তি পূজা পাইয়া থাকেন। দক্ষিণদিকের মন্দিরে মাণিক্যাম্বা-দেবী পূজা পাইয়া থাকেন; পশ্চিম উত্তর কোণে তারা-রগা দেবী পূজা পাইয়া থাকেন। এইদিকের একটি ছোট দ্বার দিয়া ছত্র বাটীতে যাইবার রাস্তা ও তথায় প্রসাদ পাইবার বন্দোবস্ত আছে। পূজার কারণ আটজন অর্চ্চক, আটজন বেদগায়ক ষোলজন মশালধারী বাহক এবং এতদ্ব্যতীত আরও ৪৫ জন বৃত্তিভোগী আছে। প্রত্যহ ৩ মণ চাউলের অন্ন পাক হইয়া ভোগ দেওয়া হয়, ভোগের বন্দোবস্ত মন্দ নহে। দেবোত্তরের আয়ও যথেষ্ট আছে, খরচ খরচা বাদে উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে।

দেবদর্শন ও দেবের পূজা করিয়া, প্রসাদগ্রহণানন্তর আমরা তথা হইতে অবতরণপূর্ব্বক মহারাজের গোলাপ পুষ্পোদ্যান ও উদ্যানস্থ বিশ্রাম-ভবন সন্দর্শন করিয়াছিলাম। উদ্যানে অনেকগুলি ফোয়ারা আছে। বেগবতী নদী হইতে লোহার পাইপের সাহায্যে ঐ সকল ফোয়ারায় জল আসিয়া থাকে। ফোয়ারার চাবি খুলিয়া দিলে, যখন প্রবল বেগে জল বহির্গত হইতে থাকে, তখন তাহার দৃশ্য অতি মনোহর। আমরা তাহা সন্দর্শন করিয়া প্রীত হইয়াছিলাম।

পদ্মনাভ।

অনন্তর ১৮৯০ খৃঃ ১৩ই সেপ্টেম্বর পুণ্যক্ষেত্র শ্রীশৈল সন্দর্শনানন্তর পদ্মনাভতীর্থ-দর্শনে গমন করি। ইহা সিংহাচল হইতে ১৪ মাইল, বিশাখপত্তন হইতে ২২ মাইল ও বিজয়নগর হইতে ১০ মাইল। ইহার উৎপত্তি বিষয়ে ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে কথিত আছে যে, পাণ্ডবেরা বনবাসকালে তথায় কয়েক মাস অতিবাহিত করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্বতের শিখরদেশে আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহাদিগকে মিষ্ট সম্ভাষণে আশ্বাসিত করিয়া, প্রত্যাগমনসময়ে পর্ব্বতের শিখরদেশে আপনার শঙ্খ চক্র রাখিয়া, তাঁহাদিগকে আদেশ করেন যে, তাঁহারা তথায় অন্ততঃ ছয়মাস বাস করিয়া, উক্ত শঙ্খ চক্রের পূজা করিবেন। শ্রীবিষ্ণুর অন্যতর নাম পদ্মনাভ। তাঁহার শঙ্খ চক্র এই পর্ব্বতে রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া, পর্ব্বত ও পর্ব্বতসমীপস্থ নগরটিও "পদ্মনাভ" (১) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পর্ব্বতের শিখরোপরি একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের অভ্যন্তরে যেখানে শঙ্খ

(১) মালাবারের অন্তর্গত আর একটি পদ্মনাভক্ষেত্র প্রসিদ্ধ আছে।

চক্র রক্ষিত হইয়াছিল, সেই স্থান ভক্তদিগকে সন্দর্শন করান হয়। মন্দিরে উঠিবার জন্য ১২৯০টি বাধান সিঁড়ি আছে। বিজয়নগরের বর্ত্তমান মহারাজের প্রপিতামহ কর্ত্তৃক তৎসমস্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রত্যেক ধাপ ন্যূনাধিক ১০ ইঞ্চি উচ্চ হইবে। পর্ব্বতের পাদপ্রদেশে কুন্তি-মাধবস্বামীর মন্দির। উহা কুন্তিদেবী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। উহার অনতিদূরে সমতল ভূমির উপর ব্রাহ্মণ ও সৎশূদ্রদিগের আবাস এবং তাহার অনতিদূরে পুণ্য-সলিলা স্রোতস্বিনী গোদোহনী (গাং স্বর্গং দুহতি প্রাপ্নোতি স্নানাৎ ইতি যাবৎ) প্রবাহিতা হইতেছেন। তথায় লোকবিশ্রুত জটায়ু বহু বৎসর তপস্যা করিয়া, বরপ্রাপ্তিসময়ে বরদাতা কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছিল যে, ঐ পুণ্যতীর্থে যে ব্যক্তি স্নান করিবে, কিংবা উহার তীরে মানবলীলা সংবরণ করিবে, অথবা উহার জলে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে, সে নরকযন্ত্রণা পরিহার করিয়া, স্বর্গে বাস করিতে সমর্থ হইবে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র তীর্থপর্য্যটনসময়ে গোদোহনীতে স্নান ও তর্পণাদি করিয়া, পর্ব্বতশিখরস্থ পদ্মনাভের পূজা করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীরামানুজ পুরুষোত্তম-সন্দর্শনানন্তর দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে আসিতে

আসিতে, গ্যাঞ্জাম জেলার অন্তর্গত শ্রীকাকোলে সন্নিকটস্থ শ্রীকূর্ম্মতীর্থে দুই মাস অতিবাহিত করিয়া শ্রীপদ্মনাভে পাঁচদিন থাকিয়া, পুণ্যসলিলা গোদোহনীতে স্নান তর্পণাদি ও পদ্মনাভশিখরে বিষ্ণুর পূজা করত, পুণ্যতীর্থ সিংহাচলে গমন করেন। আর একটি কিংবদন্তী আছে যে, পাণ্ডবেরা জতুগৃহ দাহন করিয়া, বনের অভ্যন্তর দিয়া, দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া, বর্ত্তমান "ভীমুলিপট্টনের" (ভীমপত্তনের) নিকট একচক্র গ্রামে কয়েকমাস গুপ্তভাবে কোন গৃহস্থের আবাসে মাতার সহিত অতিবাহিত করেন। তখন ভীমপত্তন জঙ্গলময় ছিল এবং তথায় কোন অসুর বাস করিত। গ্রামবাসীরা অসুরের আহারের জন্য নিয়ম করিয়া, পর্য্যায়ক্রমে আহার্য্য দ্রব্যের সহিত এক একটি হৃষ্টপুষ্ট মনুষ্য পাঠাইত। ভীম মাতার আদেশে গৃহস্বামিনীর প্রতিনিধিস্বরূপ, আহার্য্য লইয়া, জঙ্গলে অসুরালয়ে যাইয়া, স্বয়ং আহার্য্য ভক্ষণ করিয়া, ঐ অসুরকে সংহারপূর্ব্বক বন নিষ্কণ্টক এবং উহা কৃষ্ট ভূমিতে পরিণত করিয়া, সমুদ্রতীরে স্বনামে নগরপ্রতিষ্ঠা ও পর্ব্বতোপরি বিষ্ণুর মূর্ত্তি স্থাপন করেন। উহাই এখন "ভিমুলিপট্টন" বন্দরে পরিণত হইয়াছে। ঐ পত্তন পদ্মনাভ হইতে ১৪ মাইল

দূরে ও বিশাখপত্তন হইতে ২০ মাইল উত্তরে প্রতিষ্ঠিত। তথায় ইংরাজ-বণিক-সম্প্রদায় অবস্থিতি করিয়া, দেশজাত শস্যাদি প্রতি সপ্তাহে ঔপকূলিক বাষ্পীয় পোত (কোষ্ট ষ্টীমার) সাহায্যে রপ্তানি করিয়া থাকেন।

আমরা গরুর গাড়িতে করিয়া, ৮ ঘণ্টার পর পদ্মনাভে পৌঁছিয়া, বিজয়নগরে রাজাদিগের পুরাতন বাটীতে রাত্রি যাপন ও প্রাতে গো-দোহনীতে স্নান করত, পদ্মনাভশিখরে গমন করিলাম। উপরে উঠিবার সময় শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত ও তজ্জন্য আমাদিগকে দুই তিন বার উপবেশন করিয়া, শ্বাস গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আমাদিগের সহিত নিত্য-সেবার পূজারি ও অপর কয়েকটি বৈদিক ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। পর্ব্বত দুরারোহ বলিয়া, নিত্য পূজা ও ভোগ একেবারে হইয়া থাকে। ভোগান্নের জন্য /১ তণ্ডুল, /॥০ তৈল, দধি /॥০ সের, /।০ দুগ্ধ ও /।০ পোয়া ঘৃত নির্দ্দিষ্ট আছে। ভোগান্ন মাধবস্বামীর প্রাঙ্গণমধ্যে প্রস্তুত হয়। প্রস্তুত হইলে, একজন ব্রাহ্মণ পূজার জন্য এক কলস জল, আর একজন ব্রাহ্মণ পুষ্পাদি ও অন্যতর ব্রাহ্মণ ভোগাদি নিমিত্ত অন্ন ব্যঞ্জন সঙ্গে লইয়া অপর একজন পূজারির সহিত উপরে আসিয়া থাকেন। যথারীতি পূজা ও মন্ত্রপুষ্প প্রদান করিয়া, ভোগরাগ

সম্পন্ন হইলে, উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা অন্ন প্রসাদ পাইয়া, শ্রম দূর করিয়া, প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকেন। আমরা উপরে উঠিতে উঠিতে শ্রান্ত হইলেও, তত্রস্থ সুশীতল বায়ু সেবনে ক্ষণমধ্যে সুস্থ হইয়া, চতুর্দ্দিকে বহুদূরব্যাপী মনোহর দৃশ্য সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। অদূরে সিংহাচল দেখিলাম। এবং অন্য দিকে ভীমুলিপট্টন-বন্দর-সমীপে সাগরবক্ষে প্রকাণ্ড কোষ্ট ষ্টীমারকে ক্ষুদ্র জালিবোটের ন্যায় দর্শন করিলাম। অপর দিকে অর্চ্চকেরা অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা বিজয়নগর দেখাইলেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি অনুচ্চ বৃক্ষতলে ক্ষেত্রমাহাত্ম্যের ৪র্থ অধ্যায় শুনিয়া, পূজা সন্দর্শন করিলাম। যে সকল অতিরিক্ত ব্রাহ্মণেরা সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদিগের প্রতিনিধিরূপে মন্ত্রপুষ্প আবৃত্তিপূর্ব্বক দক্ষিণা লইলে, আমরা ভোগান্ন আহার করিয়া, হৃষ্টচিত্তে নিম্নদেশে আসিলাম এবং যথাক্রমে ঈশ্বরস্বামী, মৎস্যরূপী ভগবান্ ও মহালক্ষ্মীর সন্দর্শন করিলাম। প্রথম ৩টী মন্দির ক্ষুদ্র, শেষোক্ত মন্দির বৃহৎ, প্রাঙ্গণ প্রশস্ত, প্রবেশ-দ্বারোপরি বিশাল গো-পুর; দেবের নিত্য পূজা অতি সমারোহে ষোড়শোপচারে হইয়া থাকে। বাল্য, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন ভোগাদির জন্য ৮৫ সের তণ্ডুলের অন্ন প্রস্তুত হয়। অত্রস্থ বৈদিক ব্রাহ্ম

গেরা ভোগের প্রসাদ পাইয়া থাকেন ও তাহাতেই তাঁহাদের একপ্রকার দৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহ হয়; তাঁহারা ত্রিসন্ধ্যা মন্দিরে উপস্থিত হইয়া, বেদ গান ও মন্ত্রপুষ্প আবৃত্তি করিয়া বিজয়নগরের রাজাদিগের কুশল প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন সাধু সন্ন্যাসী বা যতিরা দেবালয়-প্রাঙ্গণে আসিয়া, প্রসাদলাভ করেন।

বর্ত্তমান মহারাজের প্রপিতামহ বিজয়রাম রাজ পদ্মনাভে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। ১৭৯৪খৃঃ তাঁহার সহিত পদ্মনাভের ইংরাজ-রাজের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি সম্মুখসমরে ৪৫ মিনিট যুদ্ধ করিয়া পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার আবাসবাটী একপ্রকার ধ্বংস হইয়াছিল। অধুনা, পূর্ব্বপ্রাচীর অবলম্বন করিয়া একটি ক্ষুদ্র বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা তাহাতেই আশ্রয় লইতে পাইয়াছিলাম। মহারাজের একটি গোমস্তা দেবালয়ের তত্ত্বাবধান ও আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিবার জন্য নিযুক্ত আছে। সে যাহাহউক, বৈদিক ব্রাহ্মণেরা সামান্য দক্ষিণা পাইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। আমরা তাঁহাদিগের ব্যবহারে প্রীত হইয়া, তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম।

বিজয়নগর।

বিজয়নগরের রাজাদিগের নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। এক্ষণে পূর্ব্ব-গৌরব না থাকিলেও, তাঁহারা বিশাখপত্তন জেলার প্রধান জমীদার রূপে পরিণত হইয়াছেন। ১৮৯০ খৃঃ ২৭এ সেপ্টেম্বর শনিবার তারিখে তাঁহাদিগের রাজধানী দেখিবার উদ্দেশে আমরা তথায় গিয়াছিলাম। রাজপ্রাসাদ একটি ক্ষুদ্র দুর্গের ভিতর। দুর্গটি অনেকদিনের নহে।

রাজাদিগের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত অন্ধতমসাচ্ছন্ন। তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ (১) পূসাপাটি মাধব বর্ম্মা; কণ্ডাপিল্লি সরকারের অন্তর্গত পূসাপাটি গ্রামে বর্ত্তমান (২) বিজয়বাড়া নগরের সন্নিকটে বাস করিতেন। ১৬৫২ খৃঃ মাধব বর্ম্মা (৩) শ্রীকাকোলের মুসলমান গবর্ণরের নিকট হইতে কুমিনী ও ভোগপুর নামে দুইটি তালুক ইজারা লয়েন। উক্ত সময় হইতেই রাজাদিগের যৎসামান্য বিবরণ পাওয়া যায়। ১৬৯০খৃঃ মাধব-বর্ম্মার মৃত্যু হইলে, তাঁহার

(১) Pusapates.

(২) Vija-bara.

(৩) Srekakol.

পুত্র সীতারাম বর্ম্মা ইজারাদারের পদে অভিষিক্ত হয়েন; ক্রমে তিনি আরও দশখানি তালুকের ইজারা পান ও (১) পোটনুর নামক স্থানে আপন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। ১৬৯৮খৃঃ তাঁহার পুত্র অনন্তরাজ ইংরাজ-ডেপুটি গবর্ণরের নিকট হইতে অনেক টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন। পরে অনেক কষ্টে উক্ত টাকা পরিশোধ হইয়াছিল। তাঁহারা কোন্ সময়ে রাজা উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। পূর্ব্বোক্ত সীতারামের পুত্র অনন্তরাজই, বোধ হয়, প্রথম রাজা উপাধি ধারণ করিয়া থাকিবেন। অতঃপর আমরা দেখিতে পাই, ১৭১৩ অব্দে বার্হস্পত্যম্-বিজয় সংবৎসরে শুভ আশ্বিন মাসে জয়মঙ্গলবারে শুক্ল বিজয় দশমীতে বিজয় উৎসবের সময় শুভ বিজয় লগ্নে, শুভ বিজয়ক্ষণে বিজয়রাজ কর্ত্তৃক দুর্গের পত্তন হইয়াছিল। উল্লিখিত কারণে দুর্গ ও দুর্গের বহির্ভাগের নূতন সহর 'বিজয়নগরম্' নামে অভিহিত হয়। কিংবদন্তী আছে যে, পোটনুরুর ইজারাদার রাজা উক্ত দিবসে অশ্বারোহণে সদলবলে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে এক শশককে অগ্রভাগে গমন করিতে দেখিয়া, তাহার অনুসরণ করেন।

---

(১) Patnurus.

শশক তাড়া পাইয়া পলাইতে চেষ্টা করে; স্বভাববশতঃ চতুঃসীমা প্রদক্ষিণ করিয়া, পূর্ব্ব স্থানে আসিলে, রাজা তাহাকে ধরিতে সমর্থ হয়েন। শুভ বিজয় বৎসরে, শুভ বিজয় বারে, শুভ বিজয় তিথিতে উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া, আপনি বিজয়রাজ নাম গ্রহণ করিয়া, যে সীমায় শশক প্রদক্ষিণ করিয়াছিল, তাহার উপর দুর্গের ভিত্তি স্থাপন ও পোটনুরু পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন বিজয়নগরে রাজধানী সংস্থাপন করিয়া, তথায় বাস করেন। উক্ত বিজয়-রাজের পূর্ব্ব নাম আমরা অবগত নহি।

১৭৫৬ খৃঃ মন্‌সিয়র্ বুসী দক্ষিণাপথের নিজামের নিকট সরকারের শাসনকর্ত্তার সনন্দ পাইয়া, শ্রী-কা-কোলের দিকে আসিলে, বিজয়নগরের গজপতি-বিজয়-রাম-রাজ শ্রী-কা-কোলের শাসনকর্ত্তা জাফর আলির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, বুসীর বশে আসিয়া বব্বিলীর শাসন-কর্ত্তা রঙ্গরায়কে শাসন করিতে অনুরোধ ও বুসীও তদনুসারে বব্বিলী আক্রমণ করেন। রঙ্গরায় অনেকক্ষণ দক্ষতা সহকারে দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন, শেষে গোলার আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। মরিবার পূর্ব্বে তাঁহার আজ্ঞায় রাজ-পরিবারস্থ আবাল বৃদ্ধকে অগ্নিতে ভস্মীভূত করা হইয়া-

ছিল। কোন বৃদ্ধার কৌশলে একটিমাত্র দুগ্ধপোষ্য বালক রক্ষা পাইয়াছিল। বব্বিলীধ্বংসের চতুর্থ রাত্রে বিজয়-রামরাজ আপন তাঁবুর মধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় মৃত রঙ্গ-রায়ের কোন সৈনিক দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র আনন্দরাজ তৎপদে অভিষিক্ত হয়েন। পর বৎসর বুসী হাইদ্রাবাদাভিমুখে প্রস্থান করিলে, আনন্দরাজ বিশাখপত্তন ফরাসিদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া, কলিকাতা হইতে ইংরাজদিগকে আনাইয়া, ১২ই সেপ্টেম্বরে অর্পণ ও তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করিয়া, মসূলিপত্তন পর্য্যন্ত আগমন করেন। নিজাম সলাবৎজঙ্গ ইংরাজ-সেনার গতিরোধ করিবার জন্য আসিতেছিলেন। তাহারা মসূলিপত্তন অধিকার করিয়াছে শুনিয়া, তাহাদিগের গতিরোধ অসাধ্য মনে করিয়া, ইংরাজ-সেনানায়কের সহিত সন্ধি করেন। উক্ত সন্ধিতে ইংরাজেরা সমস্ত সরকারে একাধিপত্য পাইয়া-ছিলেন এবং ফরাসিদিগের প্রভুত্ব একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছিল। মহারাজ নন্দরাজ ইংরাজ-সেনানায়কের সহিত অবস্থিতি করা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া, স্বদেশাভিমুখে যাত্রা এবং রাজমহেন্দ্রীতে আসিয়া, বসন্ত-রোগে মানবলীলা সংবরণ করেন। এই আনন্দরাজ কর্তৃক

বিশাখপত্তনে ইংরাজ আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহার সহধর্ম্মিণীরা তাঁহার সহ-মরণপূর্ব্বক সতীরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। অতএব মৃত বিজয়রাম রাজার পত্নী চন্দ্রোদয়া পুসাপাটি রামভদ্ররাজের দ্বাদশবর্ষীয় দ্বিতীয় পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিয়া, বিজয়রাম-রাজনাম প্রদানপূর্ব্বক নবরাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং দেওয়ান গন্নলা আপ্পাজির সাহায্যে ও কৌশলে রাজমহেন্দ্রীতে নিজামের দরবারে তাঁহারে পাঠাইয়া দেন। দেওয়ান নাবালক রাজাকে নিজামের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, বাৎসরিক দুইলক্ষ নব্বুই হাজার উনষাটি টাকা পেশকাশ দিতে স্বীকৃত হইলে, নিজাম নাবালক রাজাকে রাজসনন্দ প্রদান করেন। তখন উভয়ে বিজয়নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সীতারাম নামে তাঁহার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৌশলে রাজকার্য্যের ভার লইয়া, আপ্পাজীকে দেওয়ান পদ হইতে দূর করিয়া দেন। ক্রমে ক্রমে তিনি আরও কয়েকটি জমীদারকে আপন বশে আনিয়াছিলেন। তিনি প্রজাপীড়ক হইয়া উঠিলে, সকলেই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হয়। উল্লিখিত কারণে তিনি ১৭৭৫ খৃঃ অবসর লইয়া, সিংহাচল-ক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

এদিকে, কিছুদিন পরে মান্দ্রাজ-গবর্ণর রামবোল্‌ডের্ (১) অনুগ্রহে আপ্পাজী পুনরায় দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময়ে রাজস্ব ঠিক করিবার জন্য যে কমিটী হইয়াছিল, তাহার পত্রে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে বিজয়নগরের অধীনে বার হাজার একশত উনিশ জন সেনা ছিল এবং তাহাদিগের বেতনাদিতে ছয় লক্ষ তের হাজার চারিশত আটানব্বই টাকা ব্যয় হইত। ১৭৮৮ খৃঃ রাজা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে নয়লক্ষ টাকা বাৎসরিক পেশকাশ দিতে স্বীকৃত হয়েন। সীতারামের অত্যাচারবশতঃ রাজস্ব আদায় হইত না। কাজেই পেশকাশ বাকী পড়িয়াছিল। অতএব ১৭৯৩ খৃঃ মান্দ্রাজ গবর্ণর বাকী পেশকাশ আদায় করিবার জন্য এই আজ্ঞা পাঠান যে, রাজা পেন্‌সন্ লইয়া মস্‌লিপত্তনে থাকিবেন। এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ইংরাজসেনা যাইয়া, বিজয়নগরদুর্গ অধিকার করিলে, সীতারাম গবর্ণরের আদেশে পাঁচহাজার টাকা মাসিক বৃত্তি পাইয়া, মান্দ্রাজে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে বিজয়রাজ পদ্মনাভনামক স্থানে আসিয়া অন্যত্র যাইতে অসম্মত হইলে, লেপ্টন্যাণ্ট (২) কর্ণেল প্রেণ্ডার-গাষ্ট

(১) Ram-bold. (২) Lieut. Col. Pendergast.

তাহাকে বশে আনিবার জন্য, পদ্মনাভে আসিয়া উপস্থিত হন। ১৭৯৪ খৃঃ ১০ই জুলাই তারিখে পদ্মনাভের পাহাড়ের সন্নিকট উভয় দলে ৪৫ মিনিট রীতিমত যুদ্ধ হইয়াছিল। রাজা বিজয়রাম-রাজ অকুতোভয়ে ইংরাজ-সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, সেই সময়ে তিনি কুষ্ঠরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। অতএব সম্মুখসমরে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গবাস হইবে, এই বিবেচনায় ইচ্ছাপূর্ব্বক ইংরাজ-সেনার সহিত সম্মুখসমরে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

যুদ্ধের পূর্ব্বে আপন অষ্টমবর্ষীয় নাবালক পুত্র নারায়ণ বাবুকে অনুজ্ঞা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হইলে, তাঁহার মঙ্গল হইবে। বিশাখপত্তনদুর্গের গবর্ণর চার্লস উকিলীর স্বাক্ষরিত অভয়-পত্র পাইয়া, নারায়ণ বাবু ইংরাজদিগের বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৮০২ খৃঃ তাঁহার সহিত চির-বন্দোবস্তস্বরূপ পাঁচলক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা পেশ-কাশ স্থির হইয়াছিল। ১৮১৭ খৃঃ তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট শতকরা ছয় টাকা সুদে আপন জমীদারী বন্ধক রাখিয়া, বারলক্ষ টাকা লইয়া, ঋণ পরিশোধ করেন। তৎকালে কালেক্টরের তত্ত্বাবধানে

জমীদারীর রাজস্ব আদায় হইত। রাজা আপন বাৎসরিক ব্যয় জন্য ৮০ অশীতি সহস্র টাকা লইতেন। ১৮২২ খৃঃ সমস্ত দেনা পরিশোধ হইলে, নারায়ণ বাবু আপন হস্তে জমীদারীর ভার লয়েন। কিন্তু পুনরায় পাঁচবৎসরে সাতলক্ষ টাকা ঋণ করেন। ১৮২৭ খৃঃ কালেক্টরের হস্তে আপন ষ্টেটের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া, নিজের বাৎসরিক খরচ হিসাবে একলক্ষ টাকা লইবার বন্দোবস্ত করিয়া, বারাণসী ধামে বাস করিতে থাকেন। তথায় তিনি প্রাসাদ ও প্রমোদোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং দেবসেবায় অনেক টাকা ব্যয় করেন। সেই বাগানবাটী ও প্রাসাদ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৮৪৫ খৃঃ নারায়ণ বাবু বারাণসীধামে মানবলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুকালে বারাণসীতে তাঁহার এগার লক্ষ টাকার অধিক ঋণ ছিল। তৎকালে তাঁহার পুত্র গজপতি রাজের বয়স বাইশ বৎসরমাত্র হইয়াছিল। ১৮৪৮ খৃঃ ইনি বারাণসী হইতে বিজয়নগরে প্রত্যাবর্ত্তন এবং ১৮৫২ খৃঃ জমীদারীর ভার আপন হস্তে গ্রহণ করেন। তৎকালে সমস্ত দেনা পরিশোধ হইয়া, তহবিলে দুইলক্ষ বারহাজার সাতশত আটাইশ টাকা মজুত ছিল। ১৮৬৩খৃঃ ইনি মহারাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সনন্দ প্রাপ্ত

হয়েন। পরে কে, সি, এস্, আই, উপাধি লাভ করিয়া, ইণ্ডিয়ান্ গবর্ণমেণ্টের লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিলের মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর ১৮৬৪ খৃঃ মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত এবং ১৮৭৭ খৃঃ দিল্লীর রাজসূয়যজ্ঞসময়ে ১৩টী তোপ ও কে, সি, এস্, আই, উপাধিতে সম্মানিত হয়েন।

অধিকন্তু, বৃটীশ-রাজপ্রতিনিধি যে সকল রাজাদিগের সাক্ষাৎ দর্শন প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য, তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতর হইয়াছিলেন। তিনি নিজ ব্যয়ে রাস্তা, পুল, আবাদী দিঘী, হাস্পাতাল ও স্কুল তৈয়ার করিয়া দেন, বারাণসীতেও অনেক সদ্ব্যয় করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা ও মান্দ্রাজে মুক্তহস্তে দান করিতেন। তিনি উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন; সংস্কৃত-ভাষা-চর্চ্চায় উৎসাহ প্রদান ও পণ্ডিতদিগের যথেষ্ট সম্মান করিতেন। বিজয়নগরে অনেকগুলি বৈদিক পণ্ডিত অদ্যাপি রহিয়াছেন। ১৮৭৮ খৃঃ তিনিইহলোক পরিত্যাগ করিলে, তাঁহার পুত্র বর্ত্তমান মহারাজ পূসাপাটি আনন্দ গজপতি রাজ তাঁহার পদে অভিষিক্ত হয়েন। ১৮৮১ খৃঃ ইংরাজরাজ উপাধি দিয়া, তাঁহাকে সম্মানিত ও ১৩টী লোক্যাল তোপ প্রদান করেন।

১৮৮২ খৃঃ তিনি মান্দ্রাজ ইউনিভারসিটির ফেলো রূপে নির্ব্বাচিত হয়েন। এবং ১৮৮৪ খৃঃ মান্দ্রাজ-গবর্ণমেণ্টের লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলের অবৈতনিক সভ্যরূপে ও তৎপরে ইণ্ডিয়ান্ গবর্ণমেণ্টের সভ্যরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় তিনি পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত আছেন। ইনিও উদারপ্রকৃতির লোক, সৎকার্য্যে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি ইনি মান্দ্রাজ-ভিক্টর্-হল-নামক প্রাসাদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বিনা সুদে ঋণদান করিয়াছেন।

বেলা ৮ আট ঘটিকার সময় আমরা বিজয়নগরে পৌঁছিয়া, জেনারেল ডেপুটী কালেক্টর রায় বাহাদুর জগন্নাথ পান্তলুর বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করি। তিনি অতি যত্নসহকারে আমাদিগকে বিজয়নগরের দেখিবার উপযুক্ত স্থান সকল দেখাইয়া দেন। প্রথমে আমরা উদ্যান এবং উদ্যানস্থ দ্বিতল অট্টালিকা দেখিতে যাই। ইহা দুর্গস্থ রাজবাটী হইতে দুই মাইল দূরে হাইরোডের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। বাগানটী অতি বৃহৎ না হইলেও, নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষে সুশোভিত। এক্ষণে বাগানের প্রতি পর্ব্ববৎ যত্ন নাই। অট্টালিকাটি অতি বৃহৎ। ইহারও মেরামত ছিল না; তবে ইহার সংস্কার হইতেছে

দেখিলাম এবং ইহা সজ্জিত করিবার নিমিত্ত মহারাজ নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকার আস্‌বাব্ ক্রয় করিয়াছেন। এই উদ্যানের উত্তরে ও রাজপথের পূর্ব্বদিকে রিসার্বড্-গেম (১) করিয়া রাখা হইয়াছে। উদ্যান দেখিয়া আমরা পরে পিপল্‌স্-পার্ক (২) (সাধারণ উদ্যান) দেখিতে আসিলাম। এই উদ্যানটী জুবিলি উপলক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজা সুলভ মূল্যে জমী দিয়াছেন এবং মিউনিসিপ্যালিটীর ব্যয়ে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। তথা হইতে আমরা প্রধান রাস্তার উপর দিয়া, পানীয় ও কৃষিকার্য্যের জলের উপযোগী দুইটি বৃহৎ দিঘী দেখিয়া প্রত্যাগমন করিলাম। রাস্তাগুলি অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অধিবাসীর সংখ্যা পঁচিশ হাজার এবং আয় প্রায় কুড়ি হাজার টাকা হইবে।

আহারান্তে রামতীর্থদর্শনে গমন করি। ইহা বিজয়নগর হইতে ৭ মাইল দূর হইবে। চারি মাইল দূরে একটি নদী পার হইতে হয়। এই স্থান স্বামী-বনবাস-রাম নামে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে যে, রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর পিতৃসত্য পালন করিবার সময়ে, এই স্থানে আসিয়া কিছু

---

(১) Reserved Game.

(২) People's Park.

দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও দ্বাদশ বৎসর বনবাসকালে পদ্মনাভনামক স্থানে ছয়মাস অবস্থিতি করেন এবং যে স্থান এখন রামতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত, তথায় রামচন্দ্র বনবাসসময়ে আসিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া, উক্ত স্থানে পাথরের শিলার উপর রাম সীতা এবং লক্ষ্মণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতেও পূজা চলিতেছিল। ঘোর কলিতে অরাজক উপস্থিত হইলে, অনাবৃষ্টি হয় এবং সকল প্রতিবাসী তথা হইতে পলায়ন করে। তজ্জন্য রামতীর্থ ক্রমে জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও বিগ্রহও মাটিঢাকা পড়ে। বিজয়নগরের পূর্ব্ব রাজা সীতারামচন্দ্রের স্বামী স্বপ্নে প্রত্যক্ষ হইয়া, পুনঃ স্থাপন করিতে প্রত্যাদেশ করিলে, তিনি জঙ্গল কাটাইয়া বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। এবং সন্নিকটস্থ হ্রদের ধারে উচ্চ স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ ও বিগ্রহ স্থাপনানন্তর নিত্য সেবার বন্দোবস্ত করিয়া, ব্রাহ্মণ-পল্লী নির্ম্মাণ করেন। দেবসেবার নিমিত্ত যে ভূসম্পত্তি দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার আয় ৭ সাত হাজার টাকা। প্রত্যহ প্রাতে ৬ ঘটিকা হইতে দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা হইতে দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত পূজা হইয়া থাকে এবং প্রতিদিন এক মণ চাউলের ভোগ হয়। ভোগান্তে ব্রাহ্মণ ও আগন্তুক

যাত্রীরা প্রসাদ পাইয়া থাকেন। বৈশাখ শুক্ল পঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কল্যাণ উৎসব হইয়া থাকে ও কন্যামাসে চিত্রানক্ষত্রে আরম্ভ হইয়া, দশদিবসব্যাপী ব্রহ্মোৎসব সমাহিত হয় এবং ধনুমাসে শুক্ল একাদশী হইতে একমাসব্যাপী অধ্যয়নোৎসব হইয়া থাকে। তৎকালে চতুর্ব্বেদ, অষ্টাদশ-পুরাণ, মহাভারত ও রামায়ণ পূর্ণ পাঠাদি হয়। বিজয়নগরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান জগন্নাথ রাজ সাহেব মন্দিরের বহিঃপ্রাকার নির্ম্মাণ করিয়া দেন। পূর্ব্বোক্ত সীতারাম চন্দ্র কোন্ সময়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। তবে পুসাপাটি মাধব বর্ম্মার পুত্র সীতারাম চন্দ্র ১৬৯০ খৃঃ ইজারাদাররূপে পোটনুরু নামক স্থানে বাস করিতেন। সেই হিসাবে ৩ শত বৎসর পূর্ব্বে স্বামীর পুনঃ স্থাপন হইয়াছে বলা যাইতে পারে মাত্র। মন্দিরের সম্মুখে ব্রাহ্মণষ্ট্রীটের উভয় পার্শ্বে অর্চ্চক ও বেদপাঠক ব্রাহ্মণদিগের বাস। উক্ত ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা মন্দ নহে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলাম।

পরদিবস প্রাতে সহর ক্যান্টনমেণ্ট এবং বড় দীঘী দেখিতে যাইলাম। দুর্গের পশ্চিমে দুই মাইল দূরে ক্যান্টনমেণ্টে একদল কালা সিপাই থাকে। তথাকার

রাস্তা অতি প্রশস্ত ও পরিষ্কার। দুর্গের দক্ষিণ দিকে বৃহৎ আবাদী দীঘি। সেই দীঘির পশ্চিম পাড়ে পূর্ব্বোক্ত পি, জগন্নাথ রাজ ১৮ ঘর ব্রাহ্মণকে বাস করাইয়াছিলেন।

অপরাহ্নে দুর্গমধ্যস্থ রাজপ্রাসাদ দেখিতে গিয়াছিলাম। পূর্ব্বদিকস্থ একটিমাত্র দুর্গপ্রাচীরে প্রবেশদ্বার তাহাও অপ্রশস্ত। সম্মুখে প্রাঙ্গণ, মধ্যস্থলে দ্বিতল বৃহৎ অট্টালিকা। উহা নূতন প্রকরণে সজ্জিত। গ্লেজ দরজায়, পেনেল দরজায়, প্রত্যেক আয়নায় ও আস্বাবে মহারাজের নামের আদ্যক্ষর ইংরাজিতে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই সকল আস্বাব ফরমাইস্ দিয়া বহু ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। নিম্নতলের বৃহৎ দালানে মহারাজের লাইব্রেরি, বহুমূল্যের মেহগ্নি কাষ্ঠের আল্মায়রাতে অসংখ্য পুস্তক সজ্জিত রহিয়াছে। এই লাইব্রেরিতে সাধারণের বিশেষ কিছুই উপকার নাই। এই হলের দক্ষিণদিকে মহারাজের বসিবার কক্ষ। তথায় তিনি কদাচিৎ আইসেন। উপর তলের বৃহৎ দালানে বৈটক্খানা। তৎপার্শ্বে বিলিয়ার্ড-রুম। এই বৃহৎ অট্টালিকা বহুমূল্য আস্বাবে সজ্জিত। দেশীয় কেহ ইহাতে বসিতে পান নাই। বর্ত্তমান জেনারেল ডেপুটী

কলেক্টর কোন সময়ে তাঁহার কোন বন্ধুকে রাজ-ভবন দেখাইতে লইয়া গিয়া, ভ্রমবশতঃ চেয়ারে বসিবামাত্র, উপস্থিত রাজকর্ম্মচারী নিষেধ করিয়া, তাঁহাকে উঠিতে কহেন ও রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করাইয়া দেন। উক্ত ব্যাপার তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি। এই অট্টালিকার দক্ষিণদিকে বৃহৎ অন্দরমহল, তাহার একপার্শ্বে মহারাজের নিত্য বসিবার স্থান। পূর্ব্বদিকস্থ দুর্গ প্রাচীরের ভিতর ও ফটকের বামভাগে একসারি গুদামঘর। মহারাজের অস্ত্রাগারে বন্দুক, বল্লাম, পিস্তল, তরবারি, ছোরা, আশাসোটা, ঘোড়া হাতী চড়িবার দেশীয় জিন্, হাওদা, ধূমপানের ফরসি নল্ ইত্যাদি সরঞ্জমাদি সজ্জিত রহিয়াছে। উত্তর ও পশ্চিম প্রাচীরের ধারে একসারিতে কাছারি ঘর। অট্টালিকা প্রাচীরের মধ্যস্থলের প্রাঙ্গণটী উদ্যানরূপে পরিণত হইয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব মহারাজ একটি কলেজ, আর্ট স্কুল, দাতব্য-চিকিৎসালয় ও কয়েকটি ছত্রবাটী প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজবিভাগে চল্লিশটি এবং স্কুলবিভাগে ছয়শত বালক অধ্যয়ন করিতেছে। এতদ্ব্যতীত, একটি মিউনিসিপ্যাল স্কুল ও দুইটি প্রাইভেট স্কুল আছে। আর্টস্কুল

বাটীতে এক্ষণে সোডাওয়াটার ও বরফ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিজয়নগরে ক্যান্‌টন্‌মেণ্টের অল্‌টেয়ারের ও ভীমলি পত্তনের ইংরাজ অধিবাসীরা বরফ ও এরিয়েটেড ওয়াটার ব্যবহার করিয়া থাকেন বলিয়া, গত বৎসর খরচ খরচা বাদে পনর শত টাকা লাভ হইয়াছিল। সহরে জলের সমাবেশ করিয়া দিবেন বলিয়া, মহারাজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে, তাঁহার রাজধানীর বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। বিজয়নগরে দেখিবার উপযুক্ত বিশেষ কিছুই নাই।

বিজয়বাড়া।

আমরা বিজয়বাড়ায় প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত করি। ইহা বর্ত্তমান কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত "বিজয়বাড়" প্রধান নগর, কৃষ্ণা নদীর বাম তীরে ইন্দ্রকীলাদ্রি নামক পাহাড়ের পূর্ব্বদিকের উপত্যকায় অবস্থিত। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, এই নামটি বিছা (বৃশ্চিক) ও বাড়া (স্থান)। অথবা বিছু হিন্দুবৃশ্চিক ও বাড়া শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। নগরটি পর্ব্বতের উপত্যকায় বলিয়া সর্ব্বদাই বৃশ্চিকের উপদ্রব হইয়া থাকে। অপরে কহেন, ইহা বিজয়বাড়ার অপভ্রংশ। যে কয়েকটি প্রস্তরখোদিত অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার সকল গুলিতেই বিজয়বাড়া শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

পর্ব্বতটি ইন্দ্রকীলাদ্রি নামে অভিহিত। সকলেই অবগত আছেন যে, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন ইন্দ্রকীলাদ্রি-নামক পাহাড়ের উপর দেবদেব মহাদেবের উদ্দেশে তপস্যা করিয়াছিলেন। তথায় কিরাতরূপী মহাদেবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তৎপরে মহাদেব অর্জ্জুনের যুদ্ধ-কৌশলে অতীব প্রীতি লাভ করিয়া, পাশুপত অস্ত্র

প্রদান করেন। অর্জ্জুনের দশ নামের মধ্যে অন্যতর নাম বিজয়। এখানে লোকের বিলক্ষণ বিশ্বাস যে, তৃতীয় পাণ্ডব বিজয় এই ইন্দ্রকীলাদ্রিতেই মহাদেবের তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নাম হইতে বিজয়-বাড়া নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহারা আরও কহিয়া থাকেন যে, পাণ্ডবেরা বনবাসের অধিকাংশ সময়ই দাক্ষিণাত্যে ছিলেন এবং যৎকালে বিজয় তপস্যার্থে গমন করেন, অপর পাণ্ডবেরা পদ্মনাভনামক পাহাড়ে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ন্যূনাধিক ছয় মাস বাস করেন। (পদ্মনাভের বিবরণ দেখ) এই লোক-প্রবাদ কতদূর সত্য, জানি না। লোকের বিশ্বাস যে, এই ইন্দ্রকীলাদ্রির সর্ব্বোচ্চ দেশে বাটীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার একটিতে বিজয় তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কহেন যে, কৃষ্ণানদীর তীর পুণ্যভূমি বলিয়া, এই ইন্দ্রকীলাদ্রিতে ও নিকটস্থ অন্য পাহাড়ে অনেক সিদ্ধ ঋষি বাস করিতেন। এখনও বৃদ্ধেরা কহিয়া থাকেন যে, তাঁহারা শৈশবে দুই একটি সাধুকে ইন্দ্র-কীলাদ্রি পাহাড়ে থাকিতে দেখিয়াছেন। পাহাড়ের গায়ে সাধুদিগের থাকিবার উপযুক্ত গোটাকয়েক ক্ষুদ্র গহ্বরও দৃষ্ট হইয়া থাকে। গোদাবরী জেলার আবগারি

সুপরিন্‌টেণ্ডেণ্ট রেডেম-ধর্ম্মরাও-নাইডুগারুর সহিত সম্প্রতি সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৫ বৎসর। তিনিও কহিলেন যে, তাঁহার ১২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি তাঁহার খুল্লতাতের সহিত বিজয়বাড়ায় আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে সাধু সকল ইন্দ্রকীলাদ্রিতে বাস করিতেছেন শুনিয়া, কৌতূহলবশতঃ তাহা দেখিবার জন্য কয়েক দিবস উপর্য্যুপরি যাতায়াত করিয়া, একটি সাধু দর্শন করিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে যতদিন এখানে ছিলেন, প্রত্যহ সেই সাধুকে দর্শন করিতে যাইতেন। পুরাণে কৃষ্ণা পুণ্যনদী বলিয়া কথিত না হইলেও, এপ্রদেশে ইহা পুণ্যনদী বলিয়া বিশ্রুত। কৃষ্ণা-প্রেসের ম্যানেজার গোবিন্দরাজ-রামাপ্পাগারু কৃষ্ণা-মাহাত্ম্যের দুইখানি পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিতেছেন। উহা ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের অন্তর্গত ও ১২টী অধ্যায়ে সমাপ্ত। যাহাই হউক, কৃষ্ণা একটি পুণ্যতীর্থ। গত ১৫ই নভেম্বর তারিখে যে চন্দ্রগ্রহণ হইয়া গিয়াছে, তদুপলক্ষে বহু লোক দূরদূরান্তর হইতে রেলপথে আসিয়া, কৃষ্ণায় স্নান করিয়াছিল। শিবরাত্রি উপলক্ষেও বহুদূর হইতে লোক আসিয়া, কৃষ্ণায় স্নান করিয়া, মহাদেব মল্লেশ্বরের ও ভ্রমরম্বা-মল্লেশ্বর স্বামীর

পূজা ও রথোৎসব দর্শন করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, মহাভারতের লিখিত বিবরণ দৃষ্টে, যে ইন্দ্রকীলাদ্রিতে তৃতীয় পাণ্ডব তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা হিমালয়ের উত্তরদিকে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যথা,—

"ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা ভ্রাতৃন্ ধৌম্যঞ্চ পাণ্ডবঃ।
প্রাতিষ্ঠত মহাবাহুঃ প্রগৃহ্য রুচিরং ধনুঃ॥ ৩৬॥
তস্য মার্গাদপাক্রামন্ সর্ব্বভূতানি গচ্ছতঃ।
যুক্তস্যেন্দ্রেণ যোগেন পরাক্রান্তস্য শুষ্মিণঃ॥ ৩৭॥
সোঽগচ্ছৎ পর্ব্বতাংস্তাত তপোধননিষেবিতান্॥ ৩৮॥
দিব্যং হৈমবতং পুণ্যং দেবজুষ্টং পরন্তপঃ।
অগচ্ছৎ পর্ব্বতং পুণ্যমেকাহ্নেব মহামনাঃ।
মনোজবগতির্ভূত্বা যোগযুক্তো যথানিলঃ॥ ৩৯॥
হিমবন্তমতিক্রম্য গন্ধমাদনমেব চ।
অত্যক্রামৎ স্বদুর্গাণি দিবারাত্রিমতন্দ্রিতঃ॥ ৪০॥
ইন্দ্রকীলং সমাসাদ্য ততোঽতিষ্ঠদ্ধনঞ্জয়ঃ।
অন্তরীক্ষেঽতিশুশ্রাব তিষ্ঠেতি স বচস্তদা" ॥ ৪১॥

ইহার পর ৩৮ অধ্যায় দেখিবেন।

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক যথা,—

"ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি পার্থস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
বিস্তরেণ কথামেতাং যথাস্ত্রাণ্যুপলব্ধবান্॥"

অন্ত্যশ্লোক যথা,—বৈশম্পায়ন উবাচ।

"তচ্ছ্রুত্বা শর্ব্ববচনমৃষয়ঃ সত্যবাদিনঃ।
প্রহৃষ্টমনসো জগ্মুর্যথা স্বান্ পুনরালয়ান্॥"

ইহার পর ৩৯ অধ্যায় ১ম শ্লোক।

"গতেষু তেষু সর্ব্বেষু তপস্বিষু মহাত্মসু।
পিনাকপাণির্ভগবান্ সর্ব্বপাপহরো হরঃ॥"

অন্ত্যশ্লোক যথা,—

"পরিষজ্য চ বাহুভ্যাং প্রীতাত্মা ভগবান্ হরঃ।
পুনঃ পার্থং সান্ত্বপূর্ব্বমুবাচ বৃষভধ্বজঃ" ॥

ইহার পর ৪০ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক যথা,—

"নরস্ত্বং পূর্ব্বদেহে বৈ নারায়ণসহায়বান্।
বদর্য্যাং তপ্তবানুগ্রং তপো বর্ষাযুতান্ বহূন্॥"

অন্ত্যশ্লোক যথা,—

"ততঃ শুভং গিরিবরমীশ্বরস্তদা
সহোময়া সিততটসানুকন্দরম্।
বিহায় তং পতগমহর্ষিসেবিতং
জগাম খং পুরুষবরস্য পশ্যতঃ॥"

তৃতীয়-পাণ্ডব-সম্বন্ধে লোকপ্রবাদ সত্য না হইলেও, বিজয়বাড়া যে অতি পুরাতন নগর, তাহার আর সন্দেহ

নাই। কৃষ্ণা নদীতে "আনিকট" (১) করিয়া, ১৮৫২ হইতে ১৮৫৫ সালে উহার উভয় তীরে পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত এবং উহার হেড অফিস (মূলকার্য্যস্থান) বিজয়-বাড়াতেই হইয়াছে। এখানে কৃষ্ণার উভয় তীরে পর্ব্বত থাকাতে এবং উহার পরিসর ৩৮৬০ ফুটমাত্র বলিয়া, আনিকটের বাঁধ ইন্দ্রকীলাদ্রির নিকটেই রহিয়াছে। বিজয়বাড়ার তীরে পয়ঃপ্রণালী ও বেসিনূলক্ অর্থাৎ কপাটে কল প্রস্তুত করিবার সময়ে মাটীর ভিতর কয়েকটী কূপ, একটি প্রস্তরময় প্রাচীর এবং বহুবিধ হিন্দু-দেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। সেই সমস্ত অদ্যাপি লাইব্রেরি হাউসের কম্পাউণ্ডে (পুস্তকালয়-গৃহের চত্বরে) রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে একটি বৃহৎ লিঙ্গের অধোদিকে ব্রহ্মার মূর্ত্তি ও ঊর্দ্ধদিকে বিষ্ণুর মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। উহা লিঙ্গপুরাণোক্ত ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক লিঙ্গের আদি অন্ত নির্দ্ধারণের চিত্র। এতদ্ব্যতীত, একটি নরসিংহ স্বামীর মূর্ত্তি ও একটি প্রস্তরফলকে হনুমানের মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। কয়েকটী ষাঁড় ও একটি বৃহৎ নন্দিমূর্ত্তিও আছে। উক্ত মূর্ত্তিগুলির অধি-

(১) কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য নদী প্রভৃতি হইতে পয়ঃপ্রণালীযোগে জল আনিয়া, স্থলবিশেষে একত্র জমা করিয়া রাখা।

কাংশই গ্রেনাইট অর্থাৎ পাংশুবর্ণের প্রস্তরবিশেষে নির্ম্মিত। নিজাম রেলওয়ের দ্রব্যাদি নামাইবার ডকের সন্নিকটে এস্থরখালের দক্ষিণ তীরে নীলবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত একটি ভগ্ন নন্দীমূর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে। শুনিলাম, তাহাও খাল খনন করিবার সময়ে ভূগর্ভ হইতে পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান নিজাম রেল-ষ্টেশন-বাটীর ভিত্তি খননকালে ভূগর্ভমধ্যে মন্দিরের শিখরদেশ দৃষ্ট হইয়াছিল। বকিংহামগেটনামক পল্লীতে এই বৎসর অলপতি জানকীরাম আইয়ার গারুর নূতন বাটীর প্রাঙ্গণে একটি কূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই কুপটি ৩৬ ফুট গভীর। তাহা খনন করিবার সময়ে একটি পুরাণ দেওয়াল দৃষ্ট হইয়াছিল। এই সমস্ত দেখিয়া একপ্রকার স্থির করা যাইতে পারে যে, পুরাকালে এই বিজয়বাড়া একটি বর্দ্ধিষ্ঠ নগর ছিল। কৃষ্ণা নদীর পলিতে ক্রমে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ঐ নগরটি অতি বিস্তীর্ণ ছিল। তখন কৃষ্ণা ইন্দ্রকীলাদ্রির উত্তর দিক দিয়া বহিত;—এখন যেস্থান দিয়া 'বুডমেরু' নামক নদী প্রবাহিত হইতেছে। লোকে কহিয়া থাকে, কৃষ্ণা পূর্ব্বে ঐ স্থান দিয়া বহিত; কোন কারণবশতঃ তাহার গতির পরিবর্ত্তন হইয়া, উক্ত অদ্রির

দক্ষিণ দিক্ দিয়া বহিতে থাকিলে, ক্রমে পুরাতন পুরীটি পলিমাটির দ্বারা ঢাকিয়া যায়। ভূ-তত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন, এক সময়ে সমুদ্র এই পাহাড়ের সন্নিকটেই ছিল। ক্রমে কৃষ্ণা-নদী প্রতিবর্ষায় পঙ্কিল জলের সহিত যে পলি আইসে, তাহা দ্বারা সাগর-গর্ভ পূর্ণ করিয়া, সাগরকে ৪৭ মাইল দূরে অপসারিত করিয়াছে। তাঁহারা আরও কহেন যে, এই কার্য্যে ৫০০০ হাজার বৎসরের অধিক সময় লাগিয়াছে। ইহা বিচিত্র ঘটনা নহে; বঙ্গদেশেও অনেক স্থানে নদীর গতি এক স্থান হইতে অপর স্থানে গিয়াছে। কলিকাতার সন্নিকট ত্রিবেণী হইতে সাম্বরাল্ পর্য্যন্ত সরস্বতী নদী প্রবাহিত হইত এবং তাহা দিয়া ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে পর্টুগীজ ও দিনেমার বণিকেরা হুগলি এবং চুঁচুড়ায় যাতায়াত করিত। ইংরাজেরা কলিকাতায় বন্দর স্থাপন করিয়া, খিদিরপুর শাম্বরাল পর্য্যন্ত একটি খাল খনন করিবার পর, ত্রিবেণী হইতে সরস্বতী ও খিদিরপুরের দক্ষিণে গঙ্গা মজিয়া গিয়াছে। এই ব্যাপার সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঘটিয়াছে।

আবার, ব্রহ্মপুত্র এক সময়ে ময়মনসিংহের উপর দিয়া প্রবাহিত হইত। এখন উহা ময়মনসিংহ হইতে

৬০ মাইল পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে। এবিষয়ে একটি প্রবাদ আছে যে, ব্রহ্মপুত্রের জলে উভয় তীর প্লাবিত হইত বলিয়া, তীরের অনতিদূরে উহার একটি প্রতি-রোধক (Protectiue) বাঁধ ছিল। এক সময়ে বানের জল সেই বাঁধের মুখ পর্য্যন্ত যাইলে, কোন অদূরদর্শী ব্যক্তি সন্ধ্যার পরে গোপনে ঐ বাঁধের এক অংশ দা দ্বারা কাটিয়া ঘুনি বসাইয়া আইসে। পরদিন প্রাতে দেখিল যে, সেই স্থান দিয়া নদী প্রবাহিত হইতেছে। ক্রমে সেই স্রোত পূর্ব্বাভিমুখে যাইয়া, তিস্তা-নদীতে মিলিত এবং দক্ষিণবাহী ও পদ্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া, বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। সেই অবধি যে স্থান হইতে ব্রহ্মপুত্র পশ্চিমবাহী হইয়া, তিস্তায় মিলিত হইয়াছে; তাহা দা-কোবা নামে কথিত হইয়া থাকে। জৈন পরি-ব্রাজক হিয়নৃসিয়ান্ ৬৪০ অব্দে বঙ্গোপসাগরতীরে তাম্র-লিপ্ত (তমলুক) দেখিয়াছিলেন। সমুদ্রতীর এখন তথা হইতে ২০ মাইলের অধিক দূর হইবে। অতএব নদীর মুখে সমুদ্রতীর সদাই হটিয়া যাইতেছে দেখা যায়।

পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রকীলাদ্রি খোদিত অনুশাসনেও উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। মিষ্টার্ রবার্ট সিবেল্ (Sewell) অনেক দিন এই জেলার কলেক্টর ছিলেন

এবং তৎকালে অনেক প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি অনুমান করেন যে, ইন্দ্রকীলাদ্রির গাত্রে যে সকল কাটিং অর্থাৎ খণ্ডিত অংশ দৃষ্ট হয়, তথায় পূর্ব্বে বৌদ্ধ-মঠ ছিল। চীন-পরিব্রাজক হিয়ন্‌সিয়ন ৬৩৯ অব্দে উহা পরিদর্শন করিয়াছেন। তৎকালে তিনি উক্ত পর্ব্বতে আরও দুইটি মঠ দেখেন। তন্মধ্যে তিনি একটীকে পূর্ব্ব-মঠ ও অপরটীকে পশ্চিম-মঠ নামে অভিহিত করিয়াছেন। সেই হিসাবে বোধ হয়, মৃদ্‌গর্ভস্থ পুরীটী 'বেঙ্গি' হইবে। আরও বোধ হয়, ৬০৫ অব্দে 'বেঙ্গি' রাজ্য কুব্জা-বিষ্ণু-বর্দ্ধনকর্ত্তৃক নষ্ট হইবার সময়ে কৃষ্ণার পলি মাটিতে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ফরগোসন সাহেব অনুমান করেন যে, যৎকালে হিয়ন্‌সিয়ন্‌ অমরাবতীসন্দর্শনে আইসেন, সেই সময়ে বিজয়বাড়া পুরাতন 'ধনকাচুর' রাজ্যের রাজধানী এবং অমরাবতী ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রাজধানী ছিল। তাঁহার মতে উক্ত রাজ্যের পরিসর সহস্র মাইল এবং উহা পশ্চিমে গুলবার্ক ও পেন্নুকোণ্ডা, পূর্ব্বে বঙ্গোপ-সাগর, দক্ষিণে নেল্লুর এবং উত্তরে গোদাবরী ও অন্ধ্র-কলিঙ্গ রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উহার রাজা বৌদ্ধ-মতাবলম্বী ছিলেন। এখন অমরাবতীর ধ্বংসাবশেষ এখান হইতে প্রায় ২০ মাইল অন্তরে কৃষ্ণানদীর ধারে

'সত্তেনাপল্লী' তালুকে দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণা জেলার ইতিবৃত্তে কুব্জা বিষ্ণুবৰ্দ্ধন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত চালুক্যবংশীয় রাজাদিগের বিবরণীতে দুইবার বিজয়াদিত্যেয় নাম দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ এই দুই বিজয়াদিত্যের মধ্যে অন্যতর কর্তৃক ইন্দ্রকীলাদ্রির উপত্যকায় নূতন নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহারই নামে উহা অভিহিত হইয়াছে।

যাহা হউক, মিষ্টার সিবেলর মতে পুরাতন সহরটি বেঙ্গি দেশের রাজধানী ছিল। ৬০৫ অব্দে কল্যাণপুরের রাজা সত্যাশ্রয়-বল্লভদ্রের কনিষ্ঠ কুব্জা বিষ্ণুবৰ্দ্ধন পল্লভবংশীয় রাজাদিগের নিকট হইতে বেঙ্গি অধিকার করিয়া, পূর্ব্ব চালুক্য রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারা ৬০৫ হইতে ১০২৩ অব্দ পর্য্যন্ত নেল্লুর ও কৃষ্ণা জেলা শাসন করিয়াছিলেন। ১০২৩ অব্দে চোলবংশীয় রাজা রাজনরেন্দ্র চালুক্যরাজদিগকে পরাভূত করিয়া, চোলবংশ স্থাপন ও ১২২৮ অব্দ পর্য্যন্ত 'বেঙ্গি' শাসন করেন। পরে উক্ত অব্দে বরঙ্গলের কাকতিয়া রাজারা চোল রাজাদিগকে পরাভূত করিয়া, ১৩২৩ অব্দ পর্য্যন্ত বেঙ্গিদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ১৩২৩অব্দে শেষ রাজা প্রতাপরুদ্র দিল্লীর সম্রাট কর্ত্তৃক পরাভূত ও বন্দি হইয়া, দিল্লীতে প্রেরিত হইলে 'বেগওা-বিড়ুর' পুলয়-বেমা-

রেড্‌ডী সুযোগ পাইয়া, স্বাধীন হইয়া, পুরাণ বেঙ্গি-রাজ্য অধিকার করিয়া, বর্ত্তমান নেল্লুর ও কৃষ্ণা জেলায় রেড্‌ডীরাজবংশ স্থাপন করেন। উক্তবংশীয়েরা ১০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

পুলয়বেমা রেড্‌ডী	১৩২৮	হইতে	১৩৩৯
অনুবেমা রেড্‌ডী	১৩৪০	"	১৩৬৯
আলিয়া বেমা রেড্‌ডী	১৩৭০	"	১৩৮১
কুমারগিরিবেমা রেড্‌ডী	১৩৮২	"	১৩৯৫
কুমতীবেঙ্করেড্‌ডী	১৩৯৬	"	১৪২৩
রাকারেমারেড্‌ডী	১৪২৪	"	১৪২৮

পুলয়বেমারেড্‌ডী কোণ্ডা বিডুদুর্গে থাকিয়া, রাজ্য শাসন করিতেন। বেল্লমকোণ্ডা, বিনুকোণ্ডা, নাগার্জ্জুন-কোণ্ডা প্রভৃতি কয়েকটি দুর্গ তাঁহার অধীনে ছিল। তাঁহার ভ্রাতা বা উত্তরাধিকারী পূর্ব্বে রাজমহেন্দ্রি, দক্ষিণে কাঞ্চীপুর ও পশ্চিমে শ্রীশৈল পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি কোণ্ডাপল্লীর পার্ব্বতীয় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং অমরেশ্বরনামক স্থানে প্রাপ্ত ১৩৬১ অব্দের একটি অনুশাসনে বিজ্ঞাপিত করিতেছে যে, রায়চুর দুর্গও তাঁহার অধীনে ছিল এবং তিনি অমরা-

বস্তীর দেবালয়ের সংস্কার করেন, শ্রীশৈলতীর্থের সেতু প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন ও বরঙ্গলের রাজাদিগকে সমরে পরাভূত করিয়াছিলেন। শেষ রেড্ডী রাজা রাকাবেমা রেড্ডী ১৪২৮ অব্দে চৌধুরী এল্লপ্প নামে কোন ভৃত্য কর্ত্তৃক নিহত হইলে, সেই বংশের ধ্বংস হয়। তখন হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উড়িষ্যার গজপতি রাজারা কৃষ্ণা জেলায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। রাজা কোপিলেশ্বর গজপতির নামে 'নুজবীডুর' অন্তর্গত কোপিলেশ্বরপুর নামে গ্রাম প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী বিদ্যাধর গজপতির নামেও বিদ্যাধরপুর নামে আর এক গ্রাম সংস্থাপিত হইয়াছে। তিনি কোণ্ডাপল্লীর নিকটে একটি কূপও নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার স্ত্রী ভবানম্মার নামে ভবানীপুর ও কন্যাদ্বয় মতিয়ালম্মা ও পদম্মার নামে মতিয়ালম্মাপাড়ু ও পৈদুর পাড়ু নামে গ্রামদ্বয় অদ্যাপি বেজবাড়া তালুকে রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সময় হইতে ১৫১৫ অব্দ পর্য্যন্ত স্বাধীন হিন্দুরাজ কর্ত্তৃক শাসিত হইত, কি মুসলমানদের অধীনে ছিল, তাহার কোন স্থিরতা নাই। বিজয়নগরের কৃষ্ণদেবরায় ১৫১৫ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। যখন তিনি উদয়গিরি-কোণ্ডাবিডু অধিকারভুক্ত করিয়া

কটক পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, তখন ইহা তাঁহার শাসনভুক্ত হইয়াছিল। ১৫১৫ অব্দে তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়-নগর উচ্ছিন্ন হইলে, বিজয়বাড়া ও অন্যান্য প্রদেশ গোলকন্দার মুসলমানরাজা কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। পরে ১৭৪৯ অব্দে মৎস্যপত্তনের সহিত বিজয়বাড়া ইংরাজ-শাসনভুক্ত হইয়াছে।

এই জেলায় অনেকগুলি পুরাতন অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে পূর্ব্ব-চালুক্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিষ্ণুবর্দ্ধনের প্রদত্ত অনুশাসন অন্যতর। উহা সাত্তেনা-পল্লী তালুকের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ অমরাবতী হইতে ৮ মাইল দূরে মুনুগুড়্ গ্রামে ও গুড়ীবড় তালুকের অন্তর্নিবিষ্ট মণ্ডপাড়্ গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। তদ্‌ব্যতীত, চোল রাজাদিগের প্রদত্ত ১০৩ হইতে ১২২২ অব্দের, বরঙ্গলের কাকতীবংশীয় রাজাদিগের প্রদত্ত ১২৩১ হইতে ১৩০০ অব্দের, রেড্‌ডী রাজাদিগের প্রদত্ত ১৩২৮ হইতে ১৪২৮ অব্দের এবং বিজয়বাড়া তালুকের 'পোত্তাবর' জক্কম্পুড়ি গ্রামে চোলরাজ-প্রদত্ত ১১৫৭ অব্দের ৩টী অনুশাসনও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে বিজয়বাড়া বর্দ্ধিষ্ঠ থাকিলেও, বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে উহা পর্ব্বতের উপত্যকায় একটি

সামান্য গ্রামে পরিণত হইয়াছিল। কৃষ্ণাজেলায় ১৮৩২ অব্দে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তাহাতে দুই কোটী সাতাইশ লক্ষ টাকা রাজস্ব নষ্ট হইয়াছিল। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট কৃষ্ণা-নদীতে আনিকট বাঁধিয়া, উভয় তীরে ইরিগেশন অর্থাৎ জলসেচন ও নেভিগেশন অর্থাৎ নাবিক কার্য্যের উপযোগী পয়ঃপ্রণালী কাটিয়া, কৃষি-কর্ম্মের সুবন্দোবস্ত করিবার মানসে ১৮৫৫ অব্দে তাহার কার্য্য আরম্ভ করেন। সেই সময় হইতে বিজয়-বাড়ায় আনিকট প্রস্তুত করিবার জন্য অধিক লোক আসিয়া বাস করিয়াছিল। পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত হইয়া যাইলে, ইহা একটী বন্দরে পরিণত হয়। তখন হইতে ইহার উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে। ১৮৮৫ অব্দে নিজাম ষ্টেট্ রেলওয়ের বিজয়বাড়া অংশের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হওয়া অবধি, অনেক লোক এখানে আসিয়া বাস করি-তেছে। সেই সময়ে বন্দর ও এলোর খালের মধ্যস্থ ভূখণ্ডে বকিংহামগেটের সূত্রপাত হয়। উক্ত স্থানে তিনটিমাত্র আবাস-গৃহ ছিল। এক্ষণে তথায় ৪০০শতের অধিক বাস-গৃহ হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে দক্ষিণ-মহারাষ্ট্র-রেলওয়ের বেলারি-কৃষ্ণা-বিভাগ সীতানগরের খালের তীরে আসিয়া শেষ হইয়াছিল। ইষ্টকোষ্ট অর্থাৎ পূর্ব্ব

উপকূলিক রেলওয়ে এই স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং তাহার কার্য্য চলিতেছে। কৃষ্ণা-নদীর উপর ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লৌহ-সেতু নির্ম্মিত হইতেছে। মান্দ্রাজ-বেজবাড়া-রেলের ও বেজবাড়া-বন্দর-রেলের পরিদর্শনকার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। উহার প্ল্যান এষ্টিমেট্ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান-মীমাংসা গবর্ণমেন্টের বিচারাধীনে রহিয়াছে। অতি সত্বরেই তাহার কার্য্য আরম্ভ হইবে; ইহাও অনেকটা জানা গিয়াছে। এক্ষণে এই নগরে মান্দ্রাজ বিজয়বাড়া-রেল, দক্ষিণ-মহারাষ্ট্র-রেল, নিজাম-ষ্টেট্-রেল, পূর্ব্ব উপকূলিক রেল ও বেজবাড়া-বন্দর-রেলের জংশন অর্থাৎ সম্মিলিত ষ্টেশন হইবে। তাহা হইলে, এই নগর ক্রমশই উন্নতি করিতে থাকিবে এবং পূর্ব্ব-গৌরব পুনঃ প্রাপ্ত হইবে।

উক্ত নগর মিউনিসিপালিটীর শাসনাধীন; ক্রমে নূতন বর্ত্ম সকল প্রস্তুত ও নূতন পল্লী সকল নির্ম্মিত হইতেছে। এই বৎসরের জনসংখ্যায় লোক পরিগণিত হইয়াছে। মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত যে টেলিগ্রাফ লাইন অর্থাৎ বৈদ্যুতিক সরণি গিয়াছে, তাহার একতর পোষ্ট অর্থাৎ স্তম্ভ কৃষ্ণা-নদীর দক্ষিণ তীরে আনিকটের ধারের সীতানগরের পাহাড়ের উপর আনিকট হইতে ৩৭২ ফুট

উচ্চে ও অপর স্তম্ভটি ইন্দ্রকীলাদ্রির উপরে আনিকট হইতে ৪০৫ ফুট উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত। এই দুই স্তম্ভের ব্যবধান ৫০০০ হাজার ফুট।

ইন্দ্রকীলাদ্রির পূর্ব্ব অংশে কনক-দুর্গার মন্দির। লোকের বিশ্বাস যে, এক সময়ে কনক-দুর্গা স্বর্ণবর্ষণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য আপামর সকলেরই তাঁহার উপর প্রগাঢ় ভক্তি। নবরাত্রির সময় দশমীতে অতি সমারোহে কনক-দুর্গার উৎসব হইয়া থাকে। এই মন্দিরের সম্মুখে স্তম্ভে কয়েকখানি অনুশাসন খোদিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে ১৫১৮ অব্দের একটি অনুসাশনে জ্ঞাত করিতেছে যে, বিশাখপত্তনের অন্তর্গত বিজয়-নগরের রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাতাদিগের আদিপুরুষ মাধব-বর্ম্মা চারি বর্ণের রজপুত সহিত ৫৯১ অব্দে বিজয়বাড়ায় আসিয়া, পশুপতিনামক গ্রামে অবস্থিতি করিয়া-ছিলেন। সেই হেতু তাঁহারা পশুপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ১৬৫২ অব্দে তদ্বংশীয় পশুপতি-মাধব-বর্ম্মা গোলকন্দার রাজাদিগের সমভিব্যাহারে শ্রী-কা-কোলে যাইয়া, তত্রত্য শাসনকর্ত্তার অধীনে কর্ম্মগ্রহণ-পূর্ব্বক ক্রমে ইজারা লইয়া, যেরূপে রাজবংশপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা বিজয়নগরের বিবরণে দেওয়া

হইয়াছে। কনক-দুর্গার মন্দিরের সন্নিকটে ইন্দ্রকীলাদ্রির গাত্রে এক স্থানে রাম ও রাবণের যুদ্ধ, অপর এক স্থানে শক্তিদেবীর মূর্ত্তি এবং তৃতীয় স্থানে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের বিগ্রহ অঙ্কিত রহিয়াছে। তথায় একটি কূপ ও সন্ন্যাসীদিগের থাকিবার কয়েকটি ক্ষুদ্র গুহাও আছে এবং একটি লিঙ্গমূর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে। কনক-দুর্গার মন্দিরের উত্তরদিকে পাহাড়ের উপর দুর্গা-মল্লেশ্বর মহাদেবের মন্দির। কেনালওয়ার্ক-সব আফিসের অর্থাৎ খাল কাটিবার জন্য যে কারখানা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার কার্য্যালয়ের পার্শ্ব দিয়া যে বেজবাড়া হাইদ্রাবাদ রাজপথ গিয়াছে, তাহার উপর পাহাড়ের গায়ে অতি পুরাতন মন্দিরে পাপবিশাল নামে মহাদেব রহিয়াছেন। মিউনিসিপ্যাল ডিস্‌পেন্সারির পূর্ব্বোত্তর দিকে ভ্রমরম্বামল্লেশ্বর স্বামীর মন্দিরটির অন্ততঃ একাংশ চালুক্য অথবা চোল-রাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার স্তম্ভে অনেকগুলি অনুশাসন রহিয়াছে।

বেজবাড়ায় পূর্ত্তকার্য্যের দ্বিতীয় বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডিং (প্রধান তত্ত্বাবধায়ক) ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব্ব ডেল্টার-এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হেড্ এসিস্ট্যাণ্ট (প্রধান সহকারী) কলেক্টর, মুন্সেফ ও তহসিলদার থাকেন। তথায়

পোষ্টআফিস, পুলিস, মিউনিসিপ্যাল ডিস্পেন্সারি, মিশন সোসাইটি স্কুল, ক্যাথলিক চ্যাপল্, সাহেবদিগের লাইব্রেরি ও ক্লব, ডাক্ বাঙ্গালা ও অপর সাধারণের বিজয়বাড়া-সেসন্-ক্লব্ রহিয়াছে। লাইব্রেরির সম্মুখে বহুবিধ দেবমূর্ত্তি সজ্জিত আছে। বকিংহাম গেটে একটি মিউজিয়ম্ বাটী (যাদুঘর) প্রস্তুত হইতেছে এবং কলেক্টর সাহেব স্বয়ং হিন্দু ছত্রের ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত করিয়াছেন।

নগরটী পর্ব্বতের উপত্যকায় বলিয়া অতিশয় গরম। পর্ব্বতের নিম্নে যে সহর আছে, তথায় প্রতিবৎসর বিসূচিকার আবির্ভাব হওয়াতে, অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু বকিংহাম গেটে উহার প্রাদুর্ভাব দেখিলাম না। এখানকার জলবায়ু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকর, জ্বরও অল্প পরিমাণে দেখা যায়। নিকটে তরকারি কিম্বা ফল জন্মে না, অন্য স্থান হইতে আসিয়া এখানে বিক্রীত হয়। সুতরাং সমস্ত দ্রব্যই এলোর বন্দর অপেক্ষা মহার্ঘ্য। কৃষ্ণা ও গোদাবরী জেলায় ইরিগেসন অর্থাৎ জল সেচন জন্য প্রভূত ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রতিবর্ষেই তাহার অধিকাংশ, খালের সাহায্যে মান্দ্রাজ-অঞ্চলে রপ্তানি হয় বলিয়া, বিজয়বাড়াতে অনেকগুলি মহাজন ব্যবসায় করিতেছেন।

উন্দাবল্লী।

কৃষ্ণাজেলায় কৃষ্ণা-নদীর উভয় তীরে হিন্দুদিগের পূর্ব্বকীর্ত্তির চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বিজয়বাড়ার অনতিদূরে কৃষ্ণা-নদীর দক্ষিণ তীরে ও কৃষ্ণা আনিকটের দেড় মাইল অন্তরে উন্দাবল্লীনামক পল্লীর গায়ে যে পাহাড়শ্রেণী আছে, তাহার পাদদেশে প্রস্তর কাটিয়া, চালুক্যবংশীয় কোন রাজা কর্ত্তৃক দেবালয় প্রতিষ্টিত হইয়াছিল। তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া, চালুক্য-রাজবংশের পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিয়া দিতেছে। তাঁহারা এক সময়ে কৃষ্ণা জেলার অধিকাংশ প্রদেশ শাসন করিতেন।

আমরা উন্দাবল্লীর দেবালয় সন্দর্শনে গমন করি। পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে যে দেবালয়টি আছে, তাহা 'উমাচন্দ্র গুণ্ডি' নামে প্রসিদ্ধ। উহা পাহাড় কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাতে তিনটি ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ ও সম্মুখে একটি বারাণ্ডা আছে। উহার স্তম্ভগুলিতে লোণা লাগিয়াছে এবং কার্নিসে হস্তী ও মনুষ্যের অঙ্কিত মস্তক অদ্যাপি দৃষ্ট হইতেছে। দ্বারদেশে দ্বারপালের

আকৃতি দেখিলাম; কিন্তু ভিতরে লিঙ্গের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলাম না। গ্রামস্থ লোকও এই দেবালয়-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কহিতে পারিল না। ইহার সন্নিকটে পাহাড় কাটিয়া নির্ম্মিত, ৬ ফুট দীর্ঘ ও ৫ ফুট প্রশস্ত দুইটী ঘরের দেওয়ালে সর্ব্বাকৃতি মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহার অনতিদূরে আর একটি ১৬ ফুট দীর্ঘ ও ১০ ফুট প্রশস্ত পুরাতন প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশ গণেশ-মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। তথা হইতে ৩০ ফুট দূরে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে মারুতির মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। তদনন্তর শেষ-পর্য্যঙ্কশায়ী বিষ্ণুর মন্দিরে আসিলাম। ইহাও পাহাড়ের গাত্র কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। ভিত্তি হইতে উপর্য্যুপরি চারি তল, তৃতীয় তলের দালানটি বৃহৎ। উহা ৫৬ ফুট দীর্ঘ ও ৩০ ফুট প্রশস্ত। ইহারই এক পার্শ্বে বিষ্ণুর বৃহৎ মূর্ত্তি অনন্ত-পর্য্যঙ্কে যোগ-নিদ্রায় বিরাজ করিতেছেন। মস্তকের সন্নিকটে পক্ষিরাজ গরুত্মান্, নাভিকমলের উপর ব্রহ্মা যোগাসনে বিরাজমান ও দুই অসুর তাঁহার দিকে ধাবমান হইতেছে। ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইল যে, সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মোদ্ভবের পরে মধুকৈটভের আবির্ভাবের বিবরণ উৎকীর্ণ হইয়াছে। দালানে যে কয়েকটি স্তম্ভ আছে,

তাহাতে বিষ্ণুর দ্বাদশ অবতারের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। ৪র্থ তলে ৮ ফুট দীর্ঘ ও ৪ ফুট প্রশস্ত ৩টি ক্ষুদ্র গৃহ আছে। দ্বিতীয় তলের মধ্যস্থলে ৩০ ফুট দীর্ঘ ও ৩০ ফুট প্রশস্ত একটি মণ্ডপ এবং উহার পশ্চাদ্ভাগে ১২ ফুট দীর্ঘ ও ১০ ফুট প্রশস্ত একটি ঘর ও দক্ষিণ দিকে ৩০ ফুট দীর্ঘ ও ১৫ ফুট প্রশস্ত এবং বামদিকে ১৮ ফুট দীর্ঘ ও ১২ ফুট প্রশস্ত একটি প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। সম্ভবতঃ মধ্যকার মণ্ডপে উৎসব হইত, বামদিকের ঘরটি রন্ধনশালা ছিল ও দক্ষিণ দিকের ঘরে দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সর্ব্ব নিম্ন তলে সন্ন্যাসীদিগের থাকিবার জন্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। কলেক্টর মিষ্টার আর্ সিবেল সাহেব অনুমান করেন যে, চালুক্য রাজগণ কর্ত্তৃক সপ্তম হইতে দশম শতাব্দীর কোন সময়ে এই দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। মণ্ডপের সম্মুখে পাহাড়ের গাত্রে যে অনুশাসন রহিয়াছে, তাহার একটির তারিখ ১২৮৭ শক। উহা বার্হস্পত্য চিত্র সৌরবর্ষে পৌষ মাসের পঞ্চমীতে গন্নারেড্ডির পুত্র অন্নরেড্ডি কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। উহাতে অবগত হওয়া যায় যে, দেবালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য বিজয়বাড়া ও কোন্দাপল্লী তালুক প্রদত্ত হইয়াছিল এবং প্রত্যহ

১২০টী অখণ্ড দীপ প্রজ্বলিত ও চারিমণ তণ্ডুলের অন্নের ভোগ হইত। কুতবশাহি রাজগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণাজেলা অধিকৃত হওয়া অবধি, মন্দিরটী ম্লেচ্ছ অত্যাচারে পতিত হইয়া রহিয়াছে। উহা মৃত্তিকার স্তূপে এক-প্রকার ঢাকা পড়িয়াছিল। মিষ্টার সিবেল সাহেব যত্ন করিয়া, তাহা পরিষ্কার করাইয়াছেন। অবশ্য এখন আর পূজা হয় না।

গ্রামের ভিতর ভাস্করেশ্বর স্বামীর মন্দিরের একটি স্তম্ভে তিনটি পৃথক্ পৃথক্ অনুশাসন রহিয়াছে। তাহার একটির তারিখ ১৫১৫ অব্দ। তাহাতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, বিজয়নগরের মহারাজ কৃষ্ণরায় একটি কূপ খনন করিয়া দিয়াছিলেন। উহার অনতিদূরে ভীমেশ্বর স্বামীর মন্দিরের সম্মুখে প্রস্তরফলকে কয়েকটি অনু-শাসন রহিয়াছে। এই সকল দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, পুরাকালে উন্দাবল্লী প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। এক্ষণে উহা সামান্য পল্লীতে পরিণত হইয়াছে।

মঙ্গল-গিরি।

কৃষ্ণাজেলায় যে কয়েকটি বৈষ্ণব তীর্থ-ক্ষেত্র আছে, তাহাদিগের মধ্যে মঙ্গল-গিরিই শ্রেষ্ঠ। ইহা গন্তুর তালুকের অন্তর্গত, কৃষ্ণা-নদীর দক্ষিণ তীরে ও কৃষ্ণা আনিকটের ৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সম্প্রতি এই স্থানে বি, কে, রেলওয়ের একটি ষ্টেশন হইয়াছে। সহরটি নিতান্ত ছোট নহে, ৬০০০ হাজারের অধিক লোকের বাস; ইংরাজ আগন্তুকদিগের জন্য একটি পান্থশালা ও হিন্দু-যাত্রীদিগের জন্য ছত্র আছে। তদ্‌ব্যতীত ডেপুটি তহসিলদার, পোষ্ট অফিস ও পুলিস-ষ্টেশন রহিয়াছে। নগরের পার্শ্বে যে পাহাড় আছে, তাহা মঙ্গল-গিরি নামে খ্যাত। উহা ৮৭৫ ফুট উচ্চ। উহার সর্ব্বোচ্চ স্থানে ট্রিগ্‌নমেট্রিক্যাল-সার্ভে ষ্টেশন অর্থাৎ ত্রিকোণমিতিক পরিদর্শন-গৃহ সংস্থাপিত হইয়াছিল। ঐ পাহাড়টী দেখিলে, হস্তীর অবয়ব বলিয়া অনুমিত হয়। পাহাড়ে দূর হইতে উঠিবার জন্য যে সিঁড়ি আছে, তাহার নিকট ১৫২০ ও ১৫৫৮ অব্দের দুইটী অনুশাসন দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে প্রথমটিতে জানা যায়, সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণরায়ের সেনানায়ক তিম্মা অরসুলু ও দ্বিতীয়টীতে দেখা যায়,

রাজা সদাশিবরায় কর্ত্তৃক দেবসেবার নিমিত্ত গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছিল। এস্থলে উহা অপেক্ষা পুরাতন অনুশাসন নাই। তবে এখান হইতে তিন মাইল দূরে "কাজা" নামক গ্রামে বিষ্ণু-মন্দিরের সন্নিকটে একটী প্রস্তরে দুইটী অনুশাসন রহিয়াছে। তাহার একটী ২য় কুলতুঙ্গ চোলরাজ কর্ত্তৃক ১১৪৪ অব্দে ও অপরটি অন্ধ্রাজ ১ম প্রতাপচন্দ্র রুদ্ররাজ কর্ত্তৃক ১২৪৯ খৃঃ প্রদত্ত। অতএব স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, চালুক্য-রাজবংশ লোপ পাইলে, দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এ প্রদেশ চোল রাজাদিগের অধিকারে আসিয়াছিল এবং ১৩শ খৃঃ শতাব্দীর মধ্যভাগে অন্ধ্র বংশীয় রাজারা কৃষ্ণাজেলা অধিকার করিয়াছিলন।

পাহাড়ের গায়ের মধ্যস্থলে পাথর কাটিয়া, নরসিংহস্বামীর মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে। মূর্ত্তি পাহাড়ের গাত্রে অঙ্কিত আছে, কেবল সিংহাকৃতি মুখটী পিত্তলে প্রস্তুত। স্বামীর আবির্ভাববিষয়ে পৌরাণিক বিবরণ এইরূপ, কোন এক ঋষিপুত্র পিতার ভয়ে হস্তিরূপ ধারণ করিয়া, ঐ স্থানে বিষ্ণুর তপস্যা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া, বর প্রদান করিবার জন্য প্রত্যক্ষ হইলে, ঋষিপুত্র তাঁহারে সশরীরে অবস্থান করিতে অনুরোধ করেন। বিষ্ণু কহিলেন তোমার হস্তীদেহ পর্ব্বতে পরিণত

হইলে, আমি এখানে আসিয়া অবস্থিতি করিব। তখন ঋষিবর শরীর পরিত্যাগ করিলে, তাহা পর্ব্বতে পরিণত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে অসুররাজ নমুচি উক্ত পর্ব্বতের পশ্চাতে থাকিয়া, ব্রহ্মার তপস্যা করিয়া, তদীয় বরে প্রবল হইয়া, ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে, সেই ইন্দ্র বিষ্ণুর সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু ফেননিক্ষেপপূর্ব্বক উক্ত অসুরকে বধ ও পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত স্মরণ করিয়া, ঋষি-পুত্রের হস্তিরূপী দেহে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই ঘটনা ত্রেতাযুগে হইয়াছিল। তখন এই পর্ব্বত ত্রেতাদ্রি নামে বিখ্যাত হয়। যুগভেদে নামেরও ভেদ হইয়াছে। যথা, ত্রেতাযুগে মুক্তাদ্রি, দ্বাপরে ধর্ম্মাদ্রি এবং বর্ত্তমান কলিতে মঙ্গলাদ্রি নামে অভিহিত হইতেছে। এখানে পানীয়ই ভগবানের প্রধান উপাদেয়। যুগভেদে পানীয়ও ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া আসিতেছে। কৃতযুগে অমৃত, ত্রেতায় ঘৃত ও দ্বাপরে দুগ্ধ পান করিতেন। এখন কলিতে গুড়ের সর্ব্বৎ পান করিতেছেন; উহাকে 'পানা' কহে। লোকে আপন আপন মনস্কামনাসিদ্ধির জন্য গুড়ের পানা মানসিক করিয়া থাকে। পরে দেবদর্শনে যাইয়া, মানসিকের মূল্য অর্চ্চকের হস্তে প্রদান করে। অর্চ্চক তাহাতে গুড় ক্রয় করিয়া, পানা প্রস্তুত করত,

লইয়া আইসে এবং পূজান্তে কুসি করিয়া, সিংহের মুখে ঐ পানা ঢালিতে থাকে। দেবের ঈদৃশ মহিমা যে, যতই পানা আসুক না কেন, অর্দ্ধেকমাত্র মুখে প্রদত্ত হইলেই, অপর অর্দ্ধেক প্রসাদরূপে ভক্তের জন্য রাখিয়া দেন। যখন দেবতা পানে বিরত হন, তখন অর্চ্চক পাত্রস্থ পানা ব্রতধারীকে প্রদান করে। ব্রতধারী সপরিবারে সযত্নে তাহা পান করিয়া থাকে। এই কারণে এখানকার পূজার প্রধান অঙ্গ পানাপ্রদান। এক এক সময়ে শতা-ধিক যাত্রী উপস্থিত হয় এবং পানা এত পড়িয়া থাকে যে, তাহার পরিমাণ উচ্চে অর্দ্ধ ইঞ্চি হইবে। আশ্চর্য্য এই যে, গুড়ের গন্ধে একটিমাত্রও মক্ষিকা আসিতে দেখিলাম না। মাঘ মাসের শুক্ল একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী উৎসব হয়। একাদশীতে গরুড়-বাহনোৎসব, দ্বাদশীতে রাজাধিরাজ উৎসব, ত্রয়ো-দশীতে গজবাহনোৎসব, চতুর্দ্দশীতে শেষবাহনোৎসব এবং পূর্ণিমাতে পুনরায় গরুড়বাহনোৎসব হইয়া থাকে। তদ্‌ব্যতীত, ফাল্গুনমাসে শুক্লসপ্তমী হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত কল্যাণ উৎসব সমাহিত হয়। উভয় উৎসবেই দূরাদূর হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

পাহাড়ের নিম্নদেশে বিষ্ণুর যে বৃহৎ মন্দির আছে,

তাহার গোপুর অতি উচ্চ। ১ম বিবরণে বিজয়-নগরের সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণরায়ের পূর্ব্বোক্ত সেনানায়ক তিম্মা অরসলু কর্ত্তৃক, ২য় বিবরণে মসলিপত্তনের দিনেমার ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির জনৈক হিন্দু এজেণ্ট কর্ত্তৃক ও ৩য় বিবরণে বাশিরেড্ডি বেঙ্কাটাদ্রি নায়ডু কর্ত্তৃক উহা নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া, লিখিত হইয়াছে। অতএব অনুমিত হয় যে, তিম্মা অরসলু প্রাচীর ও গোপুরের কিয়দংশ ও দিনেমার কোম্পানির হিন্দু এজেণ্ট গোপুরের উপরিভাগ নির্ম্মাণ করান এবং বাশিরেড্ডি উহাতে পঙ্কের কাজ করাইয়া দিয়াছিল। প্রাচীরের ভিতর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সপ্তম খণ্ডে বিভক্ত বৃহৎ মন্দির, সপ্তম প্রকোষ্ঠে নরসিংহস্বামীর পিত্তলময়ী ভোগমূর্ত্তি এবং বহিস্থ ১ম প্রকোষ্ঠের স্তম্ভের গায়ে অনেকগুলি অনুশাসন খোদা রহিয়াছে। এই দেবালয় হইতে ৫০০ শত ফুট অন্তরে মহাদেবের একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। মন্দিরের ভূসম্পত্তির আয় ৬০০ শত টাকা। নিত্য ভোগের জন্য নিম্নের নৃসিংহস্বামীর মন্দিরে /২।০ ও ঈশ্বরস্বামীর মন্দিরে /৩ সের তণ্ডুলের অন্ন প্রদত্ত হয়। আটার ঘর বৈদিক ব্রাহ্মণ এই মন্দিরের উপর নির্ভর করিয়া, কালাতিপাত করিতেছেন।

হাম্পি।

আমরা ১৮৯১ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখের প্রাতে দুই ঘটিকার সময় রামায়ণোক্ত কিষ্কিন্ধ্যার অন্তর্গত ঋষ্যমূক-শৃঙ্গ সন্দর্শন মানসে দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলের 'হস্‌পেট্' ষ্টেশনে আসিয়া পঁহুছিলাম। উহা গণ্ডাকুলের জংসন অর্থাৎ সম্মিলিত ষ্টেশন হইতে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা কোন বন্ধুর সাহায্যে ষ্টেশনের জনৈক পোর্টার অর্থাৎ দ্বাররক্ষক ব্রাহ্মণকে পরিদর্শকরূপে গ্রহণ ও গরুর গাড়িতে আরোহণ করিয়া, প্রাতে হাম্পি নগরে পৌঁছিলাম। উহা ষ্টেশন হইতে ৭মাইল দূর; রাস্তা বাঁধান; অতএব গাড়িতে বিশেষ কোন কষ্ট হইল না।

পুণ্যতোয়া তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণভাগে হাম্পি ও বামভাগে ঋষ্যমূকপর্ব্বতশৃঙ্গ। হাম্পি হইতে দুই মাইল দূরে প্রসিদ্ধ বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণরায়ের ভগ্ন দুর্গ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে; ইহার বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে। "নরপতি" রাজাদিগের সময়ে হাম্পি সমৃদ্ধিশালী ছিল। হাম্পির একদিকে তুঙ্গভদ্রা এবং অপরদিকে পর্ব্বতশ্রেণী; এই কারণে উহা বহিঃশত্রু হইতে সুরক্ষিত। নরপতি রাজারা হাম্পিতে অনেকগুলি সুন্দর দেবালয়

নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উক্ত দেবালয়ের অনেকগুলি অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া, তাঁহাদিগের কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। তন্মধ্যে বিরূপাক্ষ, রামস্বামী, বিটোবা ও নরসিংহস্বামীর মন্দির সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এতদ্ব্যতীত, অনেক মন্দির ও মণ্ডপ কালের করাল গ্রাসে বিলীন হইতেছে।

বিরূপাক্ষ মন্দিরে পম্পাবতীশ্বর মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। ঐ মন্দির সম্ভবতঃ বিদ্যারণ্যস্বামীর সময়ে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। তাঁহার সমাধি ও যেখানে বসিয়া তিনি পূজা করিতেন, সেই গৃহ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার শিষ্যপরম্পরা শঙ্করা-চারী-নামধারী হইয়া, বিরূপাক্ষ মন্দিরের এক অংশে অবস্থিতি করেন এবং মন্দির, বিরূপাক্ষ-মঠ ও শঙ্করাচী বিরূপাক্ষ শঙ্করাচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। গোপুর, শিবালয় এবং সম্মুখের মণ্ডপ অতি বৃহৎ গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত। সম্মুখে তিপ্পকুল পুষ্করিণী। উহা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। তাহার চতুর্দ্দিক গ্রেনাইট প্রস্তরে বাঁধান। মেরামত না থাকায়, পদ্মবনে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তুঙ্গ-ভদ্রা হইতে পয়ঃপ্রণালীযোগে মঠের ভিতর দিয়া, জল আসিয়া থাকে বলিয়াই, বোধ হয়, পুষ্করিণীর আদর নাই। ১৩৩৫ অব্দে মাধবাচার্য্য অপর নাম আনন্দতীর্থ

কর্ত্তৃক ষড়দর্শনসংগ্রহ ও অনেক শাস্ত্র-গ্রন্থের টীকা এই স্থানে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই দেবালয় সেই হিসাবে ৫৫০ বৎসরের অধিক হইবে। এতাবৎকাল এই দেবালয়ের কোন সংস্কার হয় নাই; স্থানে স্থানে অল্প পরিমাণে ভিত্তি বসিয়া গিয়াছে। কোথাও বা কোন স্তম্ভ অল্প হেলিয়াছে এবং কোন খিলান বা ফাঁক হইয়াছে। অতএব মন্দিরের সংস্কারাদি হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। মঠাধিকারী শঙ্করাচার্য্য বেলারি ডিষ্ট্রিক্টের স্মার্ত্তদিগের গুরু। স্মার্ত্তেরাই এই মঠে আসিয়া, দেবাদি পদ্মাবতীশ্বরের পূজা করিয়া থাকে। যৎকালে আমরা তথায় গিয়াছিলাম, তখন শঙ্করাচার্য্য অবেক্ষণ-ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। গোপুরের সম্মুখে অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত প্রশস্ত রথ্যার উভয় পার্শ্ব মণ্ডপ, পান্থশালা ও বিপণিতে পরিবৃত। রথ্যার সর্ব্বশেষভাগে বৃহৎ মণ্ডপ। এই রথ্যাতে রথোৎসব হইয়া থাকে। তৎকালে পান্থশালা ও মঠ লোকে পরিপূর্ণ হয় এবং বিপণিতে নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ সুশোভিত থাকে। পদ্মাবতীশ্বর রথে চড়িয়া মণ্ডপে আসিয়া বিশ্রাম করেন। ক্রমশই এই প্রসিদ্ধ দেবালয় বা মঠের অবনতি হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বোক্ত মণ্ডপের ধার দিয়া, তুঙ্গভদ্রার তীরে আসিয়া, সেই তীর দিয়াই, অর্দ্ধ মাইল যাইলে, রাম-স্বামীর মন্দির ও তাহার উভয় পার্শ্বে অনেকগুলি পুরাতন পান্থশালা দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরপারে ঋষ্যমূক-পর্ব্বতশৃঙ্গ। প্রবাদানুসারে সানুজ ভগবান্ রামচন্দ্র ঋষ্য-মূকে সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়া, তুঙ্গভদ্রায় অবগাহ-নাদি করিয়া, দক্ষিণ তীরে, যেস্থানে বিশ্রাম করিয়া-ছিলেন, তাহারই উপর এই মূর্ত্তির স্থাপনা হইয়াছে বলিয়া, উহা বৈষ্ণবদিগের প্রসিদ্ধ পুণ্যক্ষেত্র। উত্তর-পশ্চিম-বাসী ও মহারাষ্ট্রপ্রদেশের যাত্রীরা হাম্পিতে আসিয়া, কর্পূরালোকস্বামীর সন্দর্শন ও নারিকেল ফাটাইয়া স্বামীর বলি প্রদান করিয়া থাকে। এখানে বানরের অভাব নাই; অভাব বা কিজন্য হইবে; কিষ্কিন্ধ্যা এক সময়ে বানরেরই রাজ্য ছিল। তারাগড়, বালিকূট, অঙ্গদকূট ও অঞ্জনেয় কূটাদি শৃঙ্গ এবং পম্পাসরোবর তুঙ্গভদ্রার বামতীরে এবং ঋষ্যমূকশৃঙ্গের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। পম্পা তথা হইতে ৩ মাইল দূরমাত্র।

রামস্বামীর মন্দির হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে তুঙ্গ-ভদ্রার দক্ষিণ তীরে সুপ্রসিদ্ধ বিটোবামন্দির। ইহার গঠনপ্রণালী ও প্রস্তরোপরি সুচারু কার্য্য দর্শন না

করিলে, উহার সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। স্তম্ভোপরি যে সকল উৎকৃষ্ট কার্য্য আছে, তাহা অন্যান্য মন্দিরে অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তালিকোটার যুদ্ধের পর দুর্ব্বৃত্ত যবন-সেনারা বিজয়নগর ধ্বংস করিয়া, এই দেবালয় লুঠ করিয়াছিল। তাহারা ধনলোভে মূলস্থান হইতে মূর্ত্তিকে দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক মন্দিরের মেজে পর্য্যন্ত খুলিয়াছিল। তদবধি দেবালয় পড়িয়াছিল। এই ঘটনা ৩২৮ বৎসর পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। এতাবৎকাল দেবালয় সমভাবে থাকিয়া, বিজয়নগরের নরপতি রাজাদিগের গৌরবের পরিচয়প্রদান-সহকারে সংসারের অনিত্যতা প্রখ্যাপিত করিতেছে। যবন অত্যাচারের সময় কয়েক-খানি কার্নিসের প্রস্তর ভাঙ্গিয়াছিল। তাহা অদ্যাপি সেই অবস্থাতেই রহিয়াছে। আমরা এই মন্দির সন্দর্শন করিলাম বটে; কিন্তু বিটোলদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না। পরিদর্শক কহিল, যবনেরা মূর্ত্তিটীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট মন্দিরের নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া, ভগ্ন স্থানের সংস্কার করিবার জন্য পাবলিকওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টকে (সাধা-রণ কার্য্যবিভাগকে) অনুজ্ঞা দিয়াছেন। সংস্কারকার্য্য হইতেছে। বিরূপাক্ষদেবের রথোৎসবের রথ্যার ন্যায়,

বিটোলদেবের রথোৎসবের রথ্যার ধারেও মণ্ডপ এবং পান্থশালাদি পড়িয়া রহিয়াছে। প্রত্যাগমনের সময় তৎসমস্ত এবং অপর কয়েকটী ছোট বড় মন্দির ও মণ্ডপ এবং তুঙ্গভদ্রার উপর নরপতিরাজগণকৃত সেতুর স্তম্ভ সন্দর্শন ও তুঙ্গভদ্রার ভিতর সহস্র লিঙ্গ দর্শন করিয়া, বর্ষাপ্রযুক্ত স্রোতের আধিক্য হওয়াতে, পরপারে যাইতে সমর্থ হইলাম না। অতএব দূর হইতেই ঋষ্যমূকপর্ব্বত সন্দর্শন করিয়াছিলাম। উহার উপরিভাগে একটি ক্ষুদ্র মন্দির এবং পাদদেশে তুঙ্গভদ্রার উপর মণ্ডপ ও ঘাট। তথা হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি পঙ্কের কার্য্য সুশোভিত। অতএব সূর্য্যরশ্মির সহযোগে সুব্যক্তীকৃত বৃহৎ মন্দির দৃষ্ট হইল। শুনিলাম, অঞ্জনা যেস্থানে মারুতিকে প্রসব করিয়াছিল, তাহারই উপর ঐ মন্দির নির্ম্মিত ও আঞ্জামর (অঞ্জনেয়) স্বামীর নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। আরও শুনিলাম, তথা হইতে দুই মাইলমাত্র দূরে পর্ব্বতশ্রেণীর ভিতর পম্পা-সরোবর। কোন ব্রাহ্মণ কহিলেন, বর্ষায় পম্পা জলে পূর্ণ হইলে, অতি মনোহর দৃশ্য ধারণ করে। তাহার অনতিদূরে তারাগড়, বালিকূট ও অঙ্গদকূটাদি রামায়ণোক্ত শৃঙ্গগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে। তুঙ্গভদ্রা তৎকালে সহজে

পার হওয়া দুঃসাধ্য; পার্ব্বত্য রাস্তাও অতি বন্ধুর; বিশেষতঃ, আমাদিগের সময়াভাব; তজ্জন্য আমরা তাহা দর্শন করিতে পারি নাই।

তদনন্তর আমরা তুঙ্গভদ্রার পরমপবিত্র সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক বিরূপাক্ষমন্দিরে যাইয়া, ভগবান্ পম্পাবতীশ্বরের অর্চ্চনাসমাধানান্তে মন্দির, বিদ্যারণ্যস্বামীর সমাধি ও তাঁহার ধ্যানের গৃহ, শঙ্করাচার্য্যের আবাসগেহ এবং সন্নিকটস্থ পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি অপর দশাধিক পরিবর্জ্জিত মন্দির একে একে দর্শন করত, তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত ও কোদণ্ড রামস্বামীর মন্দিরে সমাগত হইলাম। তথায় স্বামীজির অর্চ্চনাদি করিয়া, পার্শ্বস্থ ছত্রে আহার করত, বিশ্রামানন্তর কৃষ্ণরায়ের ভগ্নদুর্গ-দর্শনে যাইবার সময় অনেকগুলি পরিবর্জ্জিত মন্দির দেখিয়াছিলাম। ইহাদিগের মধ্যে প্রত্যেক মন্দিরই যবন অত্যাচারে পতিত হইয়া রহিয়াছে।

কৃষ্ণরায়ের দুর্গের কথা বলিবার পূর্ব্বে রায়ারদিগের অভ্যুদয়ের দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। মহিসুরের অন্তর্গত শৃঙ্গেরি মঠের অধ্যক্ষ মাধবাচার্য্য বিজয়নগর তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তীরে হাম্পি হইতে দুই মাইল দূরে নূতন নগর স্থাপন ও হুক্কাবুক্কা নামে ভ্রাতৃ-

দ্বয়কে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া, ১৩৩৫ অব্দে নরপতি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করত স্বয়ং সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বস্থান হইতেই পণ্ডিত আনয়ন করিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রের টীকা ও ভাষ্য সঙ্কলন করান। তাঁহার ভ্রাতা সায়ণাচার্য্য বৈদিকদিগের সাহায্যে সুপ্রসিদ্ধ ঋগ্বেদভাষ্য প্রণয়ন করেন এবং তিনি স্বয়ং সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, আনন্দতীর্থ ও বিদ্যারণ্যস্বামী নামে খ্যাত হয়েন এবং বিরূপাক্ষ-মঠে জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তাঁহার শিষ্যেরা বিরূপাক্ষ শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত হইতেছেন।

হুক্কাবুক্কার জন্মবৃত্তান্ত পাওয়া যায় না, বলিলেই হয়; এসম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিৎদিগের মধ্যে নানামত। কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা দেবগিরির যাদববংশ হইতে সমুদ্ভূত; অপরেরা কহেন, বনবাসীর কদম্ববংশ হইতে তাঁহারা উৎপন্ন হইয়াছেন; অন্যান্যেরা কহিয়া থাকেন, মহিসুরের হয়শাল বল্লালবংশই তাঁহাদের উদ্ভবস্থান; আবার কেহ কেহ কহেন যে, বরঙ্গল রাজাদিগের মেষপালকের

অধ্যক্ষদ্বয় অনুগুণ্ডি গ্রাম হইতে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে যাইবার সময়ে মাধবাচার্য্যের শুভদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল। তিনিও আপনার অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় দিবার অভিপ্রায়ে নূতন নগর স্থাপন করিয়া, তাহাদিগকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। প্রথমে উক্ত নূতন নগর বিদ্যানগ্রাম নামে, পরে বিজয়নগ্রাম (১) এবং তদনন্তর বিজয়নগর নামে অভিহিত হইয়াছে। হুক্কা ১৩৩৫ অব্দে রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া, হরিহর রায়ালু নাম গ্রহণ ও ১৩৫০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ১৩৪৪ অব্দে বরঙ্গলের প্রতাপরুদ্রের পুত্র বীরভদ্রকে মুসলমানদিগের বিপক্ষে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া, প্রথিত আছে। বাদামীতে কেনারিজ্ ভাষায় ১২৬১ শালিবাহন অব্দে যে দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রমাণিত করিতেছে, হরিহর বাদামীকে আপন রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। তৎকালে দিল্লীর সম্রাটের প্রতিনিধি বিজাপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর

(১) উদয়গিরি তালুকের মলকোন্দা গ্রামে লক্ষ্মী নরসিংহস্বামীর মন্দিরে ১৫৫৮ শালিবাহন অব্দে ফাল্গুন মাসে শুক্লদশমী লক্ষ্মীবারের যে অনুশাসন স্তম্ভে রহিয়াছে, তাহাতে নরপতি রাজাদিগের রাজধানী বিজয়নগর নামে কথিত হইয়াছে।

তাঁহার ভ্রাতা রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন। আমরা রাজবংশীয় রাজাদিগের নামের তালিকা দিয়া, বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি বিবৃত করিব।

নরপতি রাজাদিগের নামের তালিকা।

হরিহর রায়ালু	(১ম)	১৩১৩	হইতে	১৩৫০
বুক্কারায়ালু হরিহরের ভ্রাতা		১৩৫০	”	১৩৭৯
হরিহর রায়ালু	(২য়)	১৩৭৯	”	১৪০১
দেবরায়ালু		১৪০১	”	১৪৫১
মল্লিকার্জ্জুন		১৪৫১	”	১৪৬৫
বিরূপাক্ষ		১৪৬৫	”	১৪৭৯
নরসিংহ রায়ালু	(১ম)	১৪৭৯	”	১৪৮৭
নরসিংহ রায়ালু	(২য়)	১৪৮৭	”	১৫০৮
কৃষ্ণরায়ালু		১৫০৮	”	১৫৩০
অচ্যুতদেবরায়ালু		১৫৩০	”	১৫৪২
সদাশিবরায়ালু		১৫৪২	”	১৫৭৩

১৩৬৮ অব্দে বুক্কা ও গুলবার্গের ব্রাহ্মণী মহমংশাহ, উভয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণী রাজাই জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং ১৩৮৫ অব্দে বুক্কাবেল গাঁও স্বরাজ্য ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। অবশেষে ১৩৮৭ অব্দে তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন।

দেবরায়ালুর রাজত্বকালে ১৪০৩অব্দে তাঁহার সেনা-নায়ক ধারুরাও ধার্ব্বারের দুর্গ নির্ম্মাণ করান। ১৪০৬ অব্দে ব্রাহ্মণীরাজ্যের অন্তর্গত মুদ্গালের কোন স্বর্ণকারের কন্যাকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া, ব্রাহ্মণীরাজ ফেরোজ শাহ দেবরায়ালুর রাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক পদে পদে তাঁহাকে পরাভূত করিলে, তিনি ধার্ব্বারের নিকট বঙ্কা-পুর ও আপনার কন্যা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে ১৪১৭ অব্দে তিনি ফেরোজশাহকে পরাভূত ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া, ব্রাহ্মণীরাজ্যের মধ্যে গমন-পূর্ব্বক সমস্ত গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন করেন। তৎপরে তৎ-সমস্ত অগ্নিমুখে নিক্ষেপ করিয়া, সকল লোককে নিপী-ড়িত করিয়াছিলেন। ১৪২২ অব্দে অহম্মদশাহ ব্রাহ্মণী তুঙ্গভদ্রা পার হইয়া, অতর্কিতরূপে দেবরায়ালর পট-নিবাস আক্রমণ করিলে, তিনি ইক্ষুবনে লুকাইয়া, প্রাণ-রক্ষাপূর্ব্বক বিজয়নগরে পলাইয়া আইসেন। অহম্মদশাহ বিনা বাধায় পূর্ব্বপ্রথানুসারে দেবালয়, গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন এবং কিয়দংশ রাজ্যও স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লয়েন। কিন্তু ১৪৪৪ খৃঃ দেবরায়ালু তাহার পুন-রুদ্ধার করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি ১৫৫১অব্দে মানব-লীলা সংবরণ করিলে, মল্লিকার্জ্জুন ১৪৫১ হইতে ১৪৬৫

পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তদনন্তর বিরূপাক্ষ ১৪৬৫ হইতে ১৪৭৯ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। ১৪৬২ অব্দে মহম্মদশাহ ব্রাহ্মণী বেলগাঁও কাড়িয়া লইলেও, তিনি দক্ষিণ দিকে মস্‌লিপত্তন পর্য্যন্ত স্বরাজ্য বিস্তার এবং অসুপ্‌ আদিল শাহকে ব্রাহ্মণীরাজের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন। তদনন্তর নরসিংহ রায়ালু ১৪৭৯ হইতে ১৪৮৭ পর্য্যন্ত ও তাঁহার পুত্র নরসিংহ (২য়) ১৪৮৭ হইতে ১৫০৮ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার সেনা-নায়ক রামরাজা কর্নুলে যাইয়া, তথাকার দুর্গাধ্যক্ষ অসুফ আদিলশেভয়কে সমরে পরাভূত ও দুর্গ অধি-কার করিয়া, বিজয়নগরের নরসিংহের অধীনে 'নয়স্কর' (জায়গীরদার) রূপে শাসন করিতে থাকেন। নরসিংহ ১৫০৮ অব্দে মানবলীলা সংবরণ করিলে, তাঁহার তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণদেব রায়ালু রাজা হয়েন। ইনি অতি প্রবল ও বিখ্যাত রাজা ছিলেন। অন্ধ্রদেশজয়পূর্ব্বক কটক পর্য্যন্ত আপন জয়পতাকা বিস্তার করেন। এবং তথাকার রাজা গজপতি রাজুর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, ১৫১৬ খৃঃ যে সন্ধি করিয়াছিলেন, তাহাতে উড়িষ্যারাজ্যের দক্ষিণ-সীমা কোন্দাপল্লী বিজয়নগর রাজ্যের উত্তর-সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ১৫১৫ অব্দে তাঁহার সেনানায়ক

তিম্ম অরসুলু ‘কোন্দাবিটু’ নেল্লুর ডিষ্ট্রিক্টের উদয়গিরি ও কৃষ্ণা ডিষ্ট্রিক্টের ‘কোন্দাপল্লী’ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত ১৫১৮ অব্দের অনুশাসন গণ্টুর তালুকের পেদ্দাকাকৃনি গ্রামে বীরভদ্র দেবের মন্দিরে, বাপট্‌লা তালুকের বাপট্‌লানগর ও বিজয়বাড়ায় কনকদুর্গার মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে। তিনি পশ্চিমে কৃষ্ণা, উত্তরে শ্রীশৈল, পূর্ব্বে কোন্দাবিড়ু, দক্ষিণে তঞ্জাবুর ও মধুরা পর্য্যন্ত আপন রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারই সময়ে মধুরার নায়ক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি সংস্কৃত ও তৈলঙ্গী ভাষার উন্নতিকল্পে যত্ন করিতেন। তাঁহার সভায় অষ্টদিগ্‌গজ অর্থাৎ ৮টি বিদ্বান্ থাকিত। তাঁহারা তৈলঙ্গী ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৫৩০ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তদীয় ঔরস পুত্র না থাকাতে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বীর নরসিংহ রায়ালুর পুত্র অচ্যুতরায়ালু রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন। তিনি আপন পিতৃব্যের রাজত্বকালে অনেকটা স্বাধীনভাবে ছিলেন এবং কার্নূল প্রদেশে অনেকগুলি দানানুশাসন প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি কোন্দাবিড়ু তালুকে যে অনুশাসন প্রদান করেন, তাহা রেপলী তালুকে গোপালস্বামীর মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে। ১৫৩৮ অব্দে

তিনি উক্ত গোপালস্বামীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি কার্নুলের দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৫৪২ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তদীয় নাবালক পুত্র রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন। রামরাজা নামে তাঁহার প্রধান সেনানী এই নাবালক রাজাকে নজরবন্দী করিয়া, আপনি রাজকার্য্য করিত। তাহাতে নাবালক রাজার মাতুল ও অপর কয়েকজন প্রধান সচিব সেনানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলে, সে অবসর লইয়াছিল। সেই সুযোগে রাজ-মাতুল তিম্ম রাজা স্বয়ং সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া, এরূপ নিষ্ঠুরভাবে প্রজাপীড়ন করিয়াছিলেন যে, সমস্ত সামন্ত রাজারা তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি বিজয়পুরের ইব্রাহিম আদিল শাহর সাহায্য লইয়া, বিদ্রোহ দমন করিতে বাধ্য হয়েন। মুসলমান-সেনা প্রতিনিবৃত্ত হইলেই, সামন্তেরা পুনরায় উত্থিত হইয়া, তাঁহাকে প্রাসাদমধ্যে অবরোধ করিল। তিনি অনন্যোপায় হইয়া, আত্মহত্যা করেন। তখন রামরাজা আপন আধিপত্য পুনঃ স্থাপন করিয়া, আমরণ সদাশিবের নামে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। সদাশিবের প্রদত্ত প্রস্তরানুশাসন কোন্দাবিডুতে নর্সবুপেট তালুকের

'এল্লমন্দা' গ্রামে বপট্‌ল তালুকের বঙ্গিপুর ও সাত্তনা-পল্লী গ্রামে এবং গণ্টুর তালুকের মঙ্গলগিরিতে পাওয়া গিয়াছে। রামরাজা স্বরাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি আদিলসাহীদিগের সহিত সন্ধি করিয়া, তাহা ভঙ্গ করত, একাংশ স্বরাজ্যভুক্ত করিলে, আলি আদিল শাহ গোলকন্দা, আমেদনগর ও বিদর্ভের রাজাদিগের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে তালিকাকোটা-নামক স্থানে আসিয়া সমবেত হয়েন। পরে কৃষ্ণা পার হইয়া, অতর্কিতভাবে তাঁহার সেনাকে তথা হইতে ১০ মাইল দূরে আক্রমণ করেন। তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু জয়লক্ষ্মী তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। তিনি বিগতিকতা অবলোকন করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমান-সেনা তাঁহার অনুসরণ করিলে, বাহকেরা পাল্কী ফেলিয়া পলায়ন করে। তখন বিপক্ষ সেনারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া, আদিলশাহর সম্মুখে আনয়ন করিলে, তিনি স্বয়ং তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদন করেন। কৈসরক্রেডারিক নামে কোন পরিব্রাজক দুই বৎসর পরে যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়া, আপন ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছিলেন যে, রামরাজার সেনার মধ্যে দুইটী মুসলমান সেনানায়ক

ছিল। তাহারা যুদ্ধের সময় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, বিপক্ষের সহিত মিশিয়াছিল। তাহাতেই বিপক্ষ দল রামরাজার সেনাদিগকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সে যাহা হউক, রামরাজা নিহত হইয়াছেন শুনিয়া, হিন্দু-সেনা ভয়ে চারিদিকে পলাইতে লাগিলে, মুসলমানেরা তাহাদিগের অনুসরণ করে। সুলতান স্বয়ং আনিগুণ্ডিতে আগমন করিলে, তদীয় সেনা বিজয়নগরে প্রবেশপূর্ব্বক লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হয়। কথিত আছে, তৎকালে রাজধানীর বেষ্টন ২৭ মাইল ছিল। সেনারা দশ মাস ধরিয়া লুণ্ঠন করিয়া, নগর, রাজপ্রাসাদ ও দেবালয়াদি নষ্ট করিয়াছিল। ১৫৬৫ অব্দে বিজয়নগরের ধ্বংস হয়। কিন্তু সদাশিবরায়ালু মুসলমান-সেনা আসিবার পূর্ব্বেই তথা হইতে পেন্নকোন্দায় পলাইয়াছিলেন এবং ১৫৭৩ অব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন। তাহার পর যথাক্রমে শ্রীরঙ্গরায়ালু ১৫৫৭ হইতে ১৫৮৫, বেনুবাটুপতি দেবরায়ালু ১৫৮৬ হইতে ১৬১৪, চিক্কদেবরায়ালু বেল্লুরে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া গিয়া ১৬১৫ হইতে ১৬২৩, বামদেবরায়ালু ১৬২৪ হইতে ১৬৩১, আনগুণ্ডি বেনুবাটুরায়ালু ১৬৩২ হইতে ১৬৪৩ এবং শ্রীরঙ্গরায়ালু ১৬৪৪ হইতে ১৬৫৪ পর্য্যন্ত

রাজত্ব করিয়াছিলেন। শেষ রাজা নরসিংহ রায়ালু মধুরার তিরুমলের উত্তেজনায় যেরূপে গোলকন্দার সুলতান কর্ত্তৃক পরাভূত ও যেরূপে নরপতিবংশ লোপ প্রাপ্ত হয়, তাহা তীর্থদর্শনের ১ম সংখ্যায় ১৮৮ হইতে ৯১ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে বলা হইয়াছে।

আমরা দুর্গের অভ্যন্তরে আসিয়া দেখিলাম, কয়েকটি রাজভবনের ভগ্নাবশেষ, পরিত্যক্ত দেবালয়, বিচারালয়, হস্তিশালা ও উষ্ট্রশালা ব্যতীত, তথায় আর কিছুই নাই। সমস্ত ভূমি কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। আমরা প্রত্যেক প্রাসাদ-বাটী ও দেবালয়াদি সন্দর্শন করিলাম। একটি দেবালয়ের প্রাচীরে প্রত্যেক প্রস্তর-পংক্তিতে এক শ্রেণী সেনা, যথা পদাতি, অশ্বারোহী ও গজারোহীদিগের যুদ্ধ এবং একস্থানে ব্যাঘ্র-শিকার ইত্যাদি চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহার কার্য্য-নৈপুণ্য দর্শন করিলে, চমৎকৃত হইতে হয়। যে রাজ-ধানীর বেষ্টন ২৭ মাইল ছিল, তাহা এক্ষণে মরু-ভূমিতে পরিণত! কালের বশে মরুও শস্যক্ষেত্র এবং উদ্যানও মরুতে পরিণত হইয়া থাকে! ঐ কয়েকটি ভগ্ন প্রাসাদ দণ্ডায়মান থাকিয়া, মোহান্ধ মানবগণকে স্মরণ করাইতেছে যে, জগৎ মিথ্যা এবং একমাত্র ব্রহ্মই

সত্য। অতএব, হে মানব! সেই সৎ বস্তুতেই আস্থা স্থাপন কর। আপাত-সুখকর ইন্দ্রিয়প্রিয় ভোগে কদাচ মোহিত হইও না। ব্রহ্মই সৎ, অপর সমস্তই অসৎ, ইহা সর্ব্বদা মনে জাগরূক রাখিয়া, একমাত্র সেই ব্রহ্মেরই ধ্যান কর।

ধার্ব্বার।

১৮৮১অব্দের ১৪ই অক্টোবর তারিখে আমরা হাম্পি হইতে দক্ষিণ মহারাষ্ট্র-রেল দিয়া, 'ধার্ব্বার' ষ্টেশনে বেলা ১২ টার সময়ে আসিয়া পৌঁছিলাম। ট্রেন আসিতে দুই ঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল। দক্ষিণ-মহারাষ্ট্র রেল কোম্পানির প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ও এজেণ্ট আফি-সের প্রধান কেরাণী বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহা-শয়ের পুত্র বাবু বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় আমা-দিগের জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা তাঁহার সহিত তাঁহাদিগের আবাসে যাইয়া, আতিথ্য স্বীকার করিলাম। পরে আহারাদি করিয়া, বহির্গমনে প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময়ে প্রভূত বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। অনন্তর বর্ষণ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, বিপিন বাবুর সহিত নগরপরিদর্শনে গমন করিলাম।

এই নগর ১৫।২৭ অক্ষরেখায় ও ৭৫।৬ পূর্ব্ব-দ্রাঘি-মায় বেলগাঁও হইতে ৪৮ মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণে, বিজাপুর হইতে ১১০ মাইল পশ্চিম দক্ষিণে ও পুনা হইতে ২৪০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই নগরটি বেলগাঁও অপেক্ষা

অপেক্ষাকৃত নূতন। ধার্ব্বারের ২॥০ মাইল দক্ষিণে সোমেশ্বরদেবের একটি পুরাতন মন্দির আছে। তাহাতে নবলুর ও অন্য কয়েকটি গ্রামের নাম উল্লেখ থাকিলেও, ধার্ব্বারের নাম নাই। অনুসন্ধানে যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে ১৪০০ খৃঃ পূর্ব্বের কোন অনুশাসন অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই, যাহাতে ধার্ব্বার নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, বিজয়নগরের মহারাজ দেবরায়ালুর সেনানী ধার্ব্বারের দুর্গ নির্ম্মাণ ও আপন নাম চিরস্মরণীয় রাখিবার অভিপ্রায়ে, ঐ দুর্গ ধার্ব্বার নামে অভিহিত করেন। তিনি তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগর নষ্ট হইলে, ধার্ব্বারের শাসনকর্ত্তা একপ্রকার স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতেছিলেন। ১৫৭৩ অব্দে বিজাপুরের আলি আদিলশাহ ধার্ব্বার অবরোধ ও ছয় মাস পরে ঐ দুর্গ অধিকার করিয়া, এই ধার্ব্বারের নিকটস্থ প্রদেশ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লয়েন। সেই সময় হইতে উহা বিজাপুরের শাসনে থাকে। ১৬৬০ অব্দে ধার্ব্বারের গবর্ণর আব্দুল গফর বহির্দ্বারের তোরণ ও দরজাটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৬৭৪অব্দে মহারাষ্ট্রবীর শিবজী ধার্ব্বার স্বরাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু ১৬৮৫

অব্দে দিল্লীর মোগল-সম্রাট আরঙ্গেব ধার্ব্বার আপন অধিকারভুক্ত করিলে, উহা বিজাপুরের মোগল গবর্ণরের তত্ত্বাবধানে ১৭৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের অধিকারে থাকে। পেশোয়া বালাজীরাও মুসলমান কেল্লাদার অর্থাৎ দুর্গরক্ষীকে বাকী ৪০ চল্লিশ হাজার টাকা বেতনস্বরূপ উৎকোচ দিয়া, উহা মহারাষ্ট্ররাজ্যভুক্ত করেন। ১৭৭৪ খৃঃ মহিসুরের হাইদার আলির্খাঁর সেনানায়ক ফজল্-উল্লা-খাঁ উহা অধিকারপূর্ব্বক একদল সেনা রাখিয়া আইসেন। মহিসুরের অন্তর্গত বঙ্কাপুরে ২৫ মাইল দক্ষিণে অন্নবর্ত্তীর সংগ্রামে হাইদার আলি পরাভূত হইলে, পেশোয়া মাধবরাও ধার্ব্বার অবরোধ করিয়া, উহা পুনরায় অধিকার করেন। ১৭৮৪ অব্দে টিপুসুলতান ধার্ব্বার ও অপর কয়েকটি দুর্গ আপন অধিকারে আনিয়াছিলেন। অনন্তর চারি বৎসর পরে পেশোয়া উহা উদ্ধার করিয়া লইলে, টিপু স্বয়ং যাইয়া, কেল্লাদারকে পরাস্ত করিয়া, দুর্গ হস্তগত করেন। ১৭৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রসেনা একত্রে যাইয়া, দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল। ছয়মাস অবরোধের পর দুর্গরক্ষক সেনাসমভিব্যাহারে দুর্গ হইতে বহির্গত হইলে, ১৭৯১ সালের ৭ই এপ্রেলে উহা পেশোয়ার

অধিকারে আইসে। ১৮১৭ অব্দে পেশোয়ার সহিত পুনাতে যে সন্ধি হয়, তাহাতে ধার্ব্বার ব্রিটিশশাসনভুক্ত হইয়াছে। ১৮৩৮ অব্দে তথাকার ব্রাহ্মণ ও লিঙ্গায়ৎ-দিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী-বিদ্রোহের সময় দুর্গের এক অংশের প্রাচীর ভূমিসাৎ করা হইয়াছে। এখন ধার্ব্বারে নেটিভ ইন্‌ফ্যাণ্ট্রি রেজিমেণ্ট অর্থাৎ দেশীয় সৈন্যসম্প্রদায় থাকে। উহা ডিষ্ট্রিক্টের হেড কোয়ার্টর অর্থাৎ মূলস্থান হইয়াছে এবং সমুদ্রতল হইতে ২৫০০ হাজার ফুট উচ্চ বলিয়া, উহাতে স্নিগ্ধ বায়ু বহিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালেও উত্তাপ-বশতঃ কষ্ট হয় না। আবার দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলওয়ের হেড্ অফিস অর্থাৎ প্রধান কার্য্যস্থান-বাটীর ত্রিতল প্রাসাদ ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ব্যয়ে এখানে নির্ম্মিত হইয়াছে। ক্রমে সহরের আয়তন ও তৎসহকারে প্রজা-সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। সমস্ত নগরটি দুর্গ, নগর, সিভিল ষ্টেশন অর্থাৎ ইংরেজাবাস বা সাহেবদিগের আড্ডা, সেনানিবাস ও সহরতলি বা উপশল্য, এই পাঁচ অংশে বিভক্ত।

দুর্গটি বর্ত্তুলাকার ও তাহার ব্যাস ৮০০ শত গজ হইবে। পূর্ব্বে ইহাতে একটিমাত্র প্রবেশদ্বার এবং

তাহাতে একটির পশ্চাতে আর একটি করিয়া চারিটী দরজা ছিল। বহির্ভাগের দরজা ও তোরণটির গঠন-প্রণালী অতি পরিপাটী। দরজার উপরে যে অনুশাসন খোদিত আছে, তাহাতে অবগত হওয়া যায়, ১৬৩৯ অব্দে গবর্ণর আবুল গফুরের কাপ্তেন আবদুল্লার তত্ত্বাবধানে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। দুর্গের ভিতর যে সকল বাটী আছে, তাহাতে পূর্ব্বে দেশীয় সৈন্য-সম্প্রদায়ের অফিসার অর্থাৎ কর্ম্মচারিগণ থাকিতেন। ১৭৭৫ অব্দ হইতে তাহাতে সিভিল অফিসারগণ অর্থাৎ প্রাড়বিবাক-সম্প্রদায় রহিয়াছেন।

দুর্গের পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে নেটিভ সহর অর্থাৎ দেশীয়-গণের "আবাস নগর" ও তাহার পশ্চাতে সহরতলি; এখন যাহাকে মঙ্গলবার ও শুক্রবার কহিয়া থাকে, তাহাই পুরাতন সহর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তাহা মাটির প্রাচীর ও পরিখায় সুরক্ষিত এবং উহাতে প্রবেশের জন্য পাঁচটি দ্বার ছিল। উত্তর দিকে দুর্গে যাইবার 'দুর্গদ্বার' পূর্ব্বোত্তর দিকে 'মুড়িহনুমান' দেবালয়ের নিকটে 'মুড়ি-হনুমান' দ্বার দিয়া, 'হেব্‌লি' গ্রামে যাইবার ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে 'নব্‌লর্‌' দ্বার দিয়া 'নব্‌লুর্‌' ও 'হুবলির' দিকে যাইবার পথ, পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে 'নুচম্ব্রি' দ্বার

দিয়া 'নুচম্বুলি' কূপে যাইবার ও পশ্চিম-উত্তর দিকে 'তেগুর' দ্বার দিয়া পুনার রাস্তার উপর 'তেগুর' গ্রামে যাইবার পথ ছিল ; এক্ষণে কেবল নবুলর্‌নামক দ্বারটি বিদ্যমান আছে। উহাই প্রাচীন মৃণ্ময় দুর্গের স্মৃতি জাগরিত করিয়া দিতেছে। অপর চারিটী দ্বার কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে।

সহরে অধিকাংশতঃ মহারাষ্ট্রদিগের বাস ; কার্য্য উপলক্ষে সমাগত অপরদেশীয় লোকও দেখিতে পাওয়া যায়। মিউনিসিপ্যাল সীমার মধ্যে ছয়টি চৌবাচ্চা, ৩টি পুষ্করিণী, দুইটী সিস্টরন্ অর্থাৎ জলাধার ও ৬১৪টি কূপ আছে। তিনটি পুষ্করিণীর জল কেবল গো মেষাদির পান করিবার জন্য ; অধিকাংশ কূপের জল লবণাক্ত। কেবল ১১৯টি কূপে মিষ্ট পানীয় জল পাওয়া যায়। শুনিলাম, সময়ে সময়ে অনেক কূপ জলশূন্য হয় এবং তজ্জন্য জলকষ্টও হইয়া থাকে।

নগরের উত্তর ও দুর্গের দক্ষিণে রবার্টসন সাহেবের ফল ও তরকারির বাজার। উহা অতি প্রশস্ত এবং উহাতে ৪০খানি দোকান আছে। ১৮৮১ সালে মেষ ও গোমাংস বিক্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ বাজার স্থাপিত হয়। মেষমাংসের ৩৪ খানি ও গোমাংসের ১২ খানি দোকান

আছে। ইহাতে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, প্রত্যহ কত-গুলি মেষ ও গো একমাত্র ধার্কার নগরে মনুষ্যোদরে যাইতেছে। এখানে স্লটার-হাউস অর্থাৎ কসাইখানাও আছে। একটিতে গোবধ ও অপরটিতে মেষাদি বধের জন্য সহরের ভিতর যে পুরাতন বাজার আছে, তাহাও অতি বৃহৎ এবং তাহাতে সর্ব্বপ্রকার শস্য, আটা, মিষ্টান্ন ইত্যাদি বিক্রয় হইয়া থাকে।

এখানে অনেকগুলি লিঙ্গায়ৎ জোলার বাস। তাহা-দিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি কম্বল ও কাপড় বুনিয়া, দিনপাত করে। ডিষ্ট্রিক্ট জেলে কার্পেট, তোয়ালে, টেবল্-ক্লথ, লেপ, বেতের কেদারা ও বাক্স নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

এখানে হিন্দুদিগের ১৩টি প্রধান মন্দির আছে। রায়র ব্যাস্রোয় প্রাচীন হনুমন্ত দেবালয়, উহা পূর্ব্বোক্ত নবলুর দ্বারের সন্নিকটে। মাধ্ব ধর্ম্মাধ্যক্ষ ব্যাস্রোয় বিজয়নগরের কৃষ্ণরায়ালুর নাবালক পুত্রের অধিকার সময়ে ১২ বৎসর রাজ্যশাসন করেন। তৎকালে ১৫১০ অব্দে রাজ্যমধ্যে সমুদায়ে ৩৬০টি মারুতির মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল; উক্ত হনুমন্ত মন্দির তাহাদের অন্য-তম রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া, তাঁহার নাম স্মরণ করাইয়া

দিতেছে। অতএব এই মন্দির প্রায় ৪০০ শত বৎসরের হইবে। ১৭৭৯ খৃঃ মাধ্বগুরু সত্যবোধস্বামী আর একটি মারুতির মন্দির নির্ম্মাণ করেন। 'মুড়ি-হনুমন্' দ্বারের নিকট তৃতীয় মুড়ি-হনুমনদেবের মন্দির রহিয়াছে। উহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা পরিজ্ঞাত নাই। এখানে দুর্গাদেবীর দুইটি মন্দির আছে; তন্মধ্যে একটি নগরে ও অপরটি দুর্গের অভ্যন্তরে। তদ্ব্যতীত, দুইটি নরসিংহস্বামীর মন্দির। একটি সহরে ও অপরটি ধার্ব্বার হইতে এক মাইল দূরে 'মাড়িহল' নামক স্থানে। শুনিলাম, স্বর্গীয় দাওয়ান রায়-বাহাদুর শ্রীনিবাস রাও কর্ত্তৃক ১৮৮২ খৃঃ শেষোক্তটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অপর দুইটি পাণ্ডুরামদেবের মন্দির। ১৮০০ খৃঃ বাপাজী সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক উহার একটি এবং ১৮২০ খৃঃ কোন বর্দ্ধিষ্ঠ বণিক রামাপ্পানায়ক কর্ত্তৃক অপরটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, জৈনদিগের একটি মন্দির এবং লিঙ্গায়ৎদিগের বীরভদ্র ও 'বাসপ্পা' নামে দুইটী দেবালয়ও আছে। লিঙ্গায়ৎদিগের ছোট বড় ২৫টি মঠে অনেকগুলি লিঙ্গায়ৎ সন্ন্যাসী থাকে।

মুসলমানদিগেরও জুম্মা ও বার-ইমাম্ নামে দুইটী মস্‌জিদ নগরে এবং হাভেল 'পাট্টচার' নামে আর একটী,

দুর্গমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। খ্রীষ্টানদিগের জন্য একটী জারম্যান মিসন্ চ্যাপল্ ও দুইটী রোমান্ ক্যাথলিক চ্যাপল্ দেখিতে পাওয়া যায়।

সিভিল ষ্টেশনটি, দুর্গ ও 'দেশীয় নগরের' পশ্চিম-দিকে; উহা পূর্ব্ব পশ্চিমে ১।• মাইল ও উত্তর দক্ষিণে এক মাইল বিস্তৃত হইবে। উহাতে যে কয়েকটি বর্ত্ম আছে, তাহার সকলগুলিই অতি প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। বর্ত্মের উভয় পার্শ্ব সুবৃহৎ বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত। ঐ সকল বৃক্ষের ছায়া থাকাতে, দ্বিপ্রহরেও পথগমনে কষ্ট হয় না। সর্ব্বস্থানেই দেশীয় নগর ও সিভিল ষ্টেশন উভয়ের এইরূপ পার্থক্য দেখা যায়। উহার সর্ব্ব দক্ষিণে কলেক্টর সাহেবের আদালত। তাহারই সন্নিকটে উক্ত সাহেবের বৃহৎ প্রাসাদ। প্রাসাদের উদ্যানটি অতীব বিস্তৃত এবং নানাবিধ পুষ্প, গুল্মলতা ও ফলশালী বৃক্ষে সুশোভিত। উক্ত উদ্যানের পার্শ্বে ট্রেনীং কলেজ ও হাই স্কুল। উহার পশ্চিমভাগে পূর্ত্তবিভাগের কার্য্যালয় ও জজ সাহেবের বাঙ্গালা। উক্ত বাঙ্গালার পূর্ব্বদিকে থ্যাকারি ও মুন্‌রো সাহেবের প্রস্তরময় দীর্ঘ স্তম্ভ। তাহার পূর্ব্বদিকে জজ-আদালত, পোষ্ট অফিস ও রোমান ক্যাথলিক চ্যাপল্। কলেক্টর সাহেবের উদ্যা-

নের পূর্ব্বভাগে সবর্ডিনেট জজের নূতন আদালত গৃহ ; বাগানের দক্ষিণদিকে জারম্যান মিসন্ চ্যাপল্ অর্থাৎ জার্ম্মানদিগের উপাসনামন্দির ও মিসন্ অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্মাচার্য্যদিগের আবাস-গৃহ। সিভিল ষ্টেশনের অবশিষ্টাংশ অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের বাসাবাটীতে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক বাঙ্গালার চতুর্দ্দিকেই বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাদিতে পরিশোভিত সুবৃহৎ উদ্যান। সমস্ত সিভিল ষ্টেশন একটি বৃহৎ উদ্যান বলিলেও, অত্যুক্তি হইবে না ; দর্শকমাত্রেই যে তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। সিভিল ষ্টেশনের পশ্চিম উত্তর দিকে লিউন্যাটিক অর্থাৎ পাগলদিগের আশ্রয়স্থান ও ডিষ্ট্রিক্ট জেল। জেল উন্নত প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। উত্তর দিক দিয়া প্রবেশদ্বার, বহির্ভাগে কয়েদিদিগের কারখানা বাটী ও উদ্যান, তাহা ফনি মনসার বেড়ার দ্বারা সুরক্ষিত এবং তাহার পশ্চাতে একটি সুগভীর পরিখা। দুর্গের ভিতর সম্প্রতি নূতন সিভিল হাঁসপাতালবাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। দুর্গের অভ্যন্তরে ষ্টেশন লাইব্রেরি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ইংরাজাবাসের পুস্তকালয় বাটী।

ধার্ব্বারের দক্ষিণে দুই মাইল দূরে 'মৈলারগুড্ডু' পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চদেশে জৈন-মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত

একটি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা কোন্ সময়ে কোন্ মহাত্মা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, জানিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহার সম্মুখের স্তম্ভে পার্সি অক্ষরে খোদিত একটি অনুশাসনে এইমাত্র জানা যায় যে, বিজাপুরের রাজা মহম্মদ আলি শার রাজত্বসময়ে ১৬৭০ খৃঃ শাসনকর্ত্তা মহম্মদ খাঁ উল্লা উহা মুসলমানদিগের ভজনালয়ে পরিণত করিয়াছিলেন। শুনিলাম, ১৭৫৩ খৃঃ ধার্ব্বার পেশোয়ার রাজ্যভুক্ত হইলে, তাঁহার আদেশে উহাতে হিন্দুদেবতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

আমরা গাড়ীতে চাপিয়া দুর্গ, সিভিল ষ্টেশন ও রেলওয়ে আফিসবাটী দর্শনপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইয়া, রাত্রির গাড়িতে তথা হইতে বেলগাঁও গমন করিলাম।

বেলগাঁও।

১৮৯১ সালে ১৫ই অক্টোবর প্রাতে বেলগাঁও রেল-ষ্টেশনে আসিয়া পঁহুছিলে, রেলওয়ের সিপাহীর ফৌজদার আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্লাট-ফরমে আসিয়াছিলেন। আমরা প্রথমে ওয়েটিং রুম অর্থাৎ বিশ্রাম-গৃহে যাইয়া, প্রাতঃকৃত্যসমাপনপূর্ব্বক পরে নগরপরিদর্শনে গমন করি।

এই নগরটি ১৫।৭ উত্তর অক্ষরেখায় ও ৭৪।৪২ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায়, ধারোয়ার হইতে উত্তর পশ্চিমে ৪৫ মাইল ও পুনা হইতে দক্ষিণে ২০০মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা অতি পুরাতন ও অনুশাসনে বেনুগ্রাম নামে অভিহিত হইয়াছে। ১৭৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত হিন্দুশাসনাধীনে থাকিয়া, পরে ১৭৭৩ হইতে ১৭৫৪ পর্য্যন্ত মুসলমান অধিকারে ও তৎপরে ১৭৫৫ হইতে ১৮০২ খৃঃ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রদিগের অধীনে অবস্থিতি করে। অনন্তর ৩য় মহারাষ্ট্রযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ-শাসনভুক্ত হইয়াছে। গোলি-হোল্লিনামক গ্রামে ১১৬০ খৃঃ একটি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে একপ্রকার স্থির বলা যাইতে পারে,

যে, কাদম্ববংশীয় শিবজিৎনামে কোনও রাজা বেনুগ্রামে রাজত্ব করিতেন। দুর্গের ভিতরে যে দুইটী অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে. তাহা ১২০৫ খৃষ্টাব্দের। তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে, রণ্টাবংশীয় কোন যোদ্ধা কাদম্ব-বংশীয় রাজাদিগকে পরাভূত করিয়া, বেনুগ্রাম আপন অধিকারভুক্ত করিয়া লয়েন; পূর্ব্বে তাঁহারা 'সুগন্ধবর্ত্তা' নামক স্থানে থাকিতেন। পরে তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক বেনুগ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। ১২৫০ খৃঃ নিজাম-রাজ্যের অন্তর্গত দেবগিরির (বর্ত্তমান দৌলতাবাদ) যাদববংশীয় রাজারা উহা আপন অধিকারভুক্ত করিয়া-ছিলেন। পরে ১৩৭৫ খৃঃ বিজয়নগরের বুক্কপরায়ালু উহা স্বীয় অধিকারে আনয়ন ও একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ১৪৭২ খৃঃ বিরূপাক্ষ রায়ের আজ্ঞায় তথাকার শাসনকর্ত্তা ধার্ব্বারের অন্তর্গত 'বঙ্কাপুরের' শাসনকর্ত্তাকে সাহায্য করিলে, ২য় মহম্মদখাঁ ব্রাহ্মণী বেলগাঁও অব-রোধ করিয়া, প্রথম প্রাচীর অধিকার করিয়াছিলেন। তাহাতে শাসনকর্ত্তা অনন্যোপায় হইয়া, পত্রবাহকের বেশধারণ ও মহম্মদশার নিকট গমনপূর্ব্বক আপন পরিচয় প্রদান করিয়া, বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়েন। মহম্মদশাহ উহা আপন অধিকারভুক্ত করিয়া লইলে,

১৪৮১খৃঃ নরসিংহ রায়ালু পুনর্গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু অকৃতকার্য্য হয়েন। ১৪৭৯খৃঃ উহা বিজয়পুরের (বিজাপুরের) অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। ১৫১০খৃঃ হিন্দুরা রাজবিদ্রোহী হইয়া, মুসলমান-শাসনকর্ত্তাকে তথা হইতে বহিস্কৃত করিয়া, বিজয়নগরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু পর বৎসর আসদ্-খাঁ উহা পুনরধিকার করিয়া, তথাকার শাসনকর্ত্তারূপে নির্ব্বাচিত হয়েন। তিনি তথায় থাকিয়া, ১৫১৯ খৃঃ সর্ফানামক মস্জিদ ও ১৫৩০ খৃঃ দুর্গের সংস্কার করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দুর্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৫৪৯ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। ফিটনামে ইংরাজ পরিব্রাজক বেলগাঁও পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ১৬৭৩ খৃঃ মহারাষ্ট্রবীর শিবজী উহা লুণ্ঠন করেন। ১৬৮৬ খৃঃ বিজাপুরের পতনের সহিত উহা মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায় এবং পরে হাইদ্রাবাদের নিজামের অধিকারে আইসে। ১৭৩০ খৃঃ সাবনুরের নবাব উহা প্রাপ্ত হয়েন। পরে ১৭৫৪ খৃঃ মহারাষ্ট্র-সচিব পেশোয়া উহা স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লইলে, ১৮০২ খৃঃ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রদিগের শাসনে থাকে। ৩য় মহারাষ্ট্র-যুদ্ধের সময় জেনারল অর্থাৎ সেনাপতি মুনরো উহা অধিকার করিয়াছিলেন। তদবধি উহা

ইংরাজশাসনে রহিয়াছে। ১৮১৬ খৃঃ উহা কনৃটিকের মিলিটরি হেড কোয়াটরে অর্থাৎ সামরিক কার্য্য-বিভাগের মূলকার্য্যস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পরে ১৮৩৮ খৃঃ সিভিল্ অর্থাৎ বিচারবিভাগের মূলকার্য্যস্থান রূপে পরিণত হইয়াছে।

এখানকার আবহাওয়া অতি উত্তম, জল সাধারণতঃ মিষ্ট, কুপ ব্যতীত পাঁচটী পুষ্করিণী আছে। তন্মধ্যে একটী কেল্লার নিকট, দুইটী কল্লেশ্বরের নিকট এবং অপর দুইটী অন্যদিকে। সেনানিবাসের দক্ষিণদিকে নাগরকেরী হ্রদের উপরিভাগে 'নাগ-ঝরি' নামে যে প্রসিদ্ধ ঝরণা আছে, তাহার জল সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

সহরটি বহুল-প্রজা-বিশিষ্ট। এখানে তিন শতের অধিক বণিক ব্যবসায় করিয়া থাকে এবং যে মিউনিসি-পাল বাজার আছে, তাহা ১৮৮৬ খৃঃ ৭০০৬ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহাতে ৫২ খানি দোকান আছে। ছাগ ও গোমাংস বিক্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ বাজার আছে। প্রতিসপ্তাহে যে হাট হইয়া থাকে, তাহাতে সর্ব্বপ্রকার শস্য, দেশী কাপড়, কাষ্ঠ, ঘাস, মাটীর বাসন ইত্যাদি বিক্রয় হয়।

এখানে শিক্ষা দিবার জন্য একটি গবর্ণমেণ্ট, একটি মিসন্, পাঁচটী প্রাইভেট্ ও একটি বালিকা বিদ্যালয় আছে।

এখানে যে ৬টি প্রধান হিন্দু-দেবালয় আছে, তাহার ১মটীতে অ্যামাবা, ২য়টীতে কল্লেশ্বর, ৩য়টীতে মারুতি, ৪র্থটীতে শিবলিঙ্গ, ৫মটীতে বিষ্ণু ও ৬ষ্ঠটীতে বিথবার মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। সকল মন্দির নূতন বলিয়া বোধ হইল। সেনানিবাসের মধ্যে প্রোটেষ্ট্যাননামক অন্যতর খ্রীষ্টসম্প্রদায়ের সেণ্টমেরিনামে একটী গির্জ্জা আছে। উহা গথিক অর্থাৎ ইয়ুরোপস্থ গথনামক জাতির গৃহ-নির্ম্মাণপ্রণালীর অনুকরণে নির্ম্মিত। উহাতে ৭০০ শত উপাসক বসিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। তদ্ব্যতীত, রোমান্-ক্যাথলিকনামক অন্যতর খ্রীষ্টসম্প্রদায়ের জন্য যে তিনটী গির্জ্জা আছে, তাহার মধ্যে যেটি নেটিভ ইন্-ফ্যাণ্ট্রী লাইনের অর্থাৎ দেশীয় সৈনিকশাখার নিকট, তাহা সেণ্টমেরী নামে অভিহিত। যেটি সদর বাজারে, তাহাকে সেণ্টয়্যাণ্টনি কহে। তৃতীয়টী কমিসরিয়েট্ অর্থাৎ রসদ বিভাগের নিকট; উহার নাম জ্ঞাত নাই। এতদ্ভিন্ন মুসলমানদিগের জন্যও দুইটী ভজনালয় রহিয়াছে।

এখানে জেনারেল হস্পিটাল অর্থাৎ সাধারণ রুগ্ন-নিবাস ও দেশীয় ইন্‌ফ্যাণ্ট্রী হস্পিটাল অর্থাৎ সৈনিক রুগ্ননিবাস নামে দুইটি হস্পিটাল অর্থাৎ রুগ্ননিবাস আছে। জেনারল হস্পিটালের ভিতর সিনিয়ার্ মেডিক্যাল অফিসারের অর্থাৎ চিকিৎসা-বিভাগীয় প্রধান কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে একটি অব্‌জারভেটরি অর্থাৎ মানমন্দির আছে।

নগরের দক্ষিণ পশ্চিমে ব্রিটিশ আর্টিলারি অর্থাৎ গোলাগুলির কারখানা ও তাহার পশ্চাতে নেটিভ ইন্‌ফ্যাণ্ট্রী লাইন অর্থাৎ দেশীয় সৈনিকশাখার স্থান। নগরের পূর্ব্বদিকে ছয় মাইল দূরে পুরাতন দুর্গ। আমরা ষ্টেশন হইতে বহির্গত হইয়া, সদর বাজারের ভিতর দিয়া, আর্টিলারি লাইনের মধ্যে প্রবেশিয়া, সেণ্টমেরি গির্জ্জার নিকটে আসিলাম। পরে ইন্‌ফ্যাণ্ট্রী লাইনের পার্শ্ব দিয়া, সহরে পৌঁছিলাম। তথায় মারুতি বিথবার মন্দির ও কপূরালোকের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, দুর্গে গমন করিলাম। বম্বে প্রেসিডেন্সিতে যে ছয়টি দুর্গ গবর্ণমেণ্টের রক্ষাধীনে আছে, এইটি তাহাদিগের অন্যতম। দুর্গমধ্যে ১২০৫ খৃষ্টাব্দের দুইটি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে জানা যায়, ঐ দুর্গ জৈনরাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হই-

য়াছে। এই দুর্গের চারি দিকে যে পরিখা আছে, তাহা সময়ে ৪০হইতে ৫০ফুট গভীর ও ৭২ ফুট বিস্তৃত ছিল। এখন আর সে গভীরতা নাই; প্রত্যুত অনেক স্থান শুষ্ক পতিত রহিয়াছে। ইহার প্রাচীর ৩৪ ফুট উচ্চ হইবে। উহা গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং ভিতর দিয়া, সুপ্রশস্ত মাটীর দেওয়াল ও ঢালু আছে। দেওয়ালের এক অংশে প্রস্তরে অঙ্কিত জৈন-গণপতি ও বিষ্ণুমূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে, দুর্গের অভ্যন্তরে অনেক জৈন, শৈব ও বিষ্ণুর মন্দির ছিল। মুসলমান গবর্ণরেরা তাহা ভাঙ্গিয়া, তাহাদের পাথর প্রাচীরে লাগাইয়াছে। দেওয়ালে অনেকগুলি ক্রুজ অর্থাৎ গুপ্তিস্থান আছে। দুর্গের দুইটী প্রবেশদ্বার। দ্বারের উপরে প্রস্তরে খোদিত পার্সি অক্ষরে লিখিত যে তিনটী অনুশাসন আছে, তাহাতে জানা যায়, ১৫৩০ খৃঃ আদলখাঁর শাসনসময়ে রকুব আকিয়া খাঁ নামে কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে দুর্গপ্রাচীরের এক অংশ নূতন নির্ম্মিত হয়। ১৬৩১ খৃঃ বন্দে আলির তত্ত্বাবধানে দুর্গের প্রধান গেট্ অর্থাৎ বহির্দ্বার নির্ম্মিত ও ১৬৩২ খৃঃ আবদুল হোসেনের তত্ত্বাবধানে উহার সংস্কার হইয়াছিল।

দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই, দক্ষিণ দিকে একটি অপ্রশস্ত মন্দিরে দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। শুনিলাম, তিনি দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সম্ভবতঃ, ১৭৫৪ খৃঃ বেলগাঁও মহারাষ্ট্রাধীন হইলে, উহা স্থাপিত হইয়া থাকিবে। ঐ মন্দির ব্যতীত, প্রাসাদাদি অন্য কোনরূপ হিন্দুর চিহ্ন দেখিলাম না। তবে কমিসরিয়েট্ ষ্টোর অর্থাৎ রসদবিভাগীয় ভাণ্ডার-গৃহ-প্রাচীরের বহির্ভাগে একটি, প্রাচীরের মধ্যে একটি ও ষ্টোরের সন্নিকটে আর একটি ক্ষুদ্র জৈন-মন্দির আছে মাত্র। মুসলমানদিগের কীর্ত্তিস্বরূপ আসাদ খাঁর নির্ম্মিত সাফা মস্জিদ অবলোকন করিলাম। উহা ২৭ গজ লম্বা ও ১৯ গজ প্রস্থ হইবে। উহার দরজা গাঁথিয়া, বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তজ্জন্য ভিতর দেখিতে পাইলাম না। তবে শুনিলাম, বৎসরান্তে নেমাজ পড়িবার জন্য একবার দরজা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। দুর্গের অভ্যন্তরে ইংরাজদিগের কীর্ত্তি-স্বরূপ অফিসারে অর্থাৎ কর্ম্মচারীদিগের থাকিবার জন্য ৩৫টি বাঙ্গালা, একটি ম্যাগাজিন্ অর্থাৎ সামরিক ভাণ্ডার বা বারুদাদি রাখিবার গৃহ একটি অর্ডেনষ্টোর, একটি কমিসেরিয়ট ষ্টোর, একটি ব্রিটিশ পদাতি ও

আর্টিলারি অর্থাৎ গোলন্দাজ সিপাহী থাকিবার ব্যারাক, একটি কোয়াটার গার্ড, অর্থাৎ সেনানিবাসের প্রহরী-গৃহ একটী মিলিটরি অর্থাৎ সামরিক গারদ, একটি কান্টীন কাফির দোকান, একটি স্কুল, প্লঞ্জবাথ ও খ্রীষ্টচর্চ্চ এবং ৩৮টি কূপ রহিয়াছে। আমরা এই সমস্ত দর্শনপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, নগরের ভিতরে বাজার ইত্যাদি দেখিয়া, রেল ষ্টেশনে ফিরিয়া আসি। পরে মার্ম্মাগোয়ার উদ্দেশে গমন করি।

মার্ম্মাগোয়া।

আমরা বেলগাঁও হইতে মার্ম্মাগোয়ার নূতন হার্বার অর্থাৎ পোতাশ্রয় পাঞ্জিম দেখিতে আসি। পাঞ্জিম পর্টুগিজদিগের ভারতবর্ষস্থ অধিকারসীমার রাজধানী ও মার্ম্মাগোয়া হার্বার W.J.P. নামক রেলের টারমিনস্ অর্থাৎ শেষসীমা। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলের লণ্ডা জংসন-নামক সম্মিলিত স্থান হইতে ক্যাসল্ রক্ নামক ১৫।০

মাইল জংসন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার ভিতর। ক্যাসল্ রক্ হইতে মার্ম্মাগোয়া হারবার ৫৪॥० মাইল দীর্ঘ, রেলপথ ওয়েষ্ট অর্থাৎ পশ্চিম ঘাটনামক পর্ব্বতশ্রেণী ভেদ ও যথাক্রমে কোলেম, কলয়, সাম, বোদেম, চন্দোর, মার্গোয়া, মজোর্দ্দা, কন্সোলিম, দবোলিম ও ভাস্কডি-গামানামক জনস্থান সকল অতিক্রম করিয়া, মার্ম্মা-গোয়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে; পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিতে ষোড়শাধিক টনেল (সুড়ঙ্গ) আবশ্যক হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই লাইনে যথেষ্ট নির্ম্মাণকৌশল প্রদ-র্শিত হইয়াছে। মার্গোয়া পর্টুগিজ ডিপেন্ডেন্সির অর্থাৎ অধিকারের প্রধান ডিষ্ট্রীক্ট টাউন অর্থাৎ বিভাগীয় নগর। তথায় ডিষ্ট্রীক্ট জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ, পোষ্ট অফিস, একটি বড় ক্যাথিড্রল অর্থাৎ প্রধান ভজনালয়, কয়েকটি চ্যাপল্ অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয় এবং গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুল প্রভৃতি সমস্তই আছে। রাস্তা ঘাট পরিষ্কৃত, লোকসংখ্যা ১২०० হাজারের অধিক।

ভাস্কডিগামা-নগর সুপ্রসিদ্ধ ভারত আবিষ্কারক ভাস্কডিগামার নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ইহা পূর্ব্বে ধীবরগ্রামমাত্র ছিল। এই স্থানে ভাস্কডিগামা পোত হইতে অবতরণপূর্ব্বক পর্টুগিজদিগের পতাকা উড্ডীন

করেন। এখানকার রেলওয়ে ষ্টেশন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ; যাত্রীদিগের জন্য বিশ্রামাগার আছে। তজ্জন্য তাহারা রাত্রিতে এই ষ্টেশনে থাকে। সহরটী ক্ষুদ্র, রাস্তাগুলি পরিষ্কৃত, আহার্য্য দ্রব্য সর্ব্বপ্রকারই পাওয়া যায়। এখান হইতে মার্ম্মাগোয়া দুই মাইল দূর হইবে। 'মাণ্ডবী' নদীর মুখে যে সমুদ্রশাখা প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে 'মাণ্ডবী' উপসাগর কহে। হার্‌বার (পোতাশ্রয়) এই উপসাগরেরই সীমায় প্রতিষ্ঠিত। উপসাগরটীর পরিসর ৫ মাইল হইবে। পাহাড় হইতে উপসাগরের ভিতর দুই হাজার ফুট পর্য্যন্ত ব্রেক্‌-ওয়াটার অর্থাৎ সাগর-তরঙ্গের বেগহ্রাসার্থ বাঁধ প্রস্তুত করা হইয়াছে। উহা ১৮৮৪অব্দে আরম্ভ হইয়া, পাঁচ বৎসরে সম্পূর্ণ হয়। তদ্‌ব্যতীত, পাহাড়ের গাত্রে সমুদ্রের কতকটা কিনারা ভরাট করিয়া, ষ্টেশনবাটী নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। উপসাগর গভীর বলিয়া, বৃহৎ ষ্টীমারও ওয়ার্ফ অর্থাৎ জেটী ও ব্রেকওয়াটারের ধারে আসিয়া লাগিয়া থাকে।

মাণ্ডবী উপসাগরের অপর দিকে ইল্‌হাস দ্বীপ। উহা দীর্ঘে ১০ ও প্রস্থে ৫ মাইল হইবে। উহারই মধ্য-স্থলে পাঞ্জীম এবং তথা হইতে ৩ মাইল দূরে প্রাচীন গোয়া। প্রত্যহ বৈকালে পাঞ্জিম হইতে মার্ম্মাগোয়ায়

যাত্রী লইয়া, একখানি ষ্টীমার আইসে ও রেলযাত্রী লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। ভাস্কডিগামা হইতে ইল্‌হাস্ দ্বীপে দেশীয় পোত যাতায়াত করে।

আমরা পোতাশ্রয় সন্নিকটে পর্ব্বতোপরি রেলওয়ে ষ্ট্যার্ফ কোয়াটরে থাকিতে পাইয়াছিলাম। অপরাহ্ণ ৭টার সময় ট্রেন হার্‌বার ষ্টেশনে আইসে। তখন শুক্ল-পক্ষ হইলেও, বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু প্রত্যূষে ষ্ট্যার্ফকোয়াটারের নিকট হইতে চারি দিকের মনোহারী দৃশ্য দর্শনে মোহিত হইলাম। এখান হইতে হার্‌বার, ব্রেক্‌ওয়াটার, ইল্‌হাস দ্বীপ ও তাহার পর-পারে কবোর লাইট হাউস অর্থাৎ আলোকগৃহ এবং ক্ষুদ্র দুর্গ প্রভৃতি সমস্তই সুন্দররূপে দৃষ্ট হইল। অপরাহ্ণে নিম্নে অবতরণ করিয়া, হার্‌বার ও ব্রেকওয়াটার প্রভৃতি সন্দর্শন করিলাম। পরদিন প্রাতে পাঞ্জিম ও গোয়া সন্দর্শন করিতে গমন করি। দেশীয় পোতে মাণ্ডবী উপসাগরের পরপারে দোনাপন্‌লার খেয়াঘাটে ৯টার সময় আসি। তথা হইতে পাঞ্জিম ৬য় কিলোমিটর অর্থাৎ ৪ মাইল হইবে। গ্রাণ্ডট্রঙ্ক-রোড দিয়া, দোনা-পন্‌লা গ্রামের উপর হইয়া, পাঞ্জিমে আসিলাম। উহার অপর নাম নোব অর্থাৎ নূতন গোয়া। উহা পর্টুগিজ

ইষ্ট-ইণ্ডিয়ার অর্থাৎ পর্টুগিজদিগের অধিকৃত ভারত-সীমার রাজধানী ও প্রসিদ্ধ বন্দর; সহরটি পাঞ্জিম নদীর উপরে, রাস্তাগুলি বিলক্ষণ পরিষ্কৃত। গবর্ণরের প্রাসাদ, হাইকোর্ট, সেসনকোর্ট, কাষ্টমহাউস্, পুলিশ, পোষ্ট অফিস, কলেজ ও বাজারাদি সন্দর্শন করিয়া, আমরা প্রাচীন গোয়ার দিকে অগ্রসর হইয়া, সণ্টপানে অর্থাৎ লবণ-পোক্তানে আসিলাম। এই স্থানে পর্টুগিজদিগের লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে; আপাততঃ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট লবণ প্রস্তুত করিবার ঠিকা লইয়াছেন। তজ্জন্য ইংরাজদিগের পক্ষ হইতে একজন সণ্ট কমিশনার অর্থাৎ লবণপরিদর্শক কর্ম্মচারী পাঞ্জিমে অবস্থিতি করিতেছেন। সণ্টপান উত্তীর্ণ হইয়া, পুরাতন রায়বন্দরে আসিলাম। পূর্ব্বে ইহা শ্রীসম্পন্ন ছিল। এক্ষণে ইহার অবস্থান্তর হইয়াছে। এই নগরটি একটি সামান্য পাহাড়ের পাদদেশে। ক্রমে আমরা প্রাচীন গোয়াতে আসিলাম। উহা পূর্ব্বে পর্টুগিজদিগের অধিকৃত ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে মড়ক উপস্থিত হওয়াতে, লোকে সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। সেই অবধি উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ক্যাথিড্রল অর্থাৎ প্রধান উপাসনামন্দির ও

কনৃভেণ্ট অর্থাৎ মঠে অতি সামান্য লোকই থাকে। পরিদর্শক ক্যাথিড্রল ও কনৃভেণ্ট দর্শন করিতে আই-সেন মাত্র। আমরা প্রাচীন আর্সেনেল অর্থাৎ অস্ত্রাগার বা সেলাখানা ও দুর্গ অতিক্রম করিয়া, বৃহৎ বোনজিসস্ ক্যাথিড্রলে আসিলাম। ইহা কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা পরিজ্ঞাত নাই। ক্যাথিড্রলটী অতিবৃহৎ। উহার দরজার বাজু, খিলান, কার্নিস ও মোলৃডিং (বিট) বসলৃডনামক কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরবিশেষে নির্ম্মিত ও অপর সমস্তই লালবর্ণের নিইস্‌নামক প্রস্তরের। প্রবেশপূর্ব্বক সেণ্টভিনৃসেণ্টের মূর্ত্তি, তৎপরে ইগ্‌নেসিয়স্ ল্যঙ্গর ছবি ও সেক্রেমেণ্ট সেঞ্চুয়ারি সন্দর্শন করিয়া, সেণ্ট-ফ্রান্সিস্ ঝেবিয়র সমাধি দর্শন করিলাম। ইনি ১৬৬৬ অব্দে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টানধর্ম্ম প্রচারের এপোসল্ অর্থাৎ আচার্য্যরূপে আইসেন। পরে চীনে যাইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার সমাধি এই ক্যাথিড্রলে হইয়াছিল। তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাঁহার উপর লোকের বিশেষ ভক্তি আছে। তাঁহার মৃতদেহ ১৮৪৮অব্দে, পরে ১৮৭৮ অব্দে ও শেষবারে ১৮৯০ অব্দে জনসমাজে প্রদর্শিত হইয়াছিল। তৎকালে মান্দ্রাজ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেল কোম্পানিরা সিঙ্গল অর্থাৎ একবার মাত্র যাইতে

পারিবার ভাড়া লইয়া, যাতায়াতের টিকিট বিতরণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, অতি দূরদূরান্তর হইতেও সর্ব্বসম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান, বিশেষতঃ ক্যাথলিকেরা, অধিক কি, অনেক হিন্দুও তাঁহার পবিত্র দেহকঙ্কাল দর্শন করিতে আইসেন এবং দর্শনানন্তর আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। তাঁহার কঙ্কাল-দেহের এরূপ মহিমা যে, অনেক দুশ্চিকিৎস্য রোগীও তাঁহার সন্দর্শন ও স্পর্শে পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে। তাঁহার উপর লোকের প্রগাঢ় ভক্তি। কোন ক্যাথলিক এই ক্যাথিড্রলে প্রবেশ করিলেই, তাঁহার সমাধির সম্মুখে জানু পাতিয়া, উপবেশনপূর্ব্বক করজোড়ে স্তব স্তুতি করিয়া, তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কথিত আছে যে, একদা তিনি পত্র লিখিতেছিলেন, এমন সময়ে স্বয়ং যীশু আকাশমার্গ হইতে তাঁহাকে দর্শন ও উপদেশ প্রদান করিয়া যান। এই দর্শনের ছবি আমরা সেণ্ট-কইটনের ক্যাথিড্রলে সন্দর্শন করিয়াছি। এই সমাধি-গর্ভে যে সিন্দুকে তাঁহার পবিত্র দেহ-কঙ্কাল রক্ষিত আছে, তাহার একটি চাবি রোমের বিশপের নিকট ও আর একটি পাঞ্জিমের বিশপের সান্নিধ্যে রাখা হইয়াছে। ৯০ সালের ডিসেম্বরের পূর্ব্বে সেই চাবি রোম

হইতে আনীত হইয়াছিল। যেমন সেঞ্চুয়ারিতে, তদ্রূপ তাঁহার সমাধিতে, অক্ষত দীপ জ্বলিতেছে। আমরা তাঁহারে সম্মানপ্রদর্শনানন্তর প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, ক্যাথলিক পুরোহিতদিগের রত্নমণিমুক্তাখচিত বহুমূল্যের পরিচ্ছদসমূহ সন্দর্শন করিলাম। পূর্ব্বে কখন খ্রীষ্টান পুরোহিতদিগের এরূপ বহুমূল্য রত্নখচিত পোষাক দর্শন করি নাই। উক্ত পোষাকের মূল্য ৪।৫ লক্ষ টাকার অধিক হইবে। তদনন্তর আর একটি বৃহৎ ক্যাথিড্রল সন্দর্শন করি। ইহাও অতি প্রকাণ্ড ব্যাপার। পর্টুগিজ ভারতে যত বিশপ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা এই স্থলে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই ক্যাথিড্রলে চিরনিদ্রায় রহিয়াছেন। ইহার চারিদিকে গিল্টিকরা নানাবিধ বৃহৎ পেণ্টিং অর্থাৎ চিত্রপট আছে; যথা, ক্রূসে যীশু, সেণ্টপিটর, সেণ্টমেরি, ভার্জ্জানমেরির হস্তে শিশু যীশু, সেণ্টজর্জ, সেণ্টমার্কস্, গুড লাইফ (বোয়বিড), সেণ্টসিবশ্চিয়ন্, (১) ভার্জিন নেসিডডি সেণ্ট অণ্টনি ও সেণ্ট অলেজা ক্রস্ ইত্যাদি। এই ক্যাথিড্রল ১৫৫২ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

(১) পূর্ব্বে ইনি হিন্দু ছিলেন; পরে খ্রীষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, সেণ্ট হইয়াছিলেন।

এখানেও পুরোহিতদিগের রত্নমণিমুক্তাখচিত বহুমূল্যের পোষাক দর্শন করিলাম।

তদনন্তর সেণ্ট-কইটানো ক্যাথিড্রলে আসিলাম। এই স্থানে পর্টুগিজ ইষ্টিণ্ডিয়ার গবর্ণরদিগের অভিষেক-কার্য্য সমাহিত হইয়া থাকে। ভাস্কডিগামা ১৪৯৯ খৃঃ গোয়াতে আইসেন। ১৫০০ খৃঃ ফ্রান্সিস্ ডি অল্‌মুড়া, পর্টুগিজ ইষ্ট্-ইণ্ডিয়ার প্রথম শাসনকর্ত্তা (গবর্ণর) ও রাজপ্রতিনিধির (ভাইস্‌রয়ের) পদ প্রাপ্ত হয়েন। ভূত-পূর্ব্ব গবর্ণর পার্সোডি অর্কস্ ১৮৮৬ খৃঃ অবসর গ্রহণ করেন। ফ্রান্সিস্-ডি অল্‌মুড়া হইতে পার্সোডি অর্কস্ পর্য্যন্ত সমস্ত গবর্ণর জেনারেলের পূর্ণাকৃতি অয়েলপেণ্টিং অর্থাৎ স্নিগ্ধ-চিত্র সজ্জিত রহিয়াছে। কোন রাজপ্রতি-নিধির (ভাইস্‌রয়ের) মৃত্যু হইলে, পর্টুগালে পাঠাইবার পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত তদীয় মৃতদেহ এই ক্যাথিড্রলে রক্ষিত হয়। মহাত্মা সেণ্ট-কইটনোর নামে এই ক্যাথিড্রলের উৎসর্গ হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ণাকৃতি চিত্রমূর্ত্তি এখানে রক্ষিত হইয়াছে। এখানেও ক্রুসের উপর যীশুর মূর্ত্তি, সেণ্টজন্ দ্বারা যীশুর ব্যাপ্‌টীজম্ অর্থাৎ ধর্ম্মদীক্ষা, ক্রুস হইতে যীশুর অবতরণ, সেণ্টফ্রান্সিস্ জেভিয়ার লিখিতে লিখিতে আকাশপথে যেরূপে যীশুকে সন্দর্শন

করেন, যীশু যেরূপ বন্দীভাবে যুডার শাসনকর্ত্তার নিকট নীত ও তাঁহার শির কণ্টকমুকুটে বিদ্ধ হইয়া রক্ত ক্ষরিত হয়, তাহার ও তদ্ভিন্ন অপরাপর চিত্রও লক্ষিত হইল।

আমরা তথা হইতে সেণ্ট-মণিকানামক কন্‌ভেণ্টে অর্থাৎ মঠে আসিলাম। ইহাতে অনেকগুলি দেশীয় ও পর্টুগিজ জাতীয় সিষ্টার অব চ্যারিটী অর্থাৎ বিরক্তি-সোদরা বাস করিতেছেন। আকৌমার-ব্রহ্মচারিণী হইয়া, আজীবন যীশুর সেবাব্রতে দীক্ষিত থাকাই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম। এই রমণীগণ যেদিকে বাস করেন, তথায় পুরুষ যাইতে পারে না। উহার প্রত্যেক দ্বার লৌহকীলকে বদ্ধ। এই মঠ (কন্‌ভেণ্ট) ১৬০৬ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইহারই সম্মুখে কন্‌ভেণ্ট সেণ্ট-আগষ্টীন ও সেণ্ট-জন্ ডিঃ ডিউস্ এবং সেণ্ট-রোজারিয় ভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, আরও কত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র কন্‌ভেণ্ট ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। গোয়ায় পূর্ব্বোক্ত ক্যাথিড্রল ও কন্‌ভেণ্ট ভিন্ন দেখিবার আর কিছুই নাই; একটি আবাস-গৃহও দেখিলাম না। চারিদিকে কেবল নারিকেল-বৃক্ষের উদ্যান দৃষ্ট হইল।

পর্টুগিজরা ইংরাজদিগের মত পরিষ্কৃত না হইলেও, কতকটা তাঁহাদিগের ন্যায় বেশভূষায় থাকেন। নেটিব খ্রীষ্টানেরা গোয়াইজনামে অভিহিত; অর্থাৎ পর্টুগিজরা গোয়া অধিকার করিয়া, দেশীয় সমস্ত লোককে যীশু-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তাহাদিগের বংশাবলীরাই এখানকার গোয়াইজনামে অভিহিত। পুরুষেরা সাদা জীনের ট্রাউজার অর্থাৎ পাজামা ও কোট পরিধান, মস্তকে আমাদের মত ব্রীলেশক্যাপ্ (জরির টুপী) ও চটিজুতা ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা বাটীতে রঙ্গিণ শাটী ও কাঁচুলি ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু ভজনালয়ে যাইবার সময় শ্বেতবর্ণের শাটী এবং ওড়না পরিধান করে; আহার প্রায় বাঙ্গালীদিগেরই ন্যায় করিয়া থাকে। প্রাতে মুড়ির পরিবর্ত্তে কাঞ্জি, মধ্যাহ্নে তণ্ডুলান্ন অথবা রাগির অন্ন ও তরকারি এবং সায়াহ্নে তণ্ডুলান্ন ভক্ষণ করে। এখানে মৎস্য সুলভ ও মৎস্যই উপাদেয় ব্যঞ্জন। অপরাপর দ্রব্যাদিও সুলভ। তণ্ডুল ৪৲ টাকায় মুড়া (২১৬ সের), রাগি ৪ পাই হইতে ৯ পাই সের, দুগ্ধ টাকায় ১২ সের, নারিকেল তৈল ৫ আনা সের, ঘৃত ১৲ টাকা সের। আম্র, কাঁঠাল, পেঁপে, লাউ, কুমড়া, নারিকেল, ঝিঙে, দেশী বাদাম, তেঁতুল, ধনে, নানাপ্রকার

কদলী, কমলা, বাতাবি ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার ফলও জন্মিয়া থাকে এবং বাজারেও বিক্রয় হয়। গোয়াইজরা শান্ত, শিষ্ট; চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি কার্য্যে কচিৎ লিপ্ত হয়।

হুবলি।

মার্ম্মাগোয়া হইতে প্রত্যাগমনসময়ে আমরা হুবলি সন্দর্শন করি। ইহা ধার্ব্বার ডিষ্ট্রীক্টের অন্তর্গত। ধার্ব্বার হইতে ১৩ মাইল দূরে, হরিহরপুনা গ্র্যাণ্ডট্রঙ্ক রোডের উপরে অবস্থিত। এইখানে দক্ষিণ-মহারাষ্ট্র-রেলের হুবলি হরিহরশাখার জংসন ষ্টেশন ও লোকোমটিভ ওয়ার্ক শপ অর্থাৎ গাড়ী ও ইঞ্জিন প্রস্তুত করিবার কারখানা। ইহা উত্তর ১৫।২০ অক্ষরেখায় ও পূর্ব্ব ৭৫।১৩ দ্রাঘিমায় এবং সমুদ্রতল হইতে ২৫০০ ফুট উপরে অবস্থিত। পুরাতন ও নূতন হুবলি নামভেদে সহরটি দুই অংশে বিভক্ত। শতাধিক কূপ থাকাতে, জলকষ্ট বিশেষ নাই। রাস্তা ঘাটাদি উত্তম পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন। পুরাতন দুর্গ-সীমার মধ্যে মবলগদার, সবর্ডিনেট জজ্ এবং মিউ-

নিসিপ্যাল অফিস। ইহা প্রথম শ্রেণীর মিউনিসিপালিটি। এ প্রদেশে কার্পাস অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। হুবলি কার্পাস বিক্রয়ের প্রধান গঞ্জ। এখানে একটি স্পিনিং ফারম অর্থাৎ সূতাকাটাইয়ের কারখানা ও দুইটি জিনিং ফারম অর্থাৎ তুলা পরিষ্কার করিবার কারখানা আছে। সূতা ও কার্পাস্ গাঁট বাঁধিয়া রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানকার কৃতবিদ্য অধিবাসীরা একটি লাই-ব্রেরী (পুস্তকালয়) ও রিডিং রুম অর্থাৎ পাঠগোষ্ঠী স্থাপন করিয়াছেন। বালকদিগের জন্য ছোট বড় ২৬টী বিদ্যালয় আছে; দাতব্য চিকিৎসালয়ে অনেক রোগী বিনা ব্যয়ে ঔষধ ও পথ্য পাইয়া থাকে। এখানে হিন্দু-দিগের ৩৭টী দেবালয় ও ২৭টী মঠ, মুসলমানদিগের ১৭টী মস্‌জিদ এবং খ্রীষ্টানদিগের প্রোটেষ্টান চর্চ্চ ও রোমান ক্যাথলিক চ্যাপল্ রহিয়াছে। তন্মধ্যে হিন্দু-দিগের ১৩টী দেবালয় পুরাতন সহরে ও ২৪টী নূতন সহরে। ভবানী শঙ্করের দেবালয় পুরাতন সহরে অব-স্থিত। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। ইহার স্তম্ভে কেনারি অক্ষরে যে অনুশাসন আছে, তাহার তারিখ ৯৭৬ শক।

হুবলির পুরাবৃত্ত দুষ্প্রাপ্য। এই স্থান পুরাণোদ্বলী-নামে কথিত। হুবলির এক অংশ বায়ার হুবলিনামে

প্রসিদ্ধ। ১৫৪৭ অব্দে বিজয়নগরের রাজা ও পর্টুগিজ-দিগের সহিত যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতে হুবলির নাম উল্লিখিত আছে; তখন উহা সোরা বিক্রয়ের প্রধান বাজার ছিল। ১৫৭৩ অব্দে শিবজীর সেনানায়ক হুবলি লুণ্ঠন করিয়াছিল। তাহার ৪ বৎসর পরে বাদশাহ অরঙ্গেব উহা অধিকারপূর্ব্বক শাহ মহমৎ খাঁকে দুর্গ ও বায়ার হুবলি জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন। তাহার ৮ বৎসর পরে বাদশা-পুত্র ধার্ব্বার ও হুবলি অধিকার করিয়াছিল। ১৭২৭ অব্দে নূতন হুবলি ও দুর্গ নির্ম্মিত হয় এবং ১৭৫৫ অব্দে পেশোয়ার অধিকারে আইসে। ১৮১৮ অব্দে তৃতীয় মহারাষ্ট্র-সমরসময়ে উহা ইংরাজ-দিগের অধিকৃত হয়।

আমরা প্রথমে সূতাকাটাইয়ের কারখানা দর্শন করি। ইহাতে ১৮০০ হাজার স্পেণ্ডেলে অর্থাৎ চরকা-বিশেষে সূতা প্রস্তুত হইতেছে। ৯০টী হর্স-পাউয়ার অর্থাৎ ৯০ই ঘোড়ার বেগবিশিষ্ট ইঞ্জিনে এই সমস্ত কার্য্য চলিতেছে। তথা হইতে অরুড়স্বামীকে সন্দর্শন করিতে গমন করিলাম। ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে একটী ক্ষুদ্র মঠে ২০ বৎসর হইল, তিনি বাস করিতে-ছেন। মঠের ভিতরে একটি গৃহের মধ্যস্থলে পদচিহ্ন

রহিয়াছে। উহাকে দত্তাত্রেয়ের পাদপদ্ম কহে। তাহারই পার্শ্বে তিনি নিত্য ধ্যানে বসেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর হইবে। ইনি নিজগুণ-শিবযোগীর মতে চলিয়া থাকেন। অবধূত নিজগুণ-শিবযোগী মহিসুর হইতে ১৬ মাইল অন্তরে শিবলিঙ্গ নামে কোন পাহাড়ে বাস করিতেন এবং তথায় তাঁহার সমাধি রহিয়াছে। তিনি অবধৌত সন্ন্যাসী ছিলেন এবং কানারি ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যথা,—১। বিবেকচিন্তামণি ছয় হাজার শ্লোক; ২। পরমাণুবোধক এক হাজার শ্লোক; ৩। অনুভবসার ৫৩৪ শ্লোক; ৪। পরমার্থগীতা ১১শ অধ্যায় ও পরমার্থ-প্রকাশক যোগগ্রন্থ সহস্র শ্লোক। অরুড়স্বামীর সহিত কথোপকথনে জানিলাম, তিনি অদ্বৈত-মতাবলম্বী, অতি অমায়িক, সদালাপী ও সরল-প্রকৃতির সাধু। আমরা তথা হইতে লিঙ্গায়ৎদিগের 'গুরুসিদপ্পার' মঠ সন্দর্শন করিতে আসি। ইহা 'গুরুসিদপ্পা-হুণ্ডার' পূর্ব্বদিকে। এই হুণ্ডার দুই দিকে রাস্তা ও তৃতীয় দিকে মুঙ্গারেড্ডী ফকিরাপ্পার জীনফ্যাক্টরীতে অর্থাৎ তুলা ছাপ করিবার কারখানায় ১১ মণ ওজনের ৫০টী কাপাসের গাঁইট প্রত্যহ বাঁধা হয়। এই হুণ্ডার জল অতি সুমিষ্ট বলিয়া, দূরদূরান্তর হইতে লোক

আসিয়া লইয়া যায়। গুরুসিদপ্পাস্বামী পূর্ব্বে চিতলদ্রুগে থাকিতেন। ১৭২৭ অব্দে হুবলীতে আইসেন। তাঁহার অন্যতর প্রিয় শিষ্য বসাপ্পা এই মঠ নির্ম্মাণ ও হুণ্ডা কর্ত্তন এবং প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া দিয়াছেন। গুরুসিদপ্পা মানবলীলা সংবরণ করিলে, মঠের মধ্যস্থলে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। ঐ সমাধির উপর যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, অদ্যাপি তাহার পূজা হইয়া থাকে। তাঁহার শিষ্যপরম্পরাই মঠাধিকারী হইয়া আসিতেছেন। তাঁহার শিষ্য (১) গুরুসিপ্পাস্বামী, তাঁহার শিষ্য (২) উচ্চপ্পাস্বামী, তাঁহার শিষ্য (৩) সিদ্ধলিঙ্গস্বামী, তাঁহার শিষ্য (৪) গঙ্গাধরস্বামী, তাঁহার শিষ্য (৫) সিদ্ধ-লিঙ্গস্বামী ২য়, তাঁহার শিষ্য (৬) গঙ্গাধরস্বামী ২য় ও তাঁহার শিষ্য বর্ত্তমান শিবলিঙ্গস্বামী। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় শিষ্যের সমাধিই মঠে রহিয়াছে। গুরুসিদপ্পাস্বামীর লিঙ্গৈকত্বের বাৎসরিক দিবসে রথোৎসব হইয়া থাকে। এই মঠে অনেকগুলি লিঙ্গায়ৎ সাধু আহার পান। লিঙ্গায়ৎদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাধির বিষয় অন্যত্রে বলা হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র-রেল কোম্পানির প্রধান লোকোমটিভ ওয়ার্ক শপ অর্থাৎ গাড়ী ও ইঞ্জিন প্রস্তুত করিবার কারখানা ও জংসন ষ্টেশন হইয়া

অবধি, অধিবাসীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে হুবলীর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। আমরা লোকোমটিভ ওয়ার্ক শপ সন্দর্শনপূর্ব্বক অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। ওয়ার্ক শপটী অতি বৃহৎ। তাহার একস্থানে সইং শপে অর্থাৎ কাষ্ঠচেরাই কারখানায় কাষ্ঠচেরাই হইতেছে। আর এক স্থানে ক্যারেজবিল্ডিং শপে অর্থাৎ গাড়ী তৈয়ারি করিবার কারখানায় গাড়ী নির্ম্মাণ হইতেছে। আর এক স্থানে ক্যারেজ রিপেয়ারিং শপে অর্থাৎ গাড়ী মেরামত করিবার কারখানায় গাড়ী মেরামত হইতেছে। টারলিং শপে অর্থাৎ লৌহ কোঁদাইয়ের কারখানায় লৌহ কোঁদাই হইতেছে। ইঞ্জিন ফিটিং শপে অর্থাৎ ইঞ্জিন সাজাইয়ের কারখানায় ইঞ্জিন জোড়া হইতেছে। ইঞ্জিন রিপেয়ারিং শপে পুরাণ ইঞ্জিনের সংস্কার হইতেছে। স্মিথ্ শপে অর্থাৎ কর্ম্মকার কারখানায় নানাপ্রকার লৌহ প্রস্তুত হইতেছে। ফোর্জিং শপে অর্থাৎ ঢালাইয়ের কারখানায় নানাপ্রকার পিত্তল ও লৌহের ঢালাই হইতেছে এবং পেণ্টিং শপে অর্থাৎ গাড়ীতে রং দেওয়ার কারখানায় গাড়িতে রং দেওয়া হইতেছে। লোকোমটিভ ওয়ার্ক শপ সন্দর্শন না করিলে, গাড়ি ও ইঞ্জিন প্রস্তুত করণ ব্যাপার বোধগম্য হওয়া দুরূহ।

এখানকার মিউনিসিপ্যাল বাজারটী নিতান্ত মন্দ নহে। তথায় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। দোকান গুলি বহুবিধ দ্রব্যাদিতে সুসজ্জিত রহিয়াছে। বাজার পৃথক্ থাকাতে, তথায় সর্ব্বপ্রকার ভূষা শস্য বিক্রয় হইয়া থাকে। মোট কথায় হুবলির বাজার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন; হুবলিতে লোকোমটিভ ওয়ার্ক শপ অর্থাৎ গাড়ী ও ইঞ্জিন প্রস্তুত করিবার কারখানা, স্পিনিং ফ্যাকটরি অর্থাৎ সূতা কাটাইয়ের কারখানা ও গুরুসিদপ্পা মঠ ভিন্ন অপর বিশেষ কিছু দেখিবার নাই।

....

গডক।

বিজাপুর হইতে প্রত্যাগমনের সময় আমরা গডকের প্রসিদ্ধ দেবালয় কয়েকটি সন্দর্শন করিলাম। গডক দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রদেশের ধার্ব্বারজেলার অন্তর্গত দক্ষিণ-মহারাষ্ট্র রেললাইনের হডগিগডক শাখা লাইনের জংসন ষ্টেশন। ইহা উত্তর ১৫।২৬ অক্ষরেখা ও পূর্ব্ব ৭৫।৪৩

দ্রাঘিমায় অবস্থিত। সহরের অধিবাসীর সংখ্যা ২০০০ হাজারের অধিক হইবে। এ অঞ্চলের বায়ু অতি শুষ্ক এবং অধিবাসীরা হৃষ্ট ও বলিষ্ঠ। এখানে কার্পাস অধিক মাত্রায় জন্মিয়া থাকে। গডক কার্পাসের একটি প্রধান গঞ্জ। ওয়েষ্ট প্যাটেণ্ট কোং, মেসার্স ফ্রাঙ্কি কোং ও মেসার্স রবার্টসন ব্রাদার্স কোম্পানিদিগের পৃথক্ কটন্ প্রেস্ অর্থাৎ তুলা পেষাইয়ের কারখানা থাকাতে, অধিক পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে।

এখানকার দেবালয়ে খোদিত ৯৭৩ হইতে ১৫৩৯ অব্দের অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। অতএব এই স্থান ৯৭৩ হইতে ১১১০অব্দ পর্য্যন্ত পশ্চিম চালুক্যরাজাদিগের অধীনে ছিল। তাঁহাদিগেরই কর্ত্তৃক ত্রিকুটেশ্বর ও বীর-নারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, পরে ঐ স্থান ক্রমান্বয়ে ১০৪৭—১৩১০ অব্দে হোয়শাল বেল্লালের, ১১৭০—১৩১০ দেবগিরির যাদব রাজাদিগের ও ১৩৩৬—১৫৮৭ বিজয়নগরের রাজা-দিগের অধিকারে আসিয়াছিল এবং ১৬৭৩ অব্দে ধার্ব্বা-রের অন্তর্গত বঙ্কাপুরের অধীনে ছিল। দম্বুলদুর্গ ইংরাজ কর্ত্তৃক ১৭৯৯ অব্দে অধিকৃত হইলে, বুন্দিয়া গডক পরি-ত্যাগ করিয়াছিল। ১৮১৪ অব্দের ৮ই জানুয়ারি জেনা-

রেল অর্থাৎ সেনাপতি মুন্‌রো মহারাষ্ট্রসমরে ইংরাজ-পক্ষ হইতে উহা অধিকার করেন। তদবধি উহা ব্রিটীশ-শাসনভুক্ত রহিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই ক্ষুদ্র সহরটী ১০ম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিল; ইহার পুরাতন নাম ক্রতুক। সরস্বতী ত্রিকুটেশ্বর, সোমেশ্বর ও বীরনারায়ণ এই চারিটীই এখানকার প্রধান মন্দির।

ত্রিকুটেশ্বর ও সরস্বতীদেবীর মন্দির নগরের মধ্য-স্থলে ও একই প্রাঙ্গণমধ্যে অবস্থিত। প্রাঙ্গণ নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। মধ্যস্থলে ত্রিকুটেশ্বর দেবের মন্দির ও তাহার দক্ষিণ দিকে অতি নিকটে সরস্বতী দেবীর মন্দির। ত্রিকূটেশ্বর মন্দিরে দুইটি বৃহৎ মণ্ডপ পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত ও প্রত্যেক মণ্ডপের শেষভাগে একটি করিয়া, গর্ভগৃহ; মণ্ডপদ্বয়ের সংলগ্নস্থলে উত্তর দিকে আর একটি গর্ভগৃহ। প্রধান গর্ভগৃহে একটি শালুঙ্ক বা পিণ্ডির উপর তিনটি লিঙ্গ রহিয়াছে এবং উহা হইতেই দেবতার নাম ত্রিকূটেশ্বর হইয়াছে। এই মন্দিরে প্রস্তরে অঙ্কিত ১০টী অনুশাসন দৃষ্ট হয়। তাহার ৭টীর তারিখ ১০০৩ হইতে ১৫৩৯ অব্দ। ৩টীর তারিখ এপর্য্যন্ত স্থির হয় নাই।

ধার্ব্বার ডিষ্ট্রীক্টে যত দেবালয় আছে, সরস্বতীদেবীর মন্দির ক্ষুদ্র হইলেও, ভাস্করকার্য্যের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

গর্ভগৃহের সম্মুখে একটি খোলা মণ্ডপ। মণ্ডপের প্রত্যেক স্তম্ভে নানাবিধ ভাস্করকার্য্য রহিয়াছে। গর্ভগৃহের দেবমূর্ত্তিটী প্রস্তরময়ী পূর্ণাকৃতি যোগাসনে উপবিষ্টা; পরিধানের বস্ত্র, মস্তকের শিরস্ত্রাণ, গলদেশের মাল্য ও সর্ব্বশরীরের আভরণ, সমস্ত প্রস্তর হইতেই কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে।

সোমেশ্বর দেবের মন্দিরে বিগ্রহ নাই; অধুনা, উহা স্কুল (বিদ্যালয়) বাটীতে পরিণত হইয়াছে। ধার্ব্বার জেলায় ভাস্করকার্য্যের যে কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, এই মন্দির তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। গর্ভগৃহ ও মণ্ডপ চতুষ্কোণাকৃতি; প্রাঙ্গণের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে একটি করিয়া দরজা আছে।

বীরনারায়ণস্বামীর মন্দির বাজারের মধ্যে অবস্থিত ও কৃষ্ণ হরনব্লেণ্ট নামক প্রস্তরবিশেষে নির্ম্মিত। ইহার প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারে শত ফুট উচ্চ বৃহৎ গোপুর; উহার উপরিভাগে দক্ষিণ দেশের ন্যায় নানাবিধ মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই দেবালয়ের স্তম্ভে খোদিত সাতটি অনুশাসন দৃষ্ট হয়। উহাদিগের মধ্যে চারিটির তারিখ ১০৩৭ হইতে ১৫৩৯ অব্দ পর্য্যন্ত ও অবশিষ্ট তিনটির তারিখ এপর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই। অনুশাসন দৃষ্টে এই

মন্দির ১০৩৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। মহিসুরের অন্তর্গত "শ্রাবণ-বেল্‌গলুতে" যে পুরাতন হস্তলিপি আছে, তাহার মতে ১১১৭ খৃষ্টাব্দে হয়-শালবল্লাল রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন কর্ত্তৃক নারায়ণস্বামীর যে পাঁচটি মন্দির নির্ম্মিত হয়, ইহা তাহাদিগের অন্যতম। অতএব বলিতে পারা যায়, বিষ্ণুবর্দ্ধন মন্দিরের সংস্কার করিয়া থাকিবেন মাত্র। ইনি জৈনমতাবলম্বী ছিলেন। পরে যেরূপে স্বমত ত্যাগ করিয়া, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হন, তাহা রামানুজাচার্য্যের জীবনীতে উল্লিখিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে গডকের নাম অতি অল্প লোকেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু গডক হিন্দু ভাস্করকার্য্যের সাক্ষীস্বরূপ। আমরা ইহার সামান্য বিবরণ প্রদান করিলাম। রেলে যাতায়াতের সুবিধা হওয়ায়, আজকাল অনেকেই দক্ষিণ দেশ পর্য্যটনে আসিয়া থাকেন। তাঁহারা মহারাষ্ট্র-দেশের হিন্দুর লুপ্ত কীর্ত্তির সাক্ষ্যস্বরূপ গডকের মন্দির সন্দর্শন করিতে যেন বিস্মৃত না হন।

এল্লুরের পথে।

আমরা বিশাখপত্তনে বলিয়াছি যে, বঙ্গদেশে মহা-শারদীয়া পূজায় ১২ দিবস অবকাশ; কিন্তু এপ্রদেশে একদিনমাত্র অফিস অর্থাৎ কার্য্যস্থান বন্ধ হয়। ষষ্ঠীতে অন্যত্রে যাইবার আদেশ আইসে। পূজার আয়োজন হইয়াছিল। অতএব উহা সমাপনান্তে দ্বাদশীর রাত্রে এল্লুর উদ্দেশে বিশাখপত্তন পরিত্যাগ করিলাম। এখান হইতে এল্লুরে গমন করিতে হইলে, কোষ্টীং ষ্টীমারে অর্থাৎ ঔপকূলিক বাষ্পীয় পোতে কাকনাডায় নামিয়া, গোদাবরীর খাল দিয়া, চামার্লকোটা হইয়া, ধবলেশ্বরে যাইতে হয়। অনন্তর তথায় গোদাবরী পার হইয়া, বিজয়েশ্বর এল্লুর কানাল (খাল) দিয়া, এল্লুর-লক সন্নি-ধানে নামিয়া নগরে আসিতে হয়। দ্বিতীয় পথ,—বিশাখপত্তন হইতে চামার্লকোটায় গো-যানে আসিয়া, পূর্ব্ববৎ কানাল (খাল) দিয়া যাইতে হয়। পূর্ব্ব-দক্ষিণ-বাহী মনসুননামক সামুদ্রিক বায়ুর আবির্ভাব সময়ে চোলমণ্ডল উপকূলে ভীষণ সামুদ্রিক উর্ম্মি উত্থিত হয়। এই বিশাখপত্তনের ঘাটে উর্ম্মির প্রকোপটা সর্ব্বদাই

অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। আমরা যে বাটীতে ছিলাম, তথা হইতে প্রতিদিন সাগরের উর্ম্মিমালা সন্দর্শন করিতাম। কোন সময়ে ষ্টীমার (বাষ্পীয় পোত) ঘাটে আসিয়া, উর্ম্মিমালার ভীষণ প্রকোপ দর্শন করিয়া, পতাকা দেখাইয়া গমন করিত। এই সমস্ত দেখিয়া, আমরা স্থলপথ অবলম্বনে শকটারোহণে চামার্লকোটা পর্য্যন্ত আগমন করিলাম। এপ্রদেশের প্রথানুসারে শকট রাত্রিতে চলিত। প্রতিদিন ২০ হইতে ২৪ মাইল অতিক্রম করিয়া, কোন ছত্রবাটীতে আহারাদি ও বিশ্রাম করিতাম। প্রথম দিন বিশাখপত্তন হইতে রাত্রি ১১টার সময় বহির্গমনপূর্ব্বক ২০ মাইল দূরে অনক্কপল্লীনামক ক্ষুদ্র সহরে আসিয়া; তথাকার সব-ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টের (নিম্নতম মাজিষ্ট্রেটের আদালতের) কোন উকিলের উদ্যান-বাটীতে বিশ্রাম করিলাম। এই নগরে একটি ক্ষুদ্র প্রাচীন দুর্গ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। দুর্গাধিপতি দস্যুর ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত ও কয়েকটি লোকহত্যা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া, সেসনের বিচারে দোষী প্রমাণিত ও তজ্জন্য প্রাণদণ্ডের আদেশ হওয়াতে, স্বদুর্গ সন্নিকটে ফাঁসিকাষ্ঠে নিহত হয়। তাহার সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে; এই ব্যাপার বহু-

দিবস পূর্ব্বে সংঘটিত হয়। নগরটী ক্ষুদ্র হইলেও, রাস্তার উভয় পার্শ্বের উপবন-শ্রেণীগুলি নিতান্ত মন্দ নহে; নানাবিধ শস্যের ব্যবসায় বিলক্ষণ চলিতেছে। গ্রামের পশ্চাৎ এক মাইল দূরে ইষ্টকোষ্ট অর্থাৎ পূর্ব্ব-উপকূলিক রেল যাইতেছে। তাহার একটি ষ্টেশন এখানে হইবে। এই স্থানে প্রাইমারি স্কুল (প্রথম শিক্ষার বিদ্যালয়) সব-মাজিষ্ট্রেট কোর্ট, পুলিস ষ্টেশন ও পোষ্ট অফিস আছে।

এখান হইতে ৫ মাইল পশ্চিমে কাশিমকোটানামে পুরাতন নগর। ইহা কাশিমকোটানামক জমিদারদিগের আবাসভূমি। অষ্টাবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের ক্ষমতা প্রবল ছিল; ইহারা অনেক সময়ে আপন আপন সেনা সামন্ত লইয়া, মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে ত্রুটি করিত না। কখন পরাজিত হইয়া জঙ্গলে আশ্রয় লইত, কখন বা সুযোগ পাইয়া রাজস্ব হরণ করিত। এপ্রদেশে ইংরাজ-শাসন হইয়া অবধি, ক্রমে পলিগারদিগের ক্ষমতা কমিয়া আইসে। তাঁহারাই এখন সনন্দ পাইয়া, জমিদাররূপে পরিণত হইয়াছেন এবং আপন জমিদারির আয়মাত্র উপলক্ষ করিয়া, বিলাসী ও চাটুকারে পরিবৃত হইয়া, সময় অতিবাহিত করিতেছেন। অনেকেই মাতৃভাষা

ভিন্ন অপর ভাষা শিক্ষা করেন না। আজকাল যে সকল নাবালক জমিদার কোর্ট অব ওয়ার্ডের (জমিদারী রক্ষার আদালতের) তত্ত্বাবধানে থাকিতেছেন, তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা পাইতেছেন। কাশিমকোটায় জমিদারদিগের প্রতিষ্ঠিত ছত্রশালায় অদ্যাপি শতাধিক ব্রাহ্মণ, বৈরাগী ও আগন্তুক প্রতিদিন আহার পাইয়া থাকেন। এইকারণে পথিকেরা কাশিমকোটায় আসিয়া বিশ্রাম করে। তথাকার রাস্তাগুলি অপরিষ্কার নহে। এখানেও ইষ্টকোষ্ট (পূর্ব্ব-উপকূলিক) রেলের একটি ষ্টেশন হইতেছে।

কাশিমকোটা হইতে ১১ মাইল দূরে এল্লমুঞ্চিলী আলিকোপ্পানিবাসী এপুলুরি গোরপ্পা পান্থুলুগারুর প্রতিষ্ঠিত ছত্রশালায় পঞ্চশতাধিক ব্রাহ্মণ ও বৈরাগী পথিক আহার পাইয়া থাকে। অতএব ইহাও একটি পান্থনিবাস। এখানেও ইষ্টকোষ্ট রেলের ষ্টেশন হইতেছে। আমরা এই উভয় স্থানে বিশ্রাম করি নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বে অনক্কপল্লী পরিত্যাগপূর্ব্বক তথা হইতে ২৪ মাইল দূরে নিক্কপল্লীতে পরদিবস ৮টার সময় উপস্থিত হইলাম। এই নগরটি অন্যতম গণ্ডগ্রাম হইলেও, এখানে ভীমুলিপত্তননিবাসী মুক্কমল্ল নরসিংহ-সেটীর প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ ছত্রবাটী রহিয়াছে। প্রতিষ্ঠাতা আগন্তুক

ব্রাহ্মণ ও বৈরাগীদিগকে অন্নদান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে বাৎসরিক দুই হাজার টাকার উপর ব্যয় করিতেন। এক্ষণে অবস্থান্তর ঘটিলেও, মাসিক শতাধিক টাকার অন্নদান করিয়া থাকেন।

গ্রামের পশ্চাদ্ভাগে বৃহৎ আবাদী পুষ্করিণী। তাহার অপর পারে উপ্‌মাকানামক গণ্ডগ্রামে ব্যেঙ্কটেশস্বামী, বেণুগোপালস্বামী ও ঈশ্বরস্বামীর মন্দির। বিশাখপত্তনে থাকিবার সময় ব্যেঙ্কটেশস্বামীর আবির্ভাববিবরণ কতকটা অবগত হইয়াছিলাম। স্বামীজীর সন্দর্শন অভিলাষে উপ্‌মাকায় গমনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলাম। এই গ্রাম রাজা গোদানারায়ণ গজপতি রাওর জমিদারির অন্তর্গত। এখানকার প্রধান কর্ম্মচারী আমাদিগের বিশ্রামাগার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া, দেবদর্শনের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

ব্যেঙ্কটেশস্বামীর আবির্ভাববিষয়ে একটি কিংবদন্তী আছে। গ্রামের পার্শ্বে পাহাড়ের গাত্রে বৃহৎ মন্দিরে স্বামীজী বিদ্যমান। স্বামীজীর আকার মনুষ্যের ন্যায়। উহা প্রস্তরে নির্ম্মিত ও চতুর্ভুজ এবং তিরুপতি স্বামীজীর অনুকরণে দণ্ডায়মান। ক্ষুদ্র পাহাড়টিকে বিন্ধ্যারণ্যশৃঙ্গ কহে। পুরাকালে উহার চতুর্দ্দিকে চারি মাইল

বিস্তৃত ভীষণ জঙ্গল ছিল। মধ্যে মধ্যে তিরুপতীশ্বর মৃগয়া উদ্দেশে ঐ স্থানে আসিতেন। শৃঙ্গের পূর্ব্বদিকে মানসসরসনামক হ্রদে সপ্তর্ষিরা স্নান করিয়া, নারায়ণের আরাধনা করিতেছিলেন। ব্যেঙ্কটেশ মৃগয়ায় আসিয়া, তাঁহাদিগের নিষ্ঠা দর্শনে সন্তুষ্ট ও দয়াপরবশ হইয়া, তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছিলেন। সপ্তর্ষিরাও তাঁহার সন্দর্শনলাভে সফলমনোরথ হইয়া, শৃঙ্গপার্শ্বে তদীয় স্বরূপমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন। কলির প্রারম্ভে গোপজাতীয় কোন ব্যক্তি প্রত্যহ দুগ্ধপ্রদানপূর্ব্বক স্বামী-জীর আরাধনা করিত। এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ তাহা দর্শন করিয়া, বাহুবলেন্দ্র নামে কোন রাজাকে ঐ সংবাদ প্রদান করিলে, তিনি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, পূজার বিশেষ সুবন্দোবস্ত ও আগ্রয়ণী ব্রাহ্মণ সংস্থাপন করিয়া দেন। পাণ্ডবেরা অরণ্যবাসকালে এখানে আসিয়া-ছিলেন বলিয়া, একটি কিংবদন্তী আছে। সে যাহা হউক, গোদানারায়ণ গজপতি রাওর পিতৃমাতুল এই মন্দিরের সংস্কার, বহিঃপ্রাকার নির্ম্মাণ ও দেবসেবার নিমিত্ত চারি হাজার টাকা আয়ের গ্রাম অর্পণ করেন। তিনি নিঃসন্তান থাকাতে, আপন ভাগিনেয় গজপতি রাওর পিতা ও এক্ষণে স্বয়ং গজপতি রাও সেবায়ৎ

হইয়াছেন। নিত্য সেবার বন্দোবস্ত নিতান্ত মন্দ নহে। পূজারি চারিজন, ভোগান্ন প্রস্তুত করিবার জন্য রসুইয়ে চারিজন, দ্রাবিড় বেদপাঠ করিবার নিমিত্ত দুই জন বৈদিক এবং যজুর্ব্বেদপাঠের জন্য ত্রৈলিঙ্গ দুইজন নিয়োজিত আছেন। প্রত্যহ ১॥০ মণ তণ্ডুলের অন্ন পাক ও তদ্দ্বারা ভোগ হইয়া থাকে। বেণুগোপাল-স্বামীর মন্দির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, নিত্য ভোগের কারণ পাঁচসের তণ্ডুল বরাদ্দ আছে। ঈশ্বরস্বামীর মন্দিরটি ক্ষুদ্র ; দুইসের তণ্ডুলের অন্নভোগ হইয়া থাকে।

আমরা বিশ্রামান্তে স্নানপূর্ব্বক নরুপল্লী আমিনের পুত্র নরসিংহ রায় পান্থ্লু-গারুর সমভিব্যাহারে বঙ্কট-স্বামীর সন্দর্শনে গমন করিয়া, যথারীতি বেদোক্ত মন্ত্রে দেবদেবীর অর্চ্চনা, তৎপরে বেণুগোপালস্বামীর সন্দর্শন ও অর্চ্চনা, তদনন্তর ঈশ্বরস্বামীর সন্দর্শন, অর্চ্চনা ও জলাভিষেকাদিপূর্ব্বক বিশ্রামাবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম এবং পূর্ব্ববৎ শকটারোহণে রাত্রিতে ২৪ মাইল অতিক্রম করিয়া, প্রাতে অন্নবরমে উপস্থিত হইয়া, ছত্র-বাটীতে বিশ্রাম করিলাম।

রাত্রিকালে পথিমধ্যে তুনিনামক গণ্ডগ্রামের পার্শ্ব দিয়া গমন করিয়াছিলাম। তথায় সুরপ্প-রাজু-গারুর

পুত্র বৎসবায়ুব্যেঙ্কট সিংহাদ্রী-রাজু-গারুর প্রতিষ্ঠিত ছত্র বাটীতে পঞ্চাশৎ ব্রাহ্মণ, বৈরাগী ও পথযাত্রী অন্ন পাইয় থাকেন। এখানে লোকাল্ ফণ্ড স্কুল অর্থাৎ স্থানীয় অর্থ সাহায্যে স্থাপিত বিদ্যালয়, পোষ্ট আফিস ও পুলিশ ষ্টেশনাদি আছে। পূর্ব্ব-উপকূলিক রেলের একটি ষ্টেসনও হইতেছে; ইহার পার্শ্ব দিয়া একটি নদী প্রবাহিত হইয়া থাকে। উক্ত নদী বিশাখপত্তন ও গোদাবরীর সীমাস্বরূপ। নদীর উপর সেতু পার হইয়া, তুনিতে আসিতে হয়। অতএব তুনি গোদাবরী জেলার অন্তর্গত। কল্লমপুডিনিবাসী ব্যেঙ্কট-নরসিংহ-রায়-গারু দ্বাবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে অন্নছত্র স্থাপন করিয়া, অন্নবরম নামে প্রতিষ্ঠা করেন; তাহা হইতেই গ্রামের নাম হইয়াছে। ছত্রবাটী গ্রামের পার্শ্বে ও ক্ষুদ্র নদীর তীরে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠাতা সর্ব্ববর্ণের পথযাত্রীকে অন্ন দান করেন। প্রায় দেড়শত ব্যক্তি নিত্য অন্ন পাইয়া থাকে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বপাক খাইতে অভিলাষী, তাঁহারা অপর বর্ণের যাত্রীর স্থায় বৈরাগী সাধুর সিধা লইয়া থাকেন। সাধারণ লোককে অর্দ্ধসের তণ্ডুল, দাল অর্দ্ধপোয়া, তক্র, তেতুল, ঘৃত, তৈল, জ্বালানি কাষ্ঠ, তরকারি ও মস্লাদি এবং দুগ্ধপোষ্য বালককে দুগ্ধও দেওয়া হয়। বৈরাগি-

দিগকে একসের পরিমিত তণ্ডুল ও পূর্ব্ববৎ অপর দ্রব্য, তামাক, গাঁজা ও আফিং প্রদত্ত হইয়া থাকে। অনেক স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ পক্কান্ন খাইয়া থাকেন বলিয়া, রসুইয়ের বন্দোবস্ত আছে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরা গাড়ী হইতে আপন আপন সামগ্রী নামাইয়া, নির্দ্দিষ্ট ঘরে যাইয়া, বিশ্রামানন্তর তৈল লইয়া, নদীতে স্নান করিয়া, হয় পক্কান্ন আহার করেন, নচেৎ সিধা লইয়া, নিজে পাক করিয়া থাকেন; পরে সুখে নিদ্রা যান। ইচ্ছা করিলে, তিনবেলা আহার পাইতে পারেন; কিন্তু যাত্রীরা সাধারণতঃ প্রাতে ও অপরাহ্নে আহারপূর্ব্বক রাত্রিকালে গন্তব্যোদ্দেশে প্রস্থান করিয়া থাকেন।

আমরা তথায় কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়াছিলাম বটে; কিন্তু সিধা লই নাই। আগন্তুক মাত্রকেই হৃষ্টমনে বিশ্রাম ও আহারাদি করিয়া, প্রতিষ্ঠাতা ও তৎপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে দেখিলাম। প্রতিষ্ঠাতা জমিদার, নিবাস অন্নবরম হইতে ২০ মাইল। এদিকে কল্লমপুড়ি নামক গণ্ডগ্রাম। সেখানে একটি অন্নছত্র দিয়াছেন। তাঁহার জমিদারির আয় ৭০ সত্তর হাজার টাকার অধিক। সদর খাজনা ৫ পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে। প্রতিষ্ঠাতা ১০ বৎসর হইল, মানবলীলা সংবরণ

করিয়াছেন। পুত্র নাবালক বলিয়া, তদীয় বিধবা পত্নী দক্ষতার সহিত জমিদারি শাসন করিতেছেন। অন্নবরম ছত্রের সুবন্দোবস্ত দেখিয়া, বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। এখানে পূর্ব্ব-উপকূলিক রেলের একটি ষ্টেশন খুলিলে, সকল যাত্রীর বড়ই সুবিধা হইত।

যথা সময়ে অপরাহ্নে শকটারোহণে, চামার্লকোটা উদ্দেশে বহির্গত হইয়া, প্রাতঃকালে পিঠপুরম্ নামে ক্ষুদ্র সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থান গোদাবরীর পুণ্যতীর্থের অন্তর্গত। একটি ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। উহা পাতগয়া বা পদগয়া নামে প্রসিদ্ধ (১)। প্রবাদ আছে, কোন সিদ্ধ পুরুষ গয়াতে দেবপূজার্থ পুষ্প অর্পণ করিলে, তাহা এই সরোবরে আসিয়া উপস্থিত হয়; সেই অবধি সাধারণ লোকের বিশ্বাস, ইহা দ্বিতীয় গয়া সদৃশ পুণ্যতীর্থ, পিতৃ উদ্দেশে সেই তীর্থে স্নানপূর্ব্বক তর্পণ করিয়া, পিণ্ডপ্রদান করিলে, গয়াসদৃশ ফলপ্রাপ্তি হইবে। অনেকেই এই প্রদেশে উক্ত স্থানে আসিয়া, তর্পণ ও পিণ্ডাদি প্রদানে গয়াফলপ্রাপ্তি ভাবিয়া, আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন। পিঠা-

(১) পাত তৈলিঙ্গ অর্থে পুরাতন এবং পাদ শব্দের অর্থ অংশ। অতএব উহার অর্থ পুরাতন গয়া বা অংশ গয়া।

পুরের জমিদারেরা পূর্ব্বে বর্দ্ধিষ্ঠ পলিগার ছিলেন; সময়ে সময়ে রাজোপাধিও গ্রহণ করিতেন; মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অনেকবার অস্ত্রধারণও করিয়াছিলেন; কালের পরিবর্ত্তনে অন্যান্য পলিগারদিগের ন্যায় জমিদাররূপে পরিণত হইয়াছেন। সম্প্রতি মূল জমিদার মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি অপুত্রকাবস্থায় একটি দত্তক গ্রহণ করেন, পরে পুত্র জন্মে। নাবালক পুত্র ষষ্ঠ-বর্ষ বয়ঃক্রমে পিতৃহীন হইলে, তদীয় জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডে আসিয়াছে। দত্তকের পক্ষ হইতে নাবালক পুত্র ঔরসজাত নহে অর্থাৎ ভূতপূর্ব্ব রাজা পুরুষত্ববিহীন ছিলেন বলিয়া আবেদন হইয়াছে। সিভিলস্যুট অর্থাৎ দেওয়ানি মোকদ্দমা চলিতেছে। উভয় পক্ষ যথেষ্ট টাকার শ্রাদ্ধ করিতেছেন। পরে কিরূপ নিষ্পত্তি হয়, বলা যায় না। চামার্লকোটা এই জমিদারির অন্তর্ভুক্ত এবং কাকনাড়া হইতে ৯ মাইল দূরে খালের ধারে অবস্থিত। পূর্ব্বে এখানে সেনানিবাস ছিল, এখন আর এখানে সেনা থাকে না, কিন্তু সেনানিবাসের গৃহাদি সমস্তই রহিয়াছে। উহা গ্রাম হইতে দুই মাইল দূর হইবে। আমরা পিঠাপুরের পূর্ব্বোক্ত জমিদারদিগের চামার্ল-কোটায় যে বিশ্রামাগার আছে, তাহাতে বিশ্রাম করি-

বার মানস করিয়া, তথায় আসিয়া চাবিবন্ধ দেখিয়া এবং সাধারণ ছত্রশালা পূর্ব্বোক্ত সেনানিবাসের নিকট ও খাল হইতে দুই মাইল দূর বলিয়া, তথায় প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া, খালের পরপারে অর্দ্ধ মাইল দূরে কুমারারামে (কুমার-গুহপ্রতিষ্ঠিত) ভীমেশ্বরদেবের মন্দিরে গমনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলাম। এইরূপ কিংবদন্তী আছে, পুরাকালে কুমারস্বামী এই স্থলে উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়া, ভীমেশ্বর নামে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। অতএব ইহাও গোদাবরীর অন্তর্গত একটি পুণ্যতীর্থ। দেবালয়টি অতি বৃহৎ, উহার পূর্ব্বদিকে একটি বাঁধান পুষ্করিণী, চতুর্দ্দিকে বহুদূর ব্যাপিয়া নারিকেল উদ্যান, নিকটে বৈদিক ব্রাহ্মণনিবাস দেখিলাম না। পূজারি চামার্লকোটার পারে থাকেন। প্রত্যহ কুমারারামে আসিয়া, দেবের অভিষেক ও পূজাদি করিয়া যান। দেবালয়টি পুরাতন, বহুদিন সংস্কার না হওয়াতে, স্থানে স্থানে বসিয়া ফাটিয়া গিয়াছে। বহিঃপ্রাঙ্গণের প্রাচীরের কোন কোন অংশ ভূমিসাৎও হইয়াছে। প্রাকারস্তম্ভে অনেকগুলি অনুশাসন তেলুগু অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। একটির তারিখ ১৩৫৬শকের আনন্দ-সম্বৎসরে উত্তরায়ণ মকরসংক্রান্তি পুষ্যা-বহুলা ত্রয়োদশী। অপরটি ১৪১৬ শকের আনন্দ-সম্বৎসরে

মকরসংক্রান্তিতে পুষ্যা-বহুলা দশমীতে প্রদত্ত। আর কয়েকটি পড়িতে পারিলাম না। যাহা হউক, দেবালয়টী অন্ততঃ ৫০০ পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে।

লিঙ্গের আকার বৃহৎ ও উচ্চ, দ্বিতল ভেদ করিয়া, দুই ফুট উচ্চে বিদ্যমান। অভিষেকের সুবিধার জন্য, মন্দির দ্বিতলরূপে নির্ম্মিত। অর্চ্চক দ্বিতলে থাকিয়া, অভিষেক ও পূজা করিয়া থাকেন। আমরা ঈশ্বর-সন্দর্শনে গমন করিয়া, পূজারি দ্বারা বেদোক্ত বিধানে যথারীতি অভিষেক ও পূজা করাইয়াছিলাম। অপরাহ্ণে খালে আসিয়া, রাহাদারি বোট ভাড়া লইয়া, ধবলেশ্বর-নামক স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। কয়েক দিবস শকটে নিদ্রা হয় নাই। অদ্য বোটে উত্তমরূপ নিদ্রা হইয়াছিল। ৩০এ অক্টোবর ১০টার সময় ধবলেশ্বরে উপস্থিত হইয়া, খাল ঘাটের সন্নিকটে লোক্যাল ফণ্ড অর্থাৎ স্থানীয় অর্থে প্রতিষ্ঠিত ছত্রবাটীতে আশ্রয় লইলাম। এই ছত্রবাটীটী অতি পরিষ্কৃত, উহাতে দেশীয় প্রথানুসারে ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয় ও সৎশূদ্রের জন্য পৃথক পৃথক ঘর নির্দ্দিষ্ট আছে। ঘরগুলিতে উত্তমরূপ বায়ু প্রবেশ করিয়া থাকে। উহার সম্মুখে বারাণ্ডা

এবং পশ্চাদ্ভাগে পৃথক পৃথক রসুই ঘর; রন্ধনার্থ বাসনাদিও প্রদত্ত হয়। বিশ্রামান্তে আহারাদি করিয়া, কোন বন্ধুর প্রেরিত ডগকার্ট * অর্থাৎ কুক্কুরযান আরোহণে রাজা-মহেন্দী (রাজমহেন্দ্রী) নগর সন্দর্শনে গমন করি। উহা এখান হইতে ৬ মাইল উত্তরে ও গোদাবরীর বামতীরে অবস্থিত, এবং উহা গোদাবরীজেলার রাজধানী, সমুদ্র হইতে ৩০ মাইল দূরে, উত্তর ১৭।০।• অক্ষরেখা ও পূর্ব্ব ৮১।৪৮।৩০ দ্রাঘিমা। ১৮৮১ সালের লোকসংখ্যার তালিকায় উহাতে ২৪৫৫৫ লোকের অধিবাস স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহা জেলার রাজধানী হইলেও, জেলার মাজিষ্ট্রেট কাকনাডায় থাকেন। এখানে সব-কালেক্টর, ডিষ্ট্রীক্ট জজ, ডিষ্ট্রীক্ট মুনসেফ, সব-মাজিষ্ট্রেট, তহসিলদার, দুইটী খ্রীষ্ট-ভজনালয়, সাধারণ উদ্যান, যাদুঘর, কলেজবাটী, হাইস্কুল, সেণ্ট্রেল জেল, ডিষ্ট্রীক্ট জেল, পুলিশ ষ্টেশন, ইংরাজদিগের বিশ্রামাগার, দেশীয়দিগের ছত্রবাটী, সমস্তই আছে।

---

* দুই বা চারি চাকার গাড়ীবিশেষ। এক ঘোড়ায় টানিয়া থাকে। সচরাচর কুক্কুর সঙ্গে করিয়া, ইহাতে চাপিয়া উদ্যানাদিতে ভ্রমণ করা হয়॥ কুক্কুরের বসিবার জন্য ইহাতে স্বতন্ত্র স্থানও আছে। এইজন্য ইহার নাম ডগকার্ট বা কুক্কুরযান।

ইনস্‌পেটনামক সহরতলিতে ইংরাজেরা থাকেন। সহরটী নিতান্ত অপরিষ্কার নহে। কলেজবাটী অতি পরিষ্কৃত। নগোজীরাও পান্থুলুগারুমহাশয় অতি যত্ন করিয়া, আমাদিগকে কলেজ ও হাইস্কুল দেখাইয়াছিলেন, আমরা তাঁহার অমায়িকতায় সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলাম।

এক সময়ে রাজমহেন্দ্রী কলিঙ্গ-রাজ্যের রাজধানী ছিল; রাজমহেন্দ্রনামে কোন রাজা ইহার প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারই প্রদত্ত নাম রাজমহেন্দ্রবরম্‌। বরম অর্থাৎ তামিলভাষায় পুরম্‌। অতএব প্রতিষ্ঠাতা পূর্ব্ব-চালুক্য-বংশীয় রাজা হইবেন। কিন্তু অনেকে কহেন, পুরীর গঙ্গাবংশীয় রাজারা ইহার প্রতিষ্ঠাতা। খৃঃ ৬৩০—৬৪৫ মধ্যে কোন সময়ে জগদ্‌বিশ্রুত চীনপরিব্রাজক হিয়াং-সিয়াংএর ভারত-পরিভ্রমণকালে ইহা কলিঙ্গদেশের রাজধানী ছিল।

১১৩২ খৃষ্টাব্দে হনুমৎকোণ্ডার অন্ধ্‌রাজ-ভ্রাতা কাকতিয়া চারগঙ্গা উড়িষ্যা পর্য্যন্ত জয় করিয়া, তথায় গঙ্গাবংশীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার নাম পুরীতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। যখন গঙ্গাবংশীয় প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং হিয়াংসিয়াংএর ৪৮৭ সম্বৎসর পরের লোক হইলেন, তখন গঙ্গাবংশীয় রাজারা কি প্রকারে রাজ-

মহেন্দ্রীর প্রতিষ্ঠাতা হইতে পারেন? যাহা হউক, গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের সময়ে রাজমহেন্দ্রীর অনেক উন্নতি হইয়াছিল; উহা তাঁহাদিগের পশ্চিম রাজধানী ছিল।

১৪৭১ খৃঃ গুল্‌বার্গের মহম্মদ দ্বিতীয় ব্রাহ্মণী রাজমহেন্দ্রী স্বরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। ১৫১২ খৃঃ হাম্পির অন্তর্গত বিজয়নগরের নরপতিবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণরয়ালু উহা অধিকারপূর্ব্বক উড়িষ্যার গজপতি রাজাকে প্রদান করেন। তদনন্তর ষষ্টিতম বৎসর মাত্র উহা হিন্দুশাসনে ছিল। ১৫৭২ খৃঃ এব্রাহিম কুতবসাহ উহা স্বরাজ্যভুক্ত করিয়াছিল; কুতবসাহি-বংশ ধ্বংস হইলে, উহা নিজামরাজ্যাভিভুক্ত হয়। ১৭৫৩ খৃঃ নিজাম কর্ত্তৃক রাজমহেন্দ্রীর শাসনভার ফরাসিদিগের হস্তে প্রদত্ত হইলে, বুসী সাহেব ১৭৫৪ হইতে ১৭৫৭ খৃঃ পর্য্যন্ত উহা শাসন করিয়াছিলেন। কোন বিশেষ কারণ বশতঃ বুসী সাহেব হাইদ্রাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ইংরাজ-সেনানায়ক ফোর্ড সাহেব বিশাখপত্তনের অন্তর্গত বিজয়নগরের রাজার সাহায্যে উক্ত বিশাখপত্তন হইতে দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া, ১৭৫৮ খৃঃ রাজমহেন্দ্রী ও মসৃলিপত্তন বন্দর অধিকার করেন। তৎকালে নিজামের সহিত যে সন্ধি হয়, তাহাতে উহা ইংরাজ-শাসনভুক্ত হইয়াছিল। তদবধি

রাজমহেন্দ্রীর ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। উহাতে হিন্দু-দিগের পূর্ব্বকীর্ত্তির নিদর্শন পুরাতন দুর্গের প্রাচীরমাত্র দৃষ্ট হয়; অপর নিদর্শন বিশেষ কিছু নাই।

গোদাবরী জেলার মধ্যে যে কয়েকটি হিন্দু-তীর্থ আছে, তাহার মধ্যে পাতগয়া, ভীমেশ্বর, কোটিলিঙ্গ, কোটিফলী, দ্রাক্ষারামা ও ভদ্রাচল প্রধান।

পিঠাপুরে পাতগয়া ও কুমারারামে ভীমেশ্বরস্বামীর কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কোটিলিঙ্গ রাজমহেন্দ্রীর অনতিদূরে গোদাবরীতীরে অবস্থিত। ঐ স্থলে ভূগর্ভস্থ পাহাড় গোদাবরীর ভিতর পর্য্যন্ত গিয়াছে। কিংবদন্তী আছে, রাজমহেন্দ্রীকে বারাণসীসদৃশ পুণ্যভূমি করিবার অভিপ্রায়ে হিন্দু রাজা কোটি লিঙ্গ স্থাপনের কল্পনায়, উক্ত স্থানের পর্ব্বতমালায় লিঙ্গ কাটাইয়া, প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিলে, দেবতারা এই বিষয় অবগত হইয়া, রাজার উদ্দেশ্য বিফল করিবার জন্যই কৌশল করিয়া, ছদ্মবেশে একটি লিঙ্গ অপহরণ করেন। রাজা অথবা বৈদিক ব্রাহ্মণেরা তাহা না জানিয়া, প্রাণ-প্রতিষ্ঠাকার্য্য শেষ করিয়াছিলেন। লিঙ্গ অপহৃত হওয়াতে, উহা কাশীসদৃশ পুণ্যভূমি হইল না। কলির মাহাত্ম্যে ক্রমে ক্রমে লিঙ্গগুলি গোদাবরী গর্ভে অন্তর্হিত

হইয়াছে। এখন একটিমাত্র লিঙ্গ ক্ষুদ্র মন্দিরে থাকিয়া, পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরূক করিয়া দিবারই জন্য যেন কোটি লিঙ্গ নামে বিশ্রুত হইতেছেন।

গোদাবরীর প্রকৃত নাম গৌতমী। উহাতে স্নান করিলে, (গাং স্বর্গং দদাতীতি গোদা তাসু বরী শ্রেষ্ঠা) স্বর্গ প্রাপ্ত হয় বলিয়া, গোদাবরী নাম হইয়াছে। লোকে রাজমহেন্দ্রীতে আসিলে, গোদাবরীতে স্নান করিয়া, দেবাদিদেব কোটিলিঙ্গরূপী মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

রাজমহেন্দ্রী হইতে ন্যূনাধিক ৬০মাইল উত্তর গৌতমী-তীরে প্রসিদ্ধ ভদ্রাচল পুণ্যক্ষেত্রে রামস্বামীর বিশ্রুত বৃহৎ মন্দির। কোন সিদ্ধ কর্ত্তৃক উহা স্থাপিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ যৎকালে রাজমহেন্দ্রী কলিঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, তখন উহা প্রতিষ্ঠিত এবং ৪ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে উড়িষ্যার গজপতি রাজাদিগের সময়ে উহা সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকিবে। মূল মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; তাহার চতুর্দ্দিকে প্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর। গৌতমীতীর হইতে মন্দিরে প্রবেশের জন্য প্রস্তরনির্ম্মিত সিঁড়ি আছে। কিংবদন্তী, ভগবান্ রামচন্দ্র বনবাসকালে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে বনে

পরিভ্রমণ করিয়া, ভদ্রাচলে পুণ্যতোয়া গোদাবরী প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া ও তত্রত্য প্রাকৃতিক মনোহর দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া, তথায় পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া, কিয়ৎকাল অতিবাহিত করেন। এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের আগমন-স্মৃতির স্বরূপ, পূজারিরা আগন্তুক দর্শকগণকে একটী ক্ষুদ্র পর্ণশালা দর্শাইয়া থাকেন। পূর্ব্বে ভদ্রাচল নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ভদ্রাচলের পর্ব্বতময় প্রদেশে ও জঙ্গলে দস্যুরা আশ্রয় লইয়া, সময়ে সময়ে ইংরাজ-রাজ্যের নিকটস্থ গ্রামগুলি লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিত; পুলিশ তাহাদিগের কিছুই করিতে পারিত না। ইংরাজেরা এই দস্যুবৃত্তি শান্তি করিবার উদ্দেশে উহার শাসনভার আপন হস্তে লইয়াছেন। নিজামরাজ অদ্যাপি স্বামীজির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ১৩০০ শত টাকা প্রদান করিয়া থাকেন। আর একটি প্রবাদ আছে, তাহাও এই স্থলে প্রদত্ত হইল। গোলকন্দার কুতবশাহি শেষ বাদসাহ আবদুল হোসেনের হিন্দু সচিব মদন পান্থুলুর ভ্রাতুষ্পুত্র গোপন্নপান্থুলু, কমামপেটের পেষকারের পদে নিযুক্ত হইয়া, তহসিলের টাকা মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়া, ভদ্রাচলের মন্দিরের সংস্কার ও বৃদ্ধি করত, কয়েক লক্ষ টাকা তছরূপ এবং আপনি রামভক্ত রামদাস নাম গ্রহণ

করেন। বাদসাহ সেই সংবাদ পাইয়া, গোপ্পন্‌-পাম্বুলুকে গোলকন্দায় আসিয়া, খাজনার হিসাব দিতে কহেন। হিসাবে টাকা বাকী হইলে, গোপ্পন্‌ রামদাস কারাবদ্ধ হন এবং কারাযন্ত্রণা অসহ্য মনে করিয়া, ভগবান রামের প্রতি আত্মমনসমর্পণপূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে রাম তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া, দুই জন অশ্বারোহী কর্ত্তৃক সেই তহুরূপের টাকা আবদুল হোসেনের অন্তঃপুরে অর্দ্ধ নিশিতে পাঠাইয়া দেন। আবদুল হোসেন স্বগৃহে মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণপর্য্যঙ্কে নিদ্রা যাইতেছিলেন। অশ্বারোহিদ্বয় গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, মেজ্জের উপর টাকা ঢালিয়া, রামদাসের মুক্তির আজ্ঞাপত্র দাবি করিলে, বাদসাহ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, অনুজ্ঞাপত্র লিখিবার উদ্দেশে নিদ্রিতাবস্থায় উত্থান করিয়া, কাগজ কলমাদি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহিদ্বয় এই অবসরে নিমেষমধ্যেই গৃহাভ্যন্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। বাদসাহও নিদ্রার আবেগে তাহা স্বপ্নমাত্র ভাবিয়া, স্বশয্যায় পূর্ব্ববৎ নিদ্রিত হইলেন। প্রাতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অকস্মাৎ গৃহমধ্যে মুদ্রারাশি সন্দর্শন করিয়া, পূর্ব্বস্মৃতির উদ্রেক হইলে, মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া, রাত্রির অলৌকিক ব্যাপার বিবৃত

করিলেন। তখন তাহারা টাকা গণিয়া দেখিল, রামদাসগোপ্পন যত টাকা তছরুপাত করিয়াছিলেন, তত টাকা মাত্র মজুত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে আবদুল হোসেন বাদসাহ উহা ভগবান রামেরই কীর্ত্তি ভাবিয়া, রামদাসকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিয়া, মন্দিরের নিত্য ব্যয় জন্য কয়েকখানি গ্রাম অর্পণ করেন। অদ্যাপি ঐ সকল গ্রাম দেবস্ব হইয়া রহিয়াছে। এই প্রবাদ সত্য হইলে, দুই শত চারি বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়া থাকিবে।

নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত নিজাম গরাণ্টিড অর্থাৎ নিজামের প্রতিভূত্বে প্রতিষ্ঠিত ষ্টেট রেলওয়ের যে শাখা লাইন দোর্ণাকল ষ্টেসন হইতে শৃঙ্গরেণির কোল মাইন অর্থাৎ কয়লার খনি হইয়া, এল্লন্দুতে গিয়াছে, তথা হইতে ভদ্রাচল ৪৫ মাইল মাত্র। নিজাম-পবলিক ওয়ার্কস অর্থাৎ সাধারণ কার্য্যবিভাগ কর্ত্তৃক এল্লন্দু হইতে ভদ্রাচল পর্য্যন্ত একটি নূতন বর্ত্ম প্রস্তুত হইয়াছে। এ প্রদেশের প্রথানুসারে গরুর গাড়ীতে উহা অতিক্রম করিতে হয়। চৈত্রমাসে শুক্ল প্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত এখানে উৎসব হইয়া থাকে। তৎকালে বহু বৈষ্ণব ও যাত্রী উহা সন্দর্শন করিবার অভিলাষে ভদ্রাচলে উপস্থিত হয়। ভদ্রাচলে অনেকগুলি শ্রীবৈষ্ণব

ব্রাহ্মণদিগের বাস। তাঁহাদিগের অনেকেই দেবালয়ের বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া দিনাতিপাত করিতেছে।

কোটীফলী।—গোদাবরীর অপর নাম গৌতমী, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। গৌতমী ধবলেশ্বরের নিকট ত্রিবেণীতে বিভক্ত এবং গোদাবরী ও বশিষ্ঠা নামে বিশ্রুত হইয়া, বঙ্গোপসাগরাভিমুখে গমন করিয়াছে। গৌতমীর মুখে করিঙ্গ বন্দর। রাজমহেন্দ্রীর ও করিঙ্গর মধ্যস্থলে, গৌতমীর বাম তীরে কোটীফলী নামে প্রসিদ্ধ তীর্থ। ধবলেশ্বর হইতে খালের রাহাদারি বোটে তথায় গমন করা যায়। ঐখানে গৌতমীতে স্নান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে, কোটিগুণ ফললাভ হয়। এমন কি, তথায় স্নান করিলে, মহাপাতকের মহাপাতক, বিমাতৃগমন-পাতকও অপহৃত হয়। এই কারণেই কোটীফলীর অপর নাম মাতৃগমনোপহারী। প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরে বৃহস্পতি সিংহরাশিতে গমন করিলে, গৌতমীতীরে কোটীফলীতে পুষ্করযোগ হইয়া থাকে। তৎকালে কোটীফলীর সম্মুখে গৌতমীতে স্নান করিলে, ভারতখণ্ডস্থ সর্ব্বতীর্থস্নানের ফললাভ হইবে। ঐ সময়ে দেবতারাও গৌতমীতে স্নান করিতে ভুলেন না। এতৎসম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে, যথা ;—

রেবাতীরে তপঃ কুর্য্যাৎ মরণং জাহ্নবীতটে।
দানং দদ্যাৎ কুরুক্ষেত্রে গৌতম্যাং ত্রিতয়ং বরম্ ॥

এখান হইতে ৭ মাইল দূরে পূর্ব্বদিকে সুবিখ্যাত দ্রাক্ষরামা স্মার্ততীর্থ। অত্রত্য দেবালয় অতি বৃহৎ, লিঙ্গ অতি উচ্চ, ভীমেশ্বরের মত মন্দির দ্বিতল; লিঙ্গ দ্বিতল ভেদ করিয়া, প্রায় দুই ফুট উচ্চ হইবে। পূজারি দ্বিতলে থাকিয়া, জলাভিষেকাদি করিয়া থাকেন। এখানেও স্মার্ত্তেরা আগমন করিয়া দেবসন্দর্শনাদি করেন।

আনিকট।—১৮৩২ খৃঃ তেলগু নন্দন বর্ষে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হওয়াতে, গোদাবরী ও কৃষ্ণা প্রভৃতি জেলায় বহুসংখ্যক প্রজা অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং কোম্পানি বাহাদুরেরও ২০ লক্ষের উপর রাজস্ব নষ্ট হইয়াছিল। এইরূপ অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষশান্তির উপায়োদ্দেশে ধবলেশ্বরের সম্মুখে গোদাবরীতে আনি-কট নির্ম্মাণ ও তাহার মুখ হইতে উভয় তীরে খাল খনন করাইয়া, অধুনা গোদাবরী-ডেল্‌টা অর্থাৎ গোদা-বরীর বদ্বীপ আবাদ করা হইতেছে। এখন উহাতে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া থাকে। উদ্‌বৃত্ত ধান্য মান্দ্রাজাভিমুখে প্রেরিত হয়। আনিকট হইবার পূর্ব্বে ধবলেশ্বর একটি ক্ষুদ্র গ্রামমাত্র ছিল। আনিকট নির্ম্মাণ

জন্য বহুলোক আসিয়া, এই স্থানে বাস করিতেছে। এখানে কানাল-ওয়ার্ক-শপ অর্থাৎ খালের কারখানা-গৃহ স্থাপিত হওয়াতে, সহস্রাধিক লোক তাহাতে প্রতি-পালিত হইতেছে। খালের ধারে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জি-নিয়ার ও একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার বাস করিতেছেন। লকের অর্থাৎ কপাটেকলের নিকট হইতে গোদাবরীর ও কানালব্যাঙ্কের অর্থাৎ খালধারের দৃশ্য অতি মনো-হর। ধবলেশ্বর এখন নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, বহু-প্রজাবিশিষ্ট ক্ষুদ্র সহরে পরিণত হইয়াছে। বাজারের আয়তন নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। নানাবিধ পণ্যদ্রব্যে পণ্যা-বাসশ্রেণি শোভিত রহিয়াছে।

ছত্রবাটীতে রাত্রি যাপন করিয়া, পরদিন প্রত্যূষে এখানকার বাজার, বন্দরঘাট, ওয়ার্ক-শপ (কারখানা-গৃহ) ও লক (কটাপেকল) সন্দর্শনপূর্ব্বক আহারান্তে বন্দরঘাটে আসিয়া, রাহাদারি বোটের একাংশ লইয়া, এল্লুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। গোদাবরীর দক্ষিণ তীরে আনিকটের মুখে লক্ দিয়া, বিজয়েশ্বর এল্লুর হাই লেবেল কানালে অর্থাৎ উচ্চ সমতলিক খালে পড়িয়া, পর দিবস ৯টার সময় এল্লুরের লকের নিকট বোট হইতে উত্তরণ করিয়া, কোন বন্ধুর সাহায্যে

শকটযানে পাবারপেটায় আসিয়া, আবাসগৃহ লইয়াছিলাম।

এল্লুর অতি পুরাতন নগর। পুরাকালে হিন্দু বেঙ্গীরাজ্যের পলিটিকেল বা রাজনৈতিক রাজধানী ছিল। ইহার অপর নাম এলুরু (এলু—শাসন, উরু—নগর)। এখান হইতে ৮ মাইল দূরে পুরাতন বেঙ্গীতে চালুক্য রাজাদিগের অধিকারসময়ে বৌদ্ধদিগের অনেকগুলি মঠে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী থাকিত। লোক-বিশ্রুত চীন-পরিব্রাজক হিয়াংসিয়াং ৬৩০—৬৪৫ খৃঃ মধ্যে কোন সময়ে উহা সন্দর্শন করিয়াছিলেন। কালের বশে তথায় বৌদ্ধদিগের সে সকল মঠও নাই; আর সে রাজাদিগের প্রাসাদও নাই। চারি দিক মরুভূমি হইয়া রহিয়াছে। ৪।৫ মাইল দীর্ঘ প্রস্থে পুরাতন সৌধের ভিত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্ষাবসানে কখন কখন পুরাতন তাম্রমুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এল্লুরে মুসলমান শাসনাধীনে বেঙ্গীর ইমারতের প্রস্তর এল্লুরের দুর্গনির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

এখান হইতে পশ্চিম উত্তর ১০ মাইল দূরে একটী ক্ষুদ্র নদী উৎপন্ন হইয়াছে। কিংবদন্তী, শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে, উক্ত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, সীতাদেবী পথ-

শ্রমে পিপাসার্ত্ত হইয়া, জল যাচ্ঞা করিয়াছিলেন; লক্ষ্মণ বাণ দ্বারা পর্ব্বত বিদীর্ণ ও জলধারা নির্গত করিয়া, তদীয় পিপাসা নিবারণার্থ প্রদান করেন। ঐ ধারাই ক্রমে প্রবল হইয়া, তম্বিলেরু নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। (তম্বি—তামিল—ভ্রাতা, এরু—নদী অর্থাৎ ভ্রাতৃকৃত নদী)। তথায় অবস্থিতির সময়ে শ্রীরামচন্দ্র একটী লিঙ্গ স্থাপন করেন। তাহা অদ্যাপি রামলিঙ্গস্বামী নামে বিশ্রুত হইতেছে। শিবরাত্রির ৫দিবস পূর্ব্ব হইতে অতি সমারোহে তদীয় মেলা আরম্ভ হয়। অনেক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। তাহারা তাম্বিলেরুতে স্নান করিয়া, শুদ্ধ মনে স্বামীর অর্চ্চনা এবং স্বামীর কথা শ্রবণে ও কথনে চতুর্দ্দশীর রাত্রি যাপন করত, প্রতি-নিবৃত্ত হয়।

এলুর হিন্দুরাজ্যের রাজধানী হইলেও, উহাতে হিন্দু-কীর্ত্তির বিন্দুবিসর্গ দেখিলাম না। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে গুলবর্গের ব্রাহ্মণীরাজ উহা আপন রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। ১৫১১ খৃষ্টাব্দে হাম্পির অন্তর্গত বিজয়-নগরের সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণরায়ালু উহা অধিকার ও উড়ি-ষ্যার গজপতিবংশীয় রাজার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, সন্ধিকরণানন্তর উড়িষ্যা হইতে 'কোন্দাপল্লী' পর্য্যন্ত

ভূভাগ প্রদান করেন। তাহাতে এল্লুর গজপতিরাজের শাসনে আসিলেও, অনতিকালমধ্যে গোলকন্দার কুতব-বাদশাহ উহা স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লয়েন। কুতবসাহি-দিগের সময়ে গাঞ্জামের অন্তর্গত চিকাকোল হইতে কোণ্ডাবিডু পর্য্যন্ত ভূভাগ অধিকার করিয়া, পঞ্চ সরকারে বিভক্ত হইলে, এল্লুর সেই পঞ্চ সরকারের অন্যতম হইয়াছিল। এল্লুর-সরকারের প্রতিনিধি যে ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। দুর্গপ্রাচীরে বৌদ্ধনিদর্শনের অনেকগুলি প্রস্তর দৃষ্ট হয়। উহা পুরাতন বেঙ্গী বৌদ্ধ মন্দির হইতে আনা হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। দুর্গের অভ্যন্তরে নূতন ডিষ্ট্রীক্ট মুন্সেফ কোর্ট (বিভাগীয় মুন্সবী আদালত) এবং উহার বহির্ভাগে ক্যাথলিকদিগের উপাসনালয় রহিয়াছে। পুরাতন সহর অতি গলিজ, রাস্তা অপরিষ্কার। তথায় বাসোপযোগী স্থানাভাব হওয়াতে, খালের অপর পারে পাবারপেটানামক নূতন পল্লীতে অনেকগুলি নূতন ঘর প্রস্তুত হইয়াছে।

এল্লুর ইংরাজ শাসনাধীনে আসিলে, তথায় সেনা-নিবাস হয়। এখনও সেনানিবাসের গৃহাদি বিদ্যমান রহিয়াছে। টেলিগ্রাফ আফিস ও তাম্বিলেরুর মধ্যস্থলে

পেরেড-ভূমি (কাওয়াজের স্থান) অতি উৎকৃষ্ট। এল্লুর গোদাবরী ডিষ্ট্রীক্টের সহকুমা বলিয়া, এখানে সব-কালেক্টর, সব জজ, ডিষ্ট্রীক্ট মুনসেফ, তহসিলদার, সব-রেজিষ্টার, পুলিশ অফিস, স্কুল, প্রোটেষ্টেন্ট ক্যাথলিক খৃষ্ট উপাসনালয়, ডাক বাঙ্গালা, হিন্দু-ছত্রবাটী ইত্যাদি সমস্ত আছে। এখানে অতি উত্তম কারপেট প্রস্তুত ও সল্ট-পিটর (সোরা) উৎপন্ন হয়। এখান হইতে দেড় মাইল দূরে সনারপেটনামক গণ্ডগ্রামে সনারপেট জমিদার-দিগের আবাসস্থান। জমিদার নাবালক পুত্র রাখিয়া, পরলোকগত হওয়াতে, জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে আছে। নাবালকের পিতামহ নরসিংহ আপ্পারাও মহিষাসুরমর্দ্দিনী ও সন্তানগোপালস্বামী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ইষ্টকোষ্ট (পশ্চিম উপকুলিক) রেলওয়ে পাবার-পেটার মধ্য ও এস্কার্ব্বে চর্চ্চের ধার হইয়া, কানাল তীরের নিকট দিয়া, লকের কিনারা বহিয়া গিয়াছে। কানালের ধারে ষ্টেসন হইবে। এল্লুরে বিশেষ কিছু দেখিবার নাই। ঐতিহাসিক বিষয়ে বেঙ্গী রাজধানী বলিয়া বিখ্যাত আছে।

বিজয়পুর।

১৯এ নভেম্বর মঙ্গলবার গডক হইতে রওনা হই। হোড়গি জংসন নামে দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলওয়ের যে লৌহবর্ত্ম আছে, বিজয়পুর গমন করিতে হইলে, সেই বর্ত্মে যাইতে হয়। হোড়গি হইতে ৫৯ মাইল দক্ষিণে ও গডক হইতে ১১৪ মাইল উত্তরে বিজয়পুর। আমরা গডক হইয়া, বিজয়পুরে গিয়াছিলাম। ট্রেন বেলা ১১টা ৩৮ মিনিটের সময় ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। প্ল্যাট-ফরমে অর্থাৎ আরোহীর অবস্থানমঞ্চে রেলওয়ে পুলি-শের ফৌজদার ও বিজয়পুরের তহশীলদার মহাশয়-দ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ধর্ম্মশালার বাটীতে গমন ও তথায় আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক আহার ও বিশ্রামান্তে আদিলসাহীবংশীয় মুসলমান রাজাদিগের কীর্ত্তি সন্দর্শন করিতে বহির্গত হই। প্রথমে বিজয়পুরের পূর্ব্ববিবরণ কিঞ্চিৎ দেওয়া আবশ্যক। ভূগোলে ও ইতিহাসে উহা 'বিজাপুর' নামে পরিচিত; কিন্তু পুরাতন প্রস্তরে খোদিত অনুশাসনে উহা বিজয়পুর নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা অবশ্য মহারাষ্ট্রদেশের অন্তর্গত ও মুম্বেই বিভাগে অবস্থিত।

এইরূপ কিংবদন্তী, প্রাচীন বিক্ষণহোলি নামক গ্রামের উপরে বিজয়পুর নির্ম্মিত হইয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই স্থান বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। দুর্গের প্রধান তোরণের নিকট হইতে যে বৃহৎ প্রস্তর-স্তম্ভ আনয়ন করিয়া, চিম্মহলের সম্মুখে রাখা হইয়াছে। তাহার গঠনাদি দেখিয়া, পুরাতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন, উহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বের হইবে। উহা যে বিজয়-স্তম্ভ ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই এবং যে মহাত্মা কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল, তিনিই বোধ হয় বিজয়পুর প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। ঐ স্তম্ভটি একখানি বৃহৎ গ্রেনাইট (প্রস্তর-বিশেষ) কাটিয়া প্রস্তুত হইয়াছে; দেখিলে নিতান্ত বিস্মিত হইতে হয়। কেননা, গ্রেনাইট প্রস্তর কাটিয়া এরূপ প্রকাণ্ড স্তম্ভ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। পুরাকালে কি উপায়ে এরূপ অতি বৃহৎ ও ভারশালী স্তম্ভ বহু দূর হইতে আনয়ন করিয়াছিল, তাহাও বুদ্ধির অগম্য। উহাতে যে মোল্‌ডিং অর্থাৎ বিট আছে, তাহা অতি পরিপাটী। অকিল্লার দরজার নিকট হিন্দু-মন্দিরের যে ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে, তাহার স্তম্ভে তিনটি অনুশাসন খোদিত আছে। আবার তিনটিতেই এই স্থান বিজয়পুর নামে অভিহিত হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে প্রথমটী

পশ্চিম চালুক্যবংশীয় ও দ্বিতীয়টী সোমেশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত। পুরাতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন যে, তিনি ১০৬৯—১০৭৫ খৃঃ পর্য্যন্ত এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অনুশাসনটি ১১৯৬ খৃষ্টাব্দের। উহা দেবগিরির যাদববংশীয় চতুর্থ রাজা প্রথম জয়তুঙ্গী স্বকীয় রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে বিজয়পুরে শাসন করিবার সময়ে প্রদান করেন। তাঁহার প্রদত্ত আরও তিনটি অনুশাসন বিজয়-পুর ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার পিতা ভিল্লন্ দেবগিরিতে ১১৮৭ খৃঃ হইতে ১১৯১ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ১১৯১খৃঃ হইতে ১২০৮খৃঃ পর্য্যন্ত, পরে তাঁহার পুত্র ২য় সিংহম্ ১২০৯ খৃঃ হইতে ১২৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ৩য় অনু-শাসনটি পূর্ব্বোল্লিখিত (দ্বিতীয় সিংহম্) কর্তৃক প্রদত্ত। তাঁহার প্রদত্ত আরও অনেকগুলি অনুশাসন বেলগাঁও (বেনুগ্রাম), ধার্ব্বার, কল্হাপুর, মহিসুর, নিজাম রাজ্য ও বিজয়পুর ডিষ্ট্রীক্টে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার পৌত্র ও উত্তরাধিকারী কৃষ্ণ ১২৪৭ খৃঃ হইতে ১২৫৯ খৃঃ পর্য্যন্ত দেবগিরিতে থাকিয়া রাজত্ব করেন। কৃষ্ণরাজার প্রদত্ত অনুশাসন, বেলগাঁও ও ধার্ব্বারে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বিজয়পুর ডিষ্ট্রীক্টে পাওয়া যায় নাই। তাঁহার কনিষ্ঠ

রাজা মহাদেব, ১২৫৯ খৃঃ হইতে ১২৭১ খৃঃ পর্য্যন্ত দেবগিরিতে রাজত্ব করেন। তাঁহার কৃত একটি অনুশাসন বিজয়পুরডিষ্ট্রীক্টে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামচন্দ্র, ১২৭১ খৃঃ হইতে ১৩১০ খৃঃ পর্য্যন্ত দেবগিরিতে রাজত্ব করেন। তাঁহার কৃত কোন অনুশাসন বিজয়পুরডিষ্ট্রীক্টে এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাম্রশাসন ও প্রস্তরানুশাসন ধার্ব্বার প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহাতে একপ্রকার স্থির বলিতে পারা যায় যে, দেবগিরির যাদববংশীয় রাজারা বর্ত্তমান মুম্বেই প্রেসিডেন্সির অধিকাংশ স্থানেই আধিপত্য করিতেন এবং বিজয়পুর তাঁহাদিগের অধীনে ছিল। ১৩০৬ অব্দে দিল্লীর সম্রাট আলা-উদ্দিনের সুপ্রসিদ্ধ সেনানায়ক মালিক কাফুর কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত মহারাজ রামচন্দ্র দেবগিরিতে পরাজিত ও বন্দী হইয়া, দিল্লীতে প্রেরিত হইলে, বিজয়পুর দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

মালিক কাফুরের পুত্র করিম্-উদ্দীন বিজয়পুরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিল। এখন যাহাকে করিম-উদ্দীনের মস্‌জিদ কহে, উহা পূর্ব্বে হিন্দুদিগের একটি বড়িষ্ঠ দেবালয় ছিল। এই করিম-উদ্দীনই উহা মুসলমানদিগের ভজনালয়রূপে পরিণত করিয়াছিল। পরে দেখিতে

পাওয়া যায় যে, ১৪৩৫ খৃঃ আলা-উদ্দীন ব্রাহ্মণীর ভ্রাতা মহম্মৎ খাঁ বিজয়পুর অধিকার করিয়াছিল। তৎপরে ১৪৪৪ খৃঃ হাম্পীর অন্তর্গত বিজয়নগরের দেবরাজা বিজয়পুর আক্রমণ করিয়া, সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ১৪৫৭ খৃঃ রাজা মামুদ-ঘায়ান্ বিজয়পুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৪৭২ খৃঃ ২য় মহম্মদ খাঁ ব্রাহ্মণী দক্ষিণ হইতে প্রত্যাগমনকালে বিজয়পুরে বিশ্রাম করেন। ১৮৮৪ খৃঃ মামুদঘায়ন গুপ্তচর কর্ত্তৃক নিহত হইলে, অস্থুপ-আদিলশাহ বিজয়পুরের শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হয়েন। তিনি তুরক্কের সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। কোন কারণ বশতঃ জ্যেষ্ঠতাতের ক্রোধাগ্নিতে পতিত হইয়া, প্রাণরক্ষার্থ দেশ ত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মণী রাজসংসারে আসিয়া কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৪৮৯ খৃঃ ব্রাহ্মণীরাজ্যের বিশৃঙ্খলতা ঘটিলে, মামুদ বশ্যতা-পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বাধীন হইয়া, বিজয়পুরে আদিলশাহি-বংশীয় রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি ১৫১০ খৃঃ মানবলীলা সংবরণ করেন। তদ্বংশীয় নয় জন রাজা ১৬৮৬খৃঃ পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া, অতুল প্রতাপ সহকারে বিজয়পুর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্রমে চতুর্দ্দিকে আপন আধিপত্য স্থাপন করেন এবং হাম্পির

অন্তর্গত বিজয়নগরের নরপতি রায়ার রাজা এবং গোলকন্দা ও আমেদনগরের রাজাদিগের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহাদিগের সকলের পৃথক বিবরণ দিবার আবশ্যকতা নাই। সকলের নাম মাত্র প্রদত্ত হইল।

অস্মুপ আদিল শাহ	১৪৮৯	হইতে	১৫১০	পর্য্যন্ত।
ইস্মাইল আদিল শাহ	১৫১০	"	১৫৩৪	"
মল্লু আদিল শাহ	১৫৩৪			
ইব্রাহিম প্রথম শাহ	১৫৩৪	"	১৫৫৭	"
আলি আদিল শাহ	১৫৫৭	"	১৫৮০	"
ইব্রাহিম ২য়	১৫৮০	"	১৬২৬	"
মামুদ শাহ	১৬২৬	"	১৬৫৬	"
আলি আদিল শাহ ২য়	১৬৫৬	"	১৬৭২	"
সিকান্দার আদিল শাহ	১৬৭২	"	১৬৮৬	"

আলি আদিল শাহ ১ম (১৫৫৭।১৫৮০খৃঃ) রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত বিজয়নগরের রামরাজার সহিত মিত্রতা করিয়া, তদীয় আতিথ্যস্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার সহায়ে আমেদনগর ও গোলকন্দার রাজাদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন। কিন্তু রামরাজা সন্ধিভঙ্গ করিয়া, বিজয়পুর রাজ্যের এক অংশ লুণ্ঠন ও কয়েকটি প্রদেশ

আত্মসাৎ করিলে, আলি-আদিল-শাহ, গোলকন্দা, আমেদনগর ও বিদর্ভ রাজাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সন্ধি করিলেন। সকলেই রামরাজাকে সাধারণের শত্রু ভাবিয়া, একত্র মিলিত ও তালিকোটায় আসিয়া, কৃষ্ণানদী পার হইয়া, সমরে তাঁহাকে পরাস্ত, বন্দীকৃত ও নিহত করিয়া, বিজয়নগরে গমনপূর্ব্বক তাহা লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিয়াছিলেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ বিজয়-নগরে প্রদত্ত হইয়াছে। আদিল-শাহি রাজাদিগের দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপ এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, মামুদ আদিল শাহর সময়ে বিজয়পুরের দুর্গ ও সহরতলিতে ২০ লক্ষেরও অধিক লোক বাস করিত বলিয়া কথিত আছে। রাজ-লক্ষ্মী সর্ব্বদাই চঞ্চলা, কোথাও স্থিরভাবে থাকেন না। ক্রমে উত্তরদিকে দিল্লীর মোগল সম্রাটেরা প্রবল হইয়া উঠিলেন; অরঙ্গেব স্বয়ং দাক্ষিণাত্য জয় করিতে আসি-লেন। তৎকালে অপ্রাপ্তবয়স্ক সিকান্দার শাহ বিজয়-পুরে রাজত্ব করিতেছিলেন। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দের শেষ-ভাগে সম্রাট-পুত্র সুলতান আজিম এক দল মোগল বাহিনী লইয়া, বিজয়পুরের সম্মুখে আসিয়া, দুর্গ অব-রোধ করিয়া রহিলেন। ক্রমে সম্রাট অরঙ্গেব স্বয়ং তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গ দুরারোহ,

সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত দেখিয়া, বলপ্রয়োগে উহা সহসা গ্রহণ করা অসাধ্য ভাবিয়া, সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং ভিতরে রসদ যাইবার পথ বন্ধ করিলেন। দুর্গস্থ সেনারা ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত সমভাবে উহা রক্ষা করিয়াছিল। আহার্য্য দ্রব্য ক্রমে নিঃশেষিত হওয়াতে, দুর্গস্থ সেনাগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ আহারাভাবে কঙ্কালাবশিষ্ট হইল, দুর্গরক্ষণে সেনারা অসমর্থ জানিয়া, মন্ত্রী সভায় অনেক মন্ত্রণার পর স্থির হইল যে, সিকান্দার আদিল শাহ সম্রাটের নিকট যাইয়া, বশ্যতা স্বীকার ও সম্মান প্রদর্শন করিবেন। সম্রাটের নিকট সংবাদ পাঠাইলে, তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন। তদনন্তর সম্রাট স্বদলবলে ফতে দরজা দিয়া, দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক রাজপ্রাসাদে যাইয়া, দাওয়ান খাসে আসন গ্রহণ করিলেন। তখন সিকান্দার-শাহ রৌপ্যশৃঙ্খলে বদ্ধ ও তাঁহার সম্মুখে আনীত হইয়া, তাঁহার পদদ্বয় স্পর্শ করিয়া, বশ্যতা স্বীকার করিলে, অরঞ্জেব তাঁহাকে নিকটে বসিতে দিয়া সম্মানিত করিলেন এবং তাঁহার বাৎসরিক ব্যয় জন্য এক লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। তৎকালে সিকান্দারের ঊনবিংশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম। অরঞ্জেব বিজয়পুরের অপরাপর প্রধান

কর্ম্মচারীদিগকে মর্য্যাদা অনুসারে পদ প্রদানপূর্ব্বক সম্মানিত করিলেন। এই ঘটনা ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবরে হইয়াছিল এবং ইহাতেই আদিল-শাহির বংশ লোপ পাইল। সিকান্দার-শাহ সামান্য লোকের ন্যায় ভগ্নাবস্থায় জীবনের অবশিষ্ট অংশ ঈশ্বরের উপাসনায় অতিবাহিত করিয়া, কয়েক বৎসর পরে ইহলোক পরিত্যাগ করেন এবং আপন গুরু পিরনুসরুল্লার কবরের সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত কবরগৃহে স্ব ইচ্ছায় প্রোথিত হয়েন।

বিজয়পুর অতি সমৃদ্ধিশালী দেখিয়া, সম্রাট অরঙ্গেব তথায় ১৬৮৯ খৃঃ পর্য্যন্ত ছিলেন। সেই সময়ে বর্ষত্রয়ব্যাপী সুবিখ্যাত ভীষণ মড়ক উপস্থিত হইলে, এক দুর্গের অভ্যন্তরেই লক্ষ লোকের অধিক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সহরতলিতে কত লোক মরিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই; দুর্গ ও সহরতলি হইতে কত লোক দেশত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহারও সংখ্যা নাই। কথিত আছে, মড়ক প্রশমিত হইলে, অরঙ্গেবের আজ্ঞায় লোকসংখ্যা গৃহীত হইয়াছিল। তাহাতে স্থিরীকৃত হয় যে, এক লক্ষ ৮৪ হাজার বাটীতে ৯ লক্ষ ৮৪ হাজার লোক বর্ত্তমান ছিল। অতএব মামুদ শাহর সময় হইতে ১০ লক্ষ ১৬

হাজার লোক কমিয়া গিয়াছিল। তখন হইতে বিজয়পুর দিল্লীসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। ১৭২৩ অব্দে উহা নিজামরাজ্যভুক্ত হয়। ১৭৬০অব্দে 'উদ্গীর' সমরের পর নিজাম সলাবৎজঙ্গ উহা বাবাজী পেশোয়াকে প্রদান করেন। তখন হইতেই বিজয়পুরের প্রকৃত অবনতির সূত্রপাত হইয়াছিল। কথিত আছে, মোগল শাসনকর্ত্তারা রাজপ্রাসাদগুলিকে অতি যত্নের সহিত পরিষ্কার রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা যদিও কিছু নূতন নির্ম্মাণ করেন নাই বটে; কিন্তু কোথাও কোন প্রাসাদের অনিষ্টও করেন নাই। মহারাষ্ট্রদিগের হস্তেগত হওয়াতে, অন্যরূপ হইয়াছিল। তাঁহাদিগের দ্বারা প্রাসাদের জানালা, দরজা, ছাদের কাষ্ঠ, সিলিংএর মৌল্ডিং (ছাদের ভিতর দিকের কার্ণিস) ও অপর যাহা কিছু স্থানান্তরিত হইতে পারে, তৎসমস্তই অন্যত্র নীত হইয়াছিল। প্রত্যেক মহারাষ্ট্রশাসনকর্ত্তা বিজয়পুরে আসিয়া, সমস্ত আত্মসাৎ করিতে ব্যস্ত হইতেন; প্রাসাদের বা প্রজাগণের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন না। তাঁহাদিগের অত্যাচারে দিনের পর দিন অধিবাসীরা আপন আপন সম্মান রক্ষার অভিপ্রায়ে বিজয়পুর পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র যাইতে লাগিল। আবার ১৭৮৪ অব্দে বৎসরত্রয়ব্যাপী ভয়ানক অনাবৃষ্টি,

দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত মড়ক উপস্থিত হইলে, এত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল যে, মানবকঙ্কালে বিজয়পুরের চতুর্দ্দিক বহুদূর ব্যাপিয়া শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। মহারাষ্ট্র শাসনকর্ত্তাদিগের অত্যাচারপ্রকোপ এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, অধিকাংশ অধিবাসী গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়াছিল; ক্রমে বিজয়পুর একটি মহাশ্মশানে পরিণত হয়।

১৮৪৮ খৃঃ অব্দে সাতারার মহারাজ শাহজীর মৃত্যু হইলে, সাতারা রাজ্যের সহিত বিজয়পুর ইংরাজশাসনভুক্ত হয়। সাতারায় কালেক্টরেট স্থাপিত হইলে, উহা তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে সোলাপুর কালেক্টরেটের অন্তর্ভুক্ত হইয়া, পরবৎসরেই কলাদ্গী-কালেক্টরেটের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে বিজয়পুরকে পৃথক ডিষ্ট্রীক্ট করিবার কল্পনা হয়। তিন বৎসর পরে তাহা স্থিরীকৃত হইলে, পুরাতন প্রাসাদগুলির জীর্ণ-সংস্কার হইতে থাকে। এখন উহা ডিষ্ট্রীক্টের হেড কোয়ার্টার অর্থাৎ মূলস্থানরূপে পরিণত হইয়াছে। আদালত গৃহ কর্ম্মচারীদিগের বাঙ্গালাপ্রাসাদেই রহিয়াছে। এই বৎসরের লোকসংখ্যারতালিকায় বিজয়পুর দুর্গ ও সহরতলিতে ১৮ হাজারেরও ন্যূন পরিগণিত হই-

য়াছে; কালের কি বিচিত্র মহিমা! যে বিজয়পুরে মামুদ আলি শাহর সময়ে ২০ লক্ষ লোকের বাস ছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে; আবার যেখানে তিন বৎসর মড়কের পর ও ১৬৮৯ খৃঃ অরঙ্গেবের আজ্ঞায় ৯ লক্ষ ৮৪ হাজার লোক পরিগণিত হইয়াছিল, সেই স্থান হেড কোয়ার্টর-রূপে পরিণত হইলেও, ১৮৯১ খৃঃ লোকসংখ্যা ১৮হাজা-রের কম হইল!

যে দিক দিয়া দর্শকবৃন্দ বিজয়পুরে আসিবেন, দূর হইতে অত্যুচ্চ দুর্গ, প্রাচীর সুপ্রশস্ত, পরিখা ও বুরুজ-টুম্ব (গোল গম্বুজ) দেখিয়া মনে করিবেন, ভিতরের দৃশ্য কি অপূর্ব্ব ও কত লোকই বাস করিতেছে! কিন্তু দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই, তাঁহাদের সে ভ্রম দূর হইবেক। দুর্গমধ্যে সর্ব্বত্রই মরুভূমি দেখিবেন। আদিল শাহিদিগের সময়ের বাসোপযোগী একটীমাত্র গৃহও দৃষ্ট হইবে না। ভগ্ন প্রাসাদ, টুম্ব ও জুম্মামসজিদ প্রভৃতি কয়েকটী উপাসনালয় দণ্ডায়মান থাকিয়াই যেন তাঁহা-দিগের পূর্ব্ব গৌরব ও সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। দুর্গস্থ প্রাসাদে ডিষ্ট্রীক্ট-আফিস আসার পর উহার একস্থানে নূতন করিয়া বাসোপযোগী বাটী ও বাজার নির্ম্মিত হইতেছে। অনেক স্থানেই পুরাতন ভিত্তির পাথর

উঠাইয়া লওয়া হইতেছে; এখনও অনেক স্থানে ভিত্তি দৃষ্ট হয়। বোধ হয় ১০।১৫ বৎসর পরে যেখানে আদিলশাহিদিগের সময়ে লক্ষ লক্ষ লোক বাস করিত, তাহা শুষ্ক আবাদ-ভূমিতে পরিণত হইবে। কালমাহাত্ম্যে সর্ব্বত্রই এইরূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে! কোথাও মরুভূমি নূতন রাজধানীতে পরিণত হইতেছে, আবার কোথাও পুরাতন সমৃদ্ধিশালী রাজধানী মরুভূমি হইতেছে!

ব্রিটিশ-শাসনে অবশ্যই বিজয়পুরের ক্রমশঃ উন্নতি হইবে। এই স্থান উত্তর ১৬।৫০ অক্ষরেখায়, পূর্ব্ব ৭৫।৪৮ দ্রাঘিমায় ও সমুদ্রতল হইতে ১৯৫০ ফুট উপরে অবস্থিত বলিয়া, গ্রীষ্মকালে উত্তাপাধিক্য হইয়া থাকে। বর্ষা অতি কম, আবহাওয়া অতি শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর। ইহা এখন তৃতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপালিটীতে পরিণত হইয়াছে। বালকদিগের শিক্ষোপযোগী একটি উচ্চ শিক্ষার বিদ্যালয় ও তিনটি দেশীয় ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত টেলিগ্রাফ, পোষ্ট আফিস, ডিষ্ট্রীক্ট হস্‌পিটাল, পুলিসলাইন ও জেলার সমস্ত আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশীয় কৃতবিদ্য উকীল ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা একটি লাইব্রেরী ও একটি ক্লব স্থাপন

করিয়াছেন। ক্রমে বিজয়পুরের পুনরুন্নতি হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিজয়পুর হিন্দুদিগের তীর্থ না হইলেও, যাঁহারা ভারতবর্ষের পূর্ব্বকীর্ত্তি দেখিতে অভিলাষী, তাঁহারা বিজয়পুর সন্দর্শন করিয়া পরিতুষ্ট হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। আদিলশাহিদিগের অনেকগুলি পূর্ব্বকীর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহার কথঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ম। দুর্গ—উহা অদ্যাপি সমভাবে থাকিয়া, আগন্তুকবৃন্দের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়া থাকে। উহা মেরামত না হইলেও, অদ্যাপি কোথাও ভগ্ন হয় নাই। উহার দেওয়াল ৪০ হইতে ৫০ ফুট পরিসর বিশিষ্ট, গভীর পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং দুরারোহ, সুদৃঢ় ও উচ্চ। উহাতে ১০৬টী বুরুজ আছে। উহার গঠন প্রণালী যথা—২০ ফিট প্রশস্ত ও ৩০ হইতে ৫০ ফিট উচ্চ দুইটি প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর ২০ হইতে ৩০ ফিট ব্যবধানে নির্ম্মিত হইয়াছে; মধ্যবর্ত্তী স্থান মৃত্তিকার দ্বারা স্তবকে স্তবকে পূর্ণ করিয়া উপর পাঁকা প্ল্যাটফরমে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। বহির্দিকে ১০ ফুট উচ্চ একটি রামপার্ট দেওয়াল বুরুজ হইতে বুরুজ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত ও ভিতর হইতে গোলাগুলি চালাইবার জন্য উহাতে যথাযথ ছিদ্র রক্ষিত

হইয়াছে। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে আলি আদিল শাহ তালি-কোটার যুদ্ধে বিজয়নগরের রামরাজাকে পরাভূত এবং নিহত করিয়া, স্বদলে বিজয়নগর লুট ও ধ্বংস করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, আপনার রাজধানী সুরক্ষিত করিবার অভিলাষে এই রামপার্ট দেওয়াল আড়াই বৎসরে নির্ম্মাণ করেন। অতএব উহার নির্ম্মাণকার্য্য ৩২০ বৎ-সরের উপর সম্পূর্ণ হইয়া থাকিবে।

২য়। ১০৬টি বুরুজের মধ্যে পশ্চিম দিকের 'সেরজী'নামক ও দক্ষিণদিকে 'ফতে' দরজার উভয় পার্শ্বে 'লাণ্ডা কোসব' ও 'ফেরিঙ্গি' বুরুজ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

সেরজীবুরুজ পশ্চিম দেওয়ালের মধ্যভাগে। উহাতে উঠিবার যে সোপান আছে, তাহার পার্শ্বস্থ রেম-পার্ট দেওয়ালে দুইটি সের (ব্যাঘ্র) খোদিত আছে। তাহা হইতে উহা সেরজী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। উহার উপর প্রসিদ্ধ 'মালিক মৈদ্দান' নামে বৃহৎ কামান স্থাপিত রহিয়াছে। ইহা ১৪ ফিট ৩ ইঞ্চ দীর্ঘ। ইহার নীচের ব্যাস ৪ ফিট ৮ ইঞ্চি ও মজ্‌লের ব্যাস ৪ ফিট ৯॥ ইঞ্চি, ভিতরের ছিদ্র ১২ ফিট ১০ইঞ্চি, বারুদ থাকি-বার স্থান ৫ ফিট ৭ ইঞ্চি এবং উহার ব্যাস ২ ফিট ৪

ইঞ্চি ও বাত্তিঘরের ব্যাস ৩ঞ্চ। উহার গুরুত্ব ১১৬০ মণের অধিক হইবে। উহাতে ৬টী অনুশাসন রহিয়াছে। তাহার একটীতে অবগত হওয়া যায় যে, ৯৫৬ হিজরী অব্দে মহম্মদ বিন্-হোসেন-রুমি কর্ত্তৃক আহমেদনগরের আবুল-গাজি-নিজাম-শাহর জন্য উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। অতএব উহা আহমেদনগর হইতে আনয়ন করা হইয়া থাকিবে। উহাতে অরঙ্গেবের প্রদত্ত ১০৯৭হিজরীর অনুশাসন দৃষ্ট হয়।

'ফতে' দরজার ৬০০শত গজ বায়বিদিকে 'লোগুা কোসব' বুরুজ। ইব্রাহিম আদিলশাহ (২য়)র সময়ে হজরৎশাহ নামে কোন উজীর কর্ত্তৃক ১৬০৯ খৃঃ ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া, ১৬৬২ খৃঃঅব্দে সম্পূর্ণ হয়। ইহার উপর একটি বৃহৎ কামান রহিয়াছে। উহা দীর্ঘে ২১ ফিট ৭ ইঞ্চি। উহার ব্রীচের ব্যাস ৪ ফিট ৪ ইঞ্চি, মজ্জলের ব্যাস ৪ ফিট ৫ ইঞ্চি ও ছিদ্রের ব্যাস ১ ফুট ৭॥ ইঞ্চি ও দৈর্ঘ ১৮ ফিুট ৭॥ ইঞ্চি। উহার গুরুত্ব ১২৬০ মণের অধিক।

ফিরিঙ্গিবুরুজ—ইহার অপর নাম 'পর্টুগীজ' বুরুজ। ইহা 'ফতেগেট' হইতে সহস্র গজ পূর্ব্বদিকে হইবে। ইহার গঠনপ্রণালী অন্যান্য বুরুজ অপেক্ষা পৃথক্; প্ল্যাট-

ফরন্ দেওয়াল অপেক্ষা ইহা ৩০ ফিট উচ্চ। আলি-আদিল-শাহ (১ম)র সময়ে ১৫৭৫ খৃঃ কোন পর্টুগীজ জেনারেল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

৩য়। দুর্গাভ্যন্তরে যাইবার জন্য ৫টি প্রবেশদ্বার। পশ্চিমদিকের দরজাটি 'মেক্কা' নামে অভিহিত, উত্তর পশ্চিমদিকের দরজাকে "শাহাপুর" কহে। উহার ভিতর হইয়া শাহাপুর সহরতলিতে যাইতে হয়। উত্তরদিকের দরজাকে "ব্রাহ্মিণী" কহে। যেহেতু ব্রাহ্মিণীরাজ্য বিজয়পুরের উত্তর দিকে। পূর্ব্বদিকের দরজাকে 'আল্লাপুর" কহে। উহা দিয়া আল্লাপুর সহরতলিতে যাইতে হয়। দক্ষিণদিকের দরজা "মঙ্গলী" নামে অভিহিত। উহা দিয়া মঙ্গলী সহরতলিতে যাইতে হয়। প্রথম চারিটি দরজা অদ্যাপি ব্যবহৃত হইতেছে। শেষোক্তটি বন্ধ করিয়া সাধারণ আফিসে পরিণত করা হইয়াছে।

৪র্থ। 'আর্ককেল্লা'—ইহা দ্বারা রাজপ্রাসাদ রক্ষিত হইত। অতএব ইহা সহরের সর্ব্ব মধ্যস্থলে। য়ুসুপ-আদিল-শাহ ১৪৮৯ অব্দে ইহা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন এবং ১ম ইব্রাহিম্ আদিলশাহের রাজত্ব-কালে ১৫৪৬ অব্দে সম্পূর্ণ হয়। খাঁ-আজাম-এক্তিয়ারখাঁ উহার নির্ম্মাণকার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ইহার গঠন-

প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট। ইহা আকৃতিতে গোলাকার ও আয়তনে ন্যূনাধিক এক মাইল পরিসর হইবে।

৫ম। গোল বা বোলিগুম্বজ—উহা সুলতান মহম্মদ-আদিল শাহের সমাধিগৃহ, সর্ব্বোচ্চ বলিয়া বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয়। ইহা দুর্গাভ্যন্তরের পূর্ব্বদিকে ও রেল-ষ্টেশন হইতে নিকটে। অতএব দর্শকমাত্রেই উহা প্রথমে দর্শন করিয়া থাকেন। উহা উচ্চ ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। উহার পোতা থামাল সমচতুর্ব্বাহু, প্রত্যেক দিকে ১৩৫ ফিট দীর্ঘ। ডোমের সর্ব্বোচ্চ স্থান পোতা হইতে ১৯৮ ফিট উচ্চ। পোতা থামালের দেওয়াল ৯ফুট পরিসরবিশিষ্ট, গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত ও ১০০ ফুট উচ্চ। দক্ষিণদিক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে, মধ্যস্থলে বৃহৎ একটি সমবাহু ৭৭ ফুট দীর্ঘ ও প্রশস্ত এবং ২৪ ফুট উচ্চ প্ল্যাটফরমের উপর সুলতান মামুদশাহার, তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রের সমাধি দৃষ্টিগোচর হয়। উপরে উঠিতে প্রত্যেক কোণে একটি করিয়া সোপান ও গুম্বজের চতুর্দ্দিকে ফিরিয়া ভ্রমণ করিবার রাস্তা আছে। গুম্বজের আয়তন বৃহৎ বলিয়া শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়, তজ্জন্য উহাকে বোলিগুম্বজ কহে। উহা ১০৬৭ হিজরীতে, ইং ১৬৫৬খৃঃ সুলতান মাহমদশাহ কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই সমাধিগৃহের উত্তরদিকে অথচ চত্বরের মধ্যে অবস্থিত উপাসনালয়টীর গঠন অতি পরিপাটী। উহাতে একখণ্ড প্রস্তরে যে অনুশাসন আছে, তাহার মর্ম্ম এই রূপ "জীবন ক্ষণস্থায়ী; অতএব উহাতে নির্ভর করিও না। ক্ষণভঙ্গুর জগতে বিশ্রাম কোথায়? জগৎ ইন্দ্রিয়-সুখকর মাত্র। জীবনদান সকল দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও স্থায়ী নহে। উপাসনালয়ের ভৃত্য, সুলতান মামুদ শাহর দাস মালিক আকুফ ইহা নির্ম্মাণ করিল। সুলতান মামুদ আদিল শাহর আজ্ঞায় ১০৪৫ হিজিরিতে, (১৬৩৬ খৃঃ) ইহার পঙ্কের গিল্টির কার্য্য শেষ হইল। কাল সকলকেই সমভাবে নষ্ট করেন। রাজাই হউন, আর বাদসাই হউন, সকলকেই সামান্য লোকের ন্যায় কালের বশীভূত হইতে হইবে। জীবন ক্ষণকাল স্থায়ী, কিন্তু পরলোকের পন্থা বহুদূরব্যাপী, সেই সর্ব্ব-ব্যাপী অনাদির উপর নির্ভর কর। তাঁহারই নিকট আলো ও রাস্তা অন্বেষণ কর। হে মানব! হে ক্ষণ-ভঙ্গুর মানব! তিনিই মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া জানিবে।" অতএব এই হিসাবে এই পঙ্কের কার্য্য ২৫৬ বৎসরের পূর্ব্বের হইলেও, অদ্যাপি সমভাবে থাকিয়া, তখনকার শিল্পনৈপুণ্যের চরম অবস্থা জ্ঞাপন

করিতেছে। উহা এক্ষণে শ্বেতাঙ্গদিগের বিশ্রামাবাসে (ডাক-বাঙ্গালায়) পরিণত হইয়াছে। উভয়ের মধ্যস্থলে একটি জলাশয়ে ফোয়ারার বন্দোবস্ত দেখিলাম। পূর্ব্বে বেগম-হ্রদ হইতে জল আসিয়া ফোয়ারা দিয়া নির্গত হইত। এখন অবশ্য পয়ঃপ্রণালী নষ্ট হওয়ায়, আর জল আইসে না। সমাধি-গৃহের সম্মুখে তিনমহল বৃহৎ অট্টালিকায় নহবৎ বাজিত এবং ফকিরদিগের আবাস-গৃহ ছিল।

৬ষ্ঠ। জুম্মামস্ক—দাক্ষিণাত্যের মধ্যে যত মস্‌জিদ আছে, এই মস্‌জিদ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা সহরের পশ্চিম দিকে আল্লাপুর-প্রবেশ-দ্বারের দক্ষিণ দিকে ও আর্ককেল্লা হইতে ১২০০ শত গজ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। আলি আদিল শাহ ১৫৩৭ খৃঃ ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ এবং সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ ১৬২৯ খৃঃ উহা সম্পূর্ণ করেন। চত্বরের তিন দিকে ভজনালয়, মধ্যস্থলে বৃহৎ জলাশয় ও ফোয়ারা। ইহার বৃহৎ হলটী ২৫৭ ফুট দীর্ঘ ও ১৪৫ ফুট প্রশস্ত। উহাতে ২২৮৬ জন লোকের নেমাজ পড়িবার স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে।

৭ম। মেথরমহল—ইহা আল্লাপুর রাস্তার দক্ষিণ দিকে ও আর্ককেল্লা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে ৬৫০ গজ দূরে

অবস্থিত। ইহা একটি দরজামাত্র কেহ কেহ কহেন, ইহা "মেথর-মহলের" দরজা। অপরে কহেন ইব্রাহিম আদিল শাহের ২য় সচীব "গোদা-মেথর" নামধারী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। আবার কেহ কহে যে, এই তোরণ ও ভিতরের ক্ষুদ্র মস্‌জিদটী ফকিরদিগের 'মেথর' (প্রধান বা নেতৃ) কর্ত্তৃক তাহাদিগের ব্যবহারের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক উহার আয়তন বৃহৎ নহে। উহা দীর্ঘে প্রস্থে ২৪ ফুট মাত্র। মিনারটে বা চূড়া পর্য্যন্ত ৬০ ফুট উচ্চ হইবে। উহাতে যে সুন্দর ভাস্কর ও মৌলডিং কার্য্য আছে, উহা তাহারই জন্য প্রসিদ্ধ। ঐ সৌন্দর্য্য লেখনীর বর্ণনাতীত। উহা সন্দর্শন না করিলে, কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হইবে না। উহা শ্লেট প্রস্তরে নির্ম্মিত, দুই শত বৎসরের অধিক হইলেও কার্ভিংএর ধারগুলি এত পরিস্কার আছে যে, অতি অল্প-দিনের বলিয়া বোধ হয়।

৮গ। উপ্রিবুরুজ—পূর্ব্বোক্ত সেরজি-বুরুজ হইতে ১৫০ গজ দূরে আলি আদিল শাহ (১ম)র বিখ্যাত সেননায়ক হাইদার খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত; উহা ৮০ ফুট উচ্চ; উহার উপর উঠিবার জন্য গায়ে গোল সিঁড়ি রহিয়াছে। উহার উপর হইতে পশ্চিম দিকেও সহরের

দৃশ্য অতি মনোহর। উহার উপর দুইটি বৃহৎ লৌহ কামান রহিয়াছে। তাহাদিগের একটী লম্‌চেরি নামে প্রসিদ্ধ এবং ৩০ ফুট ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ। উহার প্রাচের ব্যাস ৩ ফুট ২ইঞ্চি; মাজলের ব্যাস ১ফুট ১১ইঞ্চি. ছিদ্র ২৮ফুট দীর্ঘ। উহার ব্যাস ১॥ ইঞ্চি, গুরুত্ব ১১৩৪ মণ হইবে। অপরটী ১৯ ফুট ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ। উহার ছিদ্রের ব্যাস ৮ ইঞ্চি।

৯ম। 'অস্থুপ আদিল শাহর ইক্সা'—পূর্ব্বোক্ত উপ্রিব্রুজের দক্ষিণদিকে। সংস্কার না থাকাতে, কেহ উহাতে যাইয়া ভজনা করে না।

১০ম। 'চাঁদবাউড়ি'—পূর্ব্বোক্ত উপ্রিব্রুজ হইতে ২৬০ গজ উত্তরে ও শাহাপুর দরজা হইতে ১৫০গজ পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। আলি-আদিল-শাহ (১ম) আপন সহধর্ম্মিণী চাঁদবিবির নাম চিরস্মরণীয় করিবার উদ্দেশে ১৫৭৯ খৃঃ উহা নির্ম্মাণ করেন। উহার চারিদিক প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। উহার জল মিষ্ট এবং পানোপযোগী।

১১শ। উপ্রিব্রুজের উত্তরদিকে হিন্দুদিগের বিঠবা-দেবের মন্দির। উহা বোধ হয়, অধিক দিনের নহে।

১২শ। চাঁদবাউড়ির উত্তর পশ্চিম দিকে ও দুর্গের পূর্ব্বোত্তর কোণে শাহাপুরতোরণের দ্বারে বৃহৎ বৃহৎ গুল-পেরেক মারা রহিয়াছে।

১৩শ। উপ্রিব্রুজের পূর্ব্বোত্তর দিকে ছোট 'আসর' নামক ভজনাগৃহে মহম্মদের কেশ রক্ষিত রহিয়াছে।

১৪শ। ছোট 'আসরের' পূর্ব্বদিকে সিকান্দার আদিল শাহর ক্ষুদ্র সমাধি-গৃহ ইহারই সম্মুখে পীর-শা নায়মুল্লা হোসেন ও নাসের-উদ্দীন-বলীর সমাধি-মন্দির। উভয়েই সিকান্দারের গুরু ছিলেন। সিকান্দার গুরুর সমাধির নিকটেই আপন সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

১৫শ। আর্ককেল্লার বায়বীদিগের পরিখার শত গজ দূরে ২য় আলি আদিল শাহর অসম্পূর্ণ সমাধি-মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য ১৬৫৬খৃঃ আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা দীর্ঘে ও প্রস্থে দুই শত ফুট। ইহার চাতালটী ২৫ ফুট উচ্চ। ইহা সম্পূর্ণ হইলে, গোল গম্বুজ অপেক্ষা বৃহৎ হইত।

১৬শ। আলি আদিল শাহর ২য় অসম্পূর্ণ সমাধি-মন্দির হইতে ১৬০ গজ পশ্চিম দক্ষিণে ক্ষুদ্র বখেরা-মস্‌জিদ ও হাবেলি। বখেরানিবাসী বণিকদিগের জন্য পূর্ব্বোক্ত চাঁদাবিবি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার একাংশ মেরামত হইয়া, পোষ্ট মাষ্টারের আবাসগৃহে পরিণত হইয়াছে।

১৭শ। বথেরামসজিদের ৭৫ গজ উত্তর দিকে মালিক গণ্ডালের সমাধি-মন্দির। ইনি ইব্রাহিম (২য়) ও সুলতান মহম্মদের উজীর ছিলেন। এই ক্ষুদ্র সমাধি-মন্দির ১৬৩০খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহার নিকটে জমরুদ নামে একটি ক্ষুদ্র মসজিদ আছে।

১৮শ। মিউজিয়ম বা 'ইয়াখৎ মহল'—আলি-আদিল-শাহ (২য়)র সমাধি-মন্দিরের অব্যবহিত দূরে অবস্থিত। আদিলশাহিদিগের কীর্ত্তির নিদর্শনস্বরূপ পুরাণ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া, ইহাতে রক্ষিত হইয়াছে।

১৯শ। আর্কেল্লার দক্ষিণ দিকে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র মসজিদ। উহা দীর্ঘে প্রস্থে ২০ ফুট এবং ৪০ ফুট উচ্চ। ইব্রাহিম (২য়)র উজীর নবাব ইত্তাবর খাঁ কর্ত্তৃক ১৬০৮ খৃঃ উহা নির্ম্মিত হয়। উহার গঠনপ্রণালী নিতান্ত মন্দ নহে।

২০শ। ছোট চিন্নহল—পূর্ব্বোক্ত মসজিদের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ইহা বিজয়পুরের কোন বর্দ্ধিষ্ঠ ওমরার আবাসবাটী ছিল। এক্ষণে ইহাতে পুঃ সুপারিণ্টেন্-ডেণ্ট বাস করিতেছেন।

২১শ। ছোট চিন্নহলের সম্মুখ দিয়া আলি আদিল শাহ (১ম)র সমাধি-মন্দিরে যাইবার রাস্তা। এই রাস্তার

পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র জুম্মামস্‌জিদ, আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, গঠনে মন্দ নহে। ইব্রাহিম আদিল শাহ উহা নির্ম্মাণ করেন। রাস্তার সর্ব্ব প্রান্তভাগে আলি আদিল শাহ (১ম)র সমাধি-মন্দির। ১০০ শত ফুট দীর্ঘ ও ৬০ ফুট প্রশস্ত। ইমারতটী নিতান্ত মন্দ নহে, মেরামত নাই। সমাধির উপরস্থ প্রস্তরখানি নাই। মাটির ঢিবি সমাধির নিদর্শনস্বরূপ রহিয়াছে। ইহারই পূর্ব্ব-দক্ষিণাংশে উচ্চ প্ল্যাটফরমের অর্থাৎ মঞ্চের উপর মরকত-নীল বসল্ট প্রস্তরের সুন্দর সমাধিপ্রস্তর রহিয়াছে। উহা যে কোন্ মহাত্মার তাহা জানা যায় নাই।

২২শ। আলি আদিল শাহ (১ম)র সমাধি-মন্দির হইতে ৫০০ শত গজ উত্তরে মেক্কা গেট হইতে সিটেডেলের (নগরস্থ দুর্গের) দিকে যে বর্ত্ম আসিয়াছে, তাহার দক্ষিণ দিকে গম্বুজদ্বয় দৃষ্ট হয়। উহার একটিতে খাবস্ খাঁ ও অপরটীতে আবদুল রজৎ খাঁদের চির-নিদ্রায় রহিয়াছেন। প্রথম মহাত্মা আলি আদিল শাহ (২য়)র মন্ত্রী ছিলেন। ১৬৭৫ খৃঃ নিহত হন। দ্বিতীয় মহাত্মা তাঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন। প্রথম মহাত্মার সমাধি অষ্টবাহুবিশিষ্ট ও ইহার পশ্চিমদিকে সিদি রাহানের সমাধি-মন্দির।

২৩শ। ইব্রাহিম আদিল শাহ (২য়)র কন্যা মালিক জাহানের মস্ক, আর্ক-কেল্লার পশ্চিম দিকে বহিঃপরিখার সেতুর সন্নিকটে। পিতা কর্ত্তৃক ১৫৮৭ খৃঃ নির্ম্মিত হয়। ইহার সম্মুখে ৫টী খিলান। ইহা ক্ষুদ্র হইলেও, গঠনে অতি পরিপাটী।

২৪শ। আর্ক-কেল্লার দক্ষিণ দরজায় হিন্দু-দেবালয়ের মণ্ডপের কয়েকটী স্তম্ভ অদ্যাপি রহিয়াছে। উহা পশ্চিম চালুক্যরাজাদিগের সময়ে নির্ম্মিত, সন্দেহ নাই। উহাতে তিনটি অনুশাসনও আছে। একটি পশ্চিম চালুক্যবংশীয় ২য় সোমেশ্বরের ১০৬৯—৭৫, অপর দুইটি দেবগিরির যাদববংশীয় জয়তুঙ্গ (১ম)র ১১৯১—১২০৯ ও (২য়) সিংহের ১২৪৯—১২৪৭ মধ্যে প্রদত্ত।

২৫। সাতমঞ্জিলি অর্থাৎ সপ্ততলবিশিষ্ট প্রাসাদ। উহা আর্ক-কেল্লার পশ্চিমদিকে, ইব্রাহিম আদিল শাহ (২য়) কর্ত্তৃক ১৫৮৩ খৃঃ নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহাতে বিজয়পুরের সুলতানেরা বাস করিতেন। মহমুদ শারহ সময়ে তাঁহার প্রেয়সী রুম্বার সন্তোষের জন্য উক্ত প্রাসাদ সুসজ্জিত হয়। এখন পাঁচতালামাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। উপরের দুইতালা পড়িয়া গিয়াছে। বহির্ভাগের একাংশও পড়িয়াগিয়াছিল, এখন সিঁড়ি মেরামত হই-

য়াছে। উহার উপর হইতে দুর্গাভ্যন্তরের চারি দিকের দৃশ্য অতি মনোহর।

২৬শ। বৃহৎ চিন্মহল—অনেক চিনের বাসন এই বৃহৎ প্রাসাদে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া, উক্ত নামে উহা প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহার জীর্ণ সংস্কার করিয়া, বিভাগীয় আদালতগৃহে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে কলেক্টর হইতে ডেপুটী কলেক্টর ও জজ হইতে মুনসেফের অফিস ইত্যাদি সকল অফিসই বসিতেছে।

২৭শ। প্রসিদ্ধ 'আনন্দমহল'—আর্ক-কেল্লার মধ্যস্থলে ইব্রাহিম আদিল শাহ (২য়) কর্ত্তৃক ১৫৮৯ খৃঃ নির্ম্মিত হয়। ইহা একটি উৎকৃষ্ট প্রাসাদ। ইহার একাংশে প্রথম সহকারী কলেক্টর ও অপরাংশে জেলার জজের আবাসস্থান নিরূপিত হইয়াছে।

২৮শ। 'গগনমহল'—ইহা আনন্দমহলের ৩০০ শত গজ পশ্চিমে ও আর্ক-কেল্লার পশ্চিম দেওয়ালের নিকটে। আলি আদিল শাহ (১ম) ১৫৬০ খৃঃ ইহা নির্ম্মাণ করেন। সাতমজলির নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সুলতানেরা এই প্রাসাদে বাস করিতেন, ইহাতে ৬২ ফুট প্রশস্ত একটি খিলান রহিয়াছে। সাত-

মজলি নির্ম্মাণের পর গগনমহল দরবারগৃহে পরিণত হয়। গগনমহলের সম্মুখে পাঁচটী পুরাতন বৃহৎ কামান রহিয়াছে।

২৯শ। গগনমহলের প্রসিদ্ধ তোরণগৃহকে ইংরাজ অধিবাসীদিগের উপাসনালয়ে পরিণত করা হইয়াছে। ইহার ভিতরের পঙ্কের কার্য্যের উপর গিল্টির কাজ অদ্যাপি সমভাবে থাকিয়া, তখনকার শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে।

৩০শ। আনন্দমহলের ৭০০ শত গজ পূর্ব্ব উত্তরে 'আদালত' মহল। উহা পূর্ণ সংস্কৃত হইয়া, কলেক্টরের আবাসভবনে পরিণত হইয়াছে।

৩১শ। আদালত মহলের ৩০ গজ পূর্ব্ব দক্ষিণে 'অরস' মহল পূর্ণ সংস্কৃত হইয়া, সিভিল সার্জ্জন সাহেবের আবাসগৃহে পরিণত হইয়াছে।

৩২শ। 'আসরসরিফ'—পূর্ব্বে উহা বিচারালয় ছিল। তখন উহাকে আদালত মহল কহিত। সুলতান মহম্মদের সময়ে ১৬৪৬ খৃঃ উহা নির্ম্মিত হয়। উহার পার্শ্বের একটি গৃহে পেগম্বর মহম্মদের দুইটি কেশ সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। উহার মধ্যস্থলের হলটী ১৩৫ ফুট দীর্ঘ ও ১০০ শত ফুট প্রশস্ত। সম্মুখে বারাণ্ডা ১২০ ফুট

দীর্ঘ ও ৩৩ফুট প্রশস্ত। সাম্‌নে একটি পাকা পুষ্করণীতে ফোয়ারার বন্দোবস্ত রহিয়াছে।

৩৩শ। আর্ককেল্লার পশ্চিমদিকে ও পরিখার ধারে পিপল বৃক্ষের নীচে 'নরসোবাদেবের' ক্ষুদ্র মন্দির। লোকের ধারণা এই, ভগবান্‌ দত্তাত্রেয় নর-সোবারূপে তথায় অবস্থিতি করিতেছেন এবং তাঁহার কৃপায় ইব্রাহিম আদিলশাহ (২য়) দুশ্চিকিৎস্য পীড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, হিন্দুর ন্যায় জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

৩৪শ। 'তাজবাউড়ী'—দুর্গের পশ্চিম দিকে ও মেক্কা দরজা হইতে ১৭০ গজ দূরে হইবে। ইব্রাহিম মালিক গণ্ডাল ১৬২০ অব্দে এই প্রসিদ্ধ বাউড়ি নির্ম্মাণ করিয়া তাজবিবির নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন, ইহা দীর্ঘে ও প্রস্থে ২২৩ ফুট এবং ৫২ ফুট গভীর। ইহার চতুর্দ্দিকে বারেণ্ডা। উহাতে আগন্তুকেরা আসিয়া স্নান পাইত। ইহার জল খারবিশিষ্ট, অতএব ব্যবহারোপ-যোগী নহে।

৩৫শ। 'ইব্রাহিম রোজা'—ইব্রাহিম আদিল শাহ (২য়)র সমাধিমন্দির। দুর্গ বহির্ভাগে মেক্কা দরজা দিয়া নরাসপুরের দিকে যে রাজবর্ত্ম গিয়াছে, তাহার ২০০

শত গজ দূরে অবস্থিত। ইহার তিন দিকে প্রশস্ত উদ্যান; ১৬১৪ অব্দে আরম্ভ হইয়া পূর্ব্বোক্ত মালিক গণ্ডালের তত্ত্বাবধানে ১৬২৬ অব্দে নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হয়। চত্বরের দেওয়াল দীর্ঘে প্রস্থে ৪০০ শত ফুট; উত্তরদিকে প্রবেশদ্বার। ভিতরে উচ্চ প্ল্যাটফরমের এক দিকে সমাধি মন্দির ও অপর দিকে ভজনালয়। সমাধিমন্দিরের বহির্ভাগ দীর্ঘে প্রস্থে ১১৬ ফুট ও মধ্যস্থলের গৃহটী দীর্ঘে প্রস্থে ৫৪ ফুট; ইহার নির্ম্মাণে ৫লক্ষ ২৮ হাজার টাকার উপর ব্যয় হইয়াছিল। সম্মুখের উপাসনালয় ১১৬ ফুট দীর্ঘ ও ৬৬ ফুট প্রশস্ত। ইহাতে প্রস্তরের শিকল রহিয়াছে, অর্থাৎ এক খণ্ড প্রস্তর হইতে শিকল প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

৩৬শ। 'শাহ-রাজু-গম্বুজ' —মতি-গম্বুজে যাইতে রাস্তার বামদিকে, ক্ষুদ্র হইলেও গঠন নিতান্ত অপরিস্কার নহে। ইনি ইব্রাহিম আদিল শাহ (২য়)র উজীর ছিলেন।

৩৭শ। 'মতিগম্বুজ'—পীরমৌলবী হবিবুল্লার সমাধি মন্দির, ইহার আকৃতি অতি ক্ষুদ্র হইলেও, ভিতরের পঙ্কের কার্য্য অতি পরিপাটী বলিয়া, মতিগম্বুজ নামে অভিহিত হইতেছে।

৩৮শ। হাইদার-আলির সমাধিমন্দির গতি-গুম্ব-জের ২০০শত গজ দক্ষিণদিকে। ইহার ভিতরের সমাধি-প্রস্তর মরকত বসন্ত প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই নিমিত্ত উহার পালিশ অতি উত্তম। হাইদার (১ম) আলি-আদিল-শাহর প্রসিদ্ধ সেনানায়ক ছিল।

৩৯শ। পূর্ব্বোক্ত দুইটি সমাধি-মন্দিরের কিঞ্চিৎ পশ্চিমভাগে জমি-শাহর সমাধি-মন্দির। ইনি ইব্রাহিম আদিল-শাহর উজীর ছিলেন। সমাধি-মন্দিরটী ক্ষুদ্র হইলেও, গঠনে মন্দ নহে।

৪০শ। মালিক রাহানের সমাধি-মন্দির কেল্লার পশ্চিম উত্তর দিকে, সহরতলি সাহপুরের মধ্যে, সুলতান সেকেন্দারের সময়ে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

৪১শ। উজীরশাহ নবজখাঁর সমাধি-মন্দির। উহার সম্মুখে দ্বাদশটী স্তম্ভ থাকাতে, উহা বারখাম্বা সমাধি-মন্দির নামে কথিত হইয়া থাকে। উহা সহর হইতে ১৫০০শত গজ পশ্চিমে হইবে।

৪২শ। পীর আমন সাহেবের সমাধি-মন্দির। দুর্গ হইতে দুই মাইল পশ্চিম উত্তরে হইবে। মুসলমান পরিদর্শকমাত্রেই উহা পরিদর্শন করিয়া থাকে।

৪৩শ। অরঙ্গেব বাদশাহের ইদ্‌গা। ১৬৮৭ অব্দে অরঙ্গেব বাদশাহ এই ইদ্‌গা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার আয়তন দীর্ঘে ও প্রস্থে ১৩০ গজ। এক্ষণে উহা পুলিশ লাইনে পরিণত হইয়াছে।

৪৪শ। বিজয়পুরের জলকষ্ট দূর করিবার অভি-প্রায়ে (১ম) আলি-আদিল-শাহ শাহপুর সহরতলিতে বৃহৎ চাঁদবাউড়ি খনন ও তথা হইতে পাকা পয়োনালা প্রস্তুত করিয়া, দুর্গাভ্যন্তরে জল আনিবার সুবিধা করেন এবং বিজয়পুরের ৩ মাইল পশ্চিম দিকে তরবি সহরতলির এক মাইল দূরে একটি নদীর উপর বৃহৎ উচ্চ পাকা বাঁধ নির্ম্মাণ করত বৃহৎ হ্রদে পরিণত করিয়া-ছিলেন। পাকা অনাবৃত নালার সাহায্যে তথা হইতে জল তর্‌বির অর্দ্ধ মাইল দূর পর্য্যন্ত আনীত হয়। পরে তথা হইতে পাকা কবুড়ইট ঢাকা নল দ্বারা দুর্গের ভিতর আনয়ন করা হইয়াছিল। মামুদ-শাহর রাজত্বের সময়ে দুর্গের দক্ষিণ দিকে আর একটি হ্রদ নির্ম্মিত এবং তথা হইতে ১৫ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট পাইপ পাকা গাঁথিয়া ১৫ হইতে ৫০ ফুট জমীর ভিতর দিয়া, আর্ক-কেল্লার নিকট জল আনীত হয়। ঐ স্থান হইতে পাইপ সাহায্যে সমস্ত প্রাসাদে জল প্রদত্ত হইত। পূর্ব্বোক্ত হ্রদ ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে

মামুদ কর্ত্তৃক আপন বেগম জাহানের নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তদবধি উক্ত হ্রদ বেগমহ্রদ নামে কথিত হইতেছে। মামুদ-শাহ অনেকগুলি উদ্যান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই সময়ে আদিল-শাহিদিগের চরম উন্নতি হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

সময়াভাবে আমরা নিম্নের কয়েকটি দর্শন করিতে সমর্থ হই নাই।

১। বেগম সাহেবের সমাধিগৃহ।

২। হাজিহোসেন সাহেবের সমাধিগৃহ।

৩। হমেদ খাঁদের সাহেবের সমাধিগৃহ।

৪। আকুৎ দাবুলি সাহেবের সমাধিগৃহ।

৫। অয়েন উল্‌মুল্ক সাহেবের সমাধিগৃহ।

৬। সঙ্গৎমহল। সহরতলি নরাশপুরের মধ্যে ৪ মাইল দূরে।

৭। আলি সাহেবের উপাসনালয় মেথরমহলের ১৫০ গজ দক্ষিণে হইবে।

৮। মালিক করিম্ সাহেবের মস্ক।

৯। খাজাজাহান সাহেবের মস্ক।

১০। প্রসিদ্ধ বেগম সাহেবের হ্রদ।

পরিশিষ্ট।

আমরা প্রত্যাগমনকালে, গোদাবরী, কাকনাড়া, কোটিফলি ও দক্ষারাম প্রভৃতি কয়েকটী স্থান দর্শন করিয়া তাহাদিগের সম্বন্ধে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইতেছে।

৩ পৃষ্ঠা। কিংবদন্তী আছে যে, কমবেশ পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে রাজমহেন্দ্রীর অন্ধ্রবংশীয় কুলোত্তুঙ্গ চোলরাজ বারাণসী যাইবার কালে পুরুষোত্তমের পথ হইয়া যান। পথিমধ্যে বিশাখপত্তনে পটাবাস স্থাপনপূর্ব্বক কয়েক দিবস অতিবাহিত করেন। তৎকালেই, বিশাখস্বামীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এক্ষণে যাহাকে লক্ষণ উপসাগর কহে, তাহারই মধ্যে তীর্থপুরুলুতে (তীর্থপুর) উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

৪৭ পৃষ্ঠা। স্কন্দপুরাণান্তর্গত ভীমখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়, বেদব্যাস সশিষ্যে সিংহাচলে আসিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা করিয়াছিলেন। যথা,—

"ততঃ সিংহাচলং গত্বা সর্ব্বপাপবিনাশনম্।
দেবৈশ্চ মুনিভির্ম্মর্ত্ত্যৈঃ সর্ব্বৈঃ সেব্যমনারতম্॥
গঙ্গাসদৃশপুণ্যাম্বুধারানূপনিতম্বকম্।
কুন্দচন্দনমন্দারচাম্পেয়াদিবনাকুলম্॥
লক্ষ্মীবিদ্যান্বিতাযুক্তভগবন্নারদাশ্রমম্।
উত্তমং সর্ব্বশৈলানাং সর্ব্বসিদ্ধিকরং নৃণাম্॥
আকাশচুম্বিশিখরং নিত্যোৎসবসমন্বিতম্।
তত্র দেবং জগন্নাথং শ্রীনৃসিংহং দয়ানিধিম্॥
ভক্তোপকারিণং নিত্যমার্ত্তত্রাণপরায়ণম্।

দৃষ্ট্বা নত্বা পুনর্নত্বা স্তুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ।
প্রসাদচন্দনেনাভূৎ শ্রীনৃসিংহপ্রভোস্তদা ॥*

৪৮ পৃষ্ঠা। কৃষ্ণদেব রয়ালু প্রদত্ত অনুশাসন মন্দিরের সপ্তম স্তম্ভে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। যথা,—

শুভমস্তু শ্রীমন্ মহারাজাধিরাজা পরমেশ্বর, মুররায়ার গণ্ডা, আদিরায়া, বিজয়ভাষা গীতা প্রবর রায়ার, গণ্ডা যবনরাজ্য সংস্থাপনাচার্য্য শ্রীবীরপ্রতাপ কৃষ্ণদেব মহারায়ালু বিজয়নগরাণা সিংহাসনশ্চূড় পূর্ব্বদিগ্বিজয় যাত্রাকু বিচ্চেসি উদয়গিরি, কোণ্ডা বিড়ু কোণ্ডাপল্লী, রাজমহেন্দ্রবরম্ মদনৈন দুর্গালু স্বাধিক্কি সিংহাদ্রিকি বিচ্চেসিক্কি। স্বস্তি শ্রীবিজয়াভ্যুদয়া শালিবাহন বর্ষ মুলু ১৪৩৮ আগুনেটী ধাতা সংবৎসরে চৈত্র বহুলা দ্বাদশী স্থির বারণা সিংহাদ্রিনাথ দর্শেক্কি, তমতারি নাগাদেবাম্মা গারকিন্নী, তমতাণ্ডি নরসুরায়ানি গারকিন্নী পুণ্যমুগাসুদেবাকী সমর্পিক্কিনা কণ্ঠমালা ওকেটি মুক্তালু ৯৯১, বজ্রমাণিক্যালু কড়িয়ান যোড়ু ওকেটী শঙ্খচক্রালা, পতক্ ওকেটি, পয়ডিপাল্যম ওকেটি নিভুকালু ৪৪২৯২ কানিমাড়ালু ২০০০, তমাদেবী ছিন্না দেবাম্মা গারু, চেত্তানু সমর্পিক্কিনা পতকং ওকেটী ৫০০, তিরুমল দেবাম্মা, গারু চেত্তমু সমর্পিক্কিনা, পতকং ওকেটিন্টিকি ৫০০, হস্তমট্টকু সমর্পিক্কিনা ধর্ম্মশাসনমু।

ইহার অনুবাদ যথা,—

শুভমস্তু শ্রীমন্ মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর (শ্রেষ্ঠ) তিন রায়ার শ্রেষ্ঠ প্রধান রায়া বিজয়-ভাষা-সঙ্গীত-প্রবর রায়া যবনরাজ্যের সীমা-নির্দ্দেষ্টা শ্রীমৎ বীরপ্রতাপ মহারাজ কৃষ্ণদেব বিজয়নগর সিংহাসনারূঢ় হইয়া পূর্ব্বদিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া সদুর্গ উদয়গিরি, কোণ্ডাবিডু, কোণ্ডাপল্লী ও রাজমহেন্দ্রবরম্ আদি জয় করিয়া সিংহাদ্রিতে আইসেন। তথায় ১৪৩৮ শালিবাহন অব্দে ধাতা সংবৎসরে চৈত্রকৃষ্ণ দ্বাদশী তিথির শনিবার

সিংহাদ্রিনাথ দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার মাতা নাগদেবাম্মা ও পিতা নরস্থ রায়ালুর পারত্রিক উদ্ধারের কামনায় বরাহ নৃসিংহ-দেব স্বামীকে ৯৯১ মুক্তা খচিত কণ্ঠমালা, বজ্রমাণিক্য খচিত বলয়, শঙ্খচক্র বিরাজিত পতক ও স্বর্ণপাত্র, একুনে ৪৪৭৯২ পেগোডা মূল্যের (একটী পেগোডার মূল্য ৩৷৹ টাকা।) ও নগদ সহস্র পেগোডা ও অধিকন্তু তাহার পাটরাণী ছিন্নাদেবাম্মাগারু ও তিরুমল দেবাম্মাগারু প্রত্যেকে ৫০০ পেগোডা মূল্যের দুইটী পতক প্রদান করেন।

৬১ পৃষ্ঠা। কাকনাড়া। আমরা ১৮৯২ খৃঃ অক্টোবরের কতি-পয় দিবস তথায় অতিবাহিত করি। নামের উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, কাকরূপধারী অসুর সীতাদেবীকে আক্রমণ করিলে তৎপাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের শরকে এক চক্ষু দিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহা রামায়ণে সবিস্তার বর্ণিত আছে। সেই কাকাসুরের বাটী এই স্থানে ছিল; কাক্+নাড়া (প্রদেশ।) অতএব কাকাসুরের দেশ। সে যাহা হউক, কাকনাড়া পূর্ব্ব ঔপকূলিক বন্দর; অনেক দিন ধরিয়া গোদাবরী ডিষ্ট্রীক্টের হেড্‌কোয়াটর। সামান্য নগর হইতে ক্রমে বর্দ্ধিষ্ঠ হইয়া ঔপকূলিক প্রধান নগরে পরিণত হইয়াছে।

১৬৮ পৃষ্ঠা। স্কন্দপুরাণান্তর্গত ভীমখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে দৃষ্ট হয় যে, বাদরায়ণ সশিষ্যো পীঠপুর সন্দর্শন করিয়াছিলেন। যথা,

"কাশীবিয়োগসন্তপ্তো বিধুরো বাদরায়ণঃ।
অথ বিন্ধ্যাচলপ্রান্তে ত্রিলিঙ্গোৎকলদেশয়োঃ॥
সন্ধৌ সমীপে শ্রীভীমমণ্ডলস্য পুরোত্তমম্।
পীঠপুরং মুনিবরো নিজশিষ্যৈঃ সহাবিশৎ॥

* * * *

অথ ভজত মৌলিষু দেবেশং ভক্তবৎসলম্।
বিশ্বাত্মকং মহাভাগং শাশ্বতং কুক্কুটেশ্বরম্॥

পীঠাম্বিকাসখীং দুর্গাং দৈত্যসেনাবিদারিণীম্।
হুঙ্কারিণীং মহাশক্তিমসেবত শিবপ্রিয়াম্ ॥
সর্ব্বেশ্চারাধয়ামাস পুরঃক্ষেত্রাধিদেবতাম্।
সকুন্তীমাধবং দেবং পূজয়ামাস বাক্‌স্তবৈঃ ॥
এলাশক্তিং মহাদেবীমেলাতীরনিবাসিনীম্।
প্রসন্নাং রূপসম্পন্নাং তুষ্টাব মুনিপুঙ্গবঃ ॥”

পদগয়া সম্বন্ধে আরও একটী পৌরাণিক ইতিহাস শুনিলাম। গয়াসুর নিধন হইলে তাহার দেহ তিন অংশে বিভক্ত হইয়া তিন স্থানে পতিত হয়। পদদ্বয় পীঠাপুরে, নাভি কটকের অন্তর্গত যাজপুরে এবং মস্তক বুদ্ধগয়ার নিকটে পতিত হয়। বিষ্ণুর বরে উক্ত তিন স্থানই পুণ্যক্ষেত্র হইয়াছে, এবং তিন স্থানেই লোকে পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ড দান করিয়া থাকে; এ প্রদেশে অনেকেই গয়াত্রয়ে অর্থাৎ পীঠাপুরে, যাজপুরে এবং ফল্গুনদী তীরস্থ শীর্ষগয়াতে পিণ্ডদান করিয়া থাকে।

১৭০ পৃষ্ঠা। স্কন্দপুরাণান্তর্গত ভীমখণ্ডে দেখা যায় মহর্ষি বাদরায়ণ কুমারারামে আসিয়াছিলেন। যথা, তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তে।

“বিলোকয়ামাস ততঃ কুমারারামমুত্তমম্।
বিন্ধ্যোপকণ্ঠে জগতি ললাম লোচনোৎসবম্ ॥
বহুক্রীড়াবনশ্যামমভিরামং সরোবরৈঃ।
প্রাকারভাস্বরং ভূরিদেবাগারবিরাজিতম্ ॥
গণেশবীরভদ্রাদিদেবতাশ্রেণিশোভিতম্।
ধামাগ্রভীমজুটেন্দুচন্দ্রিকাধৌতসৌধকম্ ॥

* * * *

কুমারনদ্যাং দিব্যায়াং স্নাত্বা ভুক্ত্বা মুনীশ্বরঃ ॥
ননাম শিষ্যসহিতো ভীমেশং স মুনীশ্বরঃ ॥”

১৭১ পৃষ্ঠা। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত গৌতমীমাহাত্ম্য একটি বৃহৎ গ্রন্থ। সম্প্রতি ইহা তেলুগু অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। স্বয়ং ব্রহ্মা বক্তা, শ্রোতা দেবর্ষি নারদ। ভাগীরথী যেমন পুণ্যতোয়া গঙ্গা, গৌতমীও তেমনি দ্বিতীয় গঙ্গা। ভাগীরথীর উৎপত্তির বিষয় সকলেই জ্ঞাত আছেন; গৌতমী গঙ্গার পৌরাণিকী ইতিহাস পূর্ব্বোক্ত গৌতমীমাহাত্ম্য হইতে প্রদত্ত হইল।

দক্ষিণ প্রদেশের যাত্রীরা কাশীস্থ বিশ্বেশ্বর দর্শনে আসিয়া, এক কলস গঙ্গাজল লইয়া যায়। সেই গঙ্গাজল রাজমহেন্দ্র-বরমের সন্নিকট কোটি লিঙ্গের অভিষেকে অর্দ্ধ প্রদান করে। অপর অর্দ্ধ কলস গৌতমীর জলে পূর্ণ করিয়া, সেতুস্থ রামেশ্বরে রামনাথের অভিষেকের কারণ লইয়া যায়।

গৌতম ঋষি ব্রহ্মগিরির আশ্রমে অবস্থিতি করিবার কালে কোন সময় দ্বাদশবর্ষীয় অনাবৃষ্টিজনিত আপৎকাল উপস্থিত হয়। তাহাতে সর্ব্বত্র অন্নাভাব হইলে, বশিষ্ঠাদি অপর ঋষিরা গৌতমের আশ্রমে উপস্থিত হয়েন এবং গৌতম ঋষিদিগকে অন্ন দিতে থাকেন। প্রত্যহ প্রাতে ঋষিবর প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্বয়ং ক্ষেত্রে বীজবপন করিয়া পূজায় বসিতেন। তাহার তপঃপ্রভাবে সেই বীজ হইতে অঙ্কুর, গাছ, তৎপরে ফল হইয়া, তৃতীয় প্রহরে শস্য পাকিত। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে সেই শস্য কাটিয়া মাড়িয়া, তণ্ডুল প্রস্তুত হইত। সেই তণ্ডুল পাক হইলে, অপর ঋষিরা আহার করিতেন। এইরূপে গৌতম ঋষি আপৎকালে অপর ঋষিদিগকে অন্ন প্রদান করিয়াছিলেন। দ্বাদশ বৎসরান্তে সুবৃষ্টি হইলে, বসুন্ধরা শস্যশালিনী হইয়া, সর্ব্বত্র সুপ্রতুল করিয়াছিলেন।

সেই সময়ে কৈলাসশিখরে আর একটি ঘটনা উপস্থিত হয়। মহাদেব গঙ্গাকে জটায় ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া, পার্ব্বতী ঈর্ষান্বিতা হইয়া, মহাদেবকে এই বিষয় অনুরোধ করেন যে,

তুমি গঙ্গাকে মস্তকে, আর আমাকে উরুদেশে ধারণ করিয়াছ। ইহাতে আমার অবমাননা করা হইতেছে। অতএব, গঙ্গাকে মস্তক হইতে নিক্ষেপ কর। মহাদেব তাহা শুনিয়া, কিছুই করিলেন না। পার্ব্বতী তাহাতে দুঃখিতা হইয়া, গণেশকে আপন দুঃখের কথা কহিলে, বিনায়ক মাতার দুঃখের প্রতীকার করিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন। অনন্তর, অনুজ ষড়াননের সহিত গৌতম ঋষির আশ্রমের বহির্দ্দেশে আসিয়া, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া, গৌতমান্নে প্রতিপালিত ঋষিগণকে সন্দর্শন করত কহিলেন, ভো! ভো! ব্রাহ্মণগণ! এখন সুবৃষ্টি হইতেছে, সর্ব্বত্রই সুশস্য জন্মিয়াছে, আর গৌতমের অন্নে তোমাদের পালিত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে, অতএব স্ব স্ব আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হও।

অনন্তর, ঋষিরা গৌতমের সমীপে আসিয়া বিদায় চাহিলে গৌতম তাহাতে কহিল; ঋষিগণ! আপৎকালে অন্ন দিয়াছি, এখন বসুন্ধরা শস্য-শালিনী বলিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাওয়া তোমাদিগের উচিত নহে, তোমরা আমার আশ্রমে থাকিয়া কালাতিপাত কর। অনন্তর, ঋষিদিগের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহারা গৌতম-ভাষিত সমস্ত কথা তাঁহাকে কহিলেন। ব্রাহ্মণরূপধারী বিনায়ক তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ঋষিগণ! মহর্ষি গৌতম তোমাদিগকে যাইতে দিবেন না তাহা পূর্ব্বেই জানিতাম। তপঃপ্রভাবে তিনি অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ। এক্ষণে, লোকোপকারের কারণ তাঁহার দ্বারায় একটী অসাধ্য কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হইবে। তখন তিনি তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ষড়াননকে কহিলেন, তুমি দুগ্ধবতী গো হইয়া গৌতমের ক্ষেত্রে যাইয়া সমস্ত শস্য নষ্ট কর। গৌতম শস্য সংগ্রহ করিতে আসিলে সমস্ত শস্য নষ্ট দেখিয়া ক্রোধে তোমাকে তাড়না করিলে তুমি মৃতবৎ পড়িয়া থাকিবে।

তখন ষড়ানন গাভী রূপ ধারণ করিয়া গৌতমক্ষেত্রে যাইয়া সমস্ত শস্য নষ্ট করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। এদিকে ঋষিবর তৃতীয় প্রহরে স্বক্ষেত্রে শস্য সংগ্রহ করিতে আসিয়া গাভীকে শস্যক্ষেত্রে বিচরণ করিত এবং সমস্ত শস্য নষ্ট হইতে দেখিয়া হা কষ্ট বলিয়া গাভীকে যেমন তাড়না করিলেন গাভীও তৎক্ষণাৎ মৃতবৎ পতিত হইল।

অনন্তর, আশ্রমে গোহত্যা হইয়াছে শুনিয়া ঋষিরা অন্যত্র যাইতে উপক্রম করিল, গৌতম তাহাদিগের মনের ভাব জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইল। ঋষিরা মহামায়ার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কহিল, হে গৌতম তুমি আমাদিগকে আপৎকালে অন্ন দিয়াছ তাহা সত্য, আমরা এত দিন তোমার আশ্রিত ছিলাম, কিন্তু যে আশ্রমে গোহত্যা হইয়াছে তথায় কি প্রকারে থাকিতে পারি। যে যোগপ্রভাবে তুমি প্রত্যহ এতাবৎ কাল শস্য উৎপাদন করিয়াছ সেই যোগপ্রভাবে গাভীর জীবন দান দাও। তুমি ভগীরথের মতন হরমস্তকস্থিত গঙ্গা আনয়ন করিয়া ইহাকে পুনর্জীবিত কর। গৌতম ঋষিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্যানযোগে সমস্তই মহামায়ার মায়া সন্দর্শন করিয়া কহিলেন; ঋষিগণ! তোমরা এই আশ্রমে অপেক্ষা কর। আমি গঙ্গাকে আনয়ন করিতে যাই। অনন্তর, ত্র্যম্বক পাহাড়ে প্রস্থান করিয়া ত্র্যম্বকেশ্বর গঙ্গাধর, পার্ব্বতী ও গঙ্গার পৃথক্ পৃথক্ তপস্যা করিলেন ও প্রত্যেককেই পৃথক্ পৃথক্ স্তোত্রে সন্তুষ্ট করিলেন। তথায় ত্র্যম্বকেশ্বর পার্ব্বতীর সহিত বৃষভারোহণে আসিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইলেন। গৌতম তাহাদিগকে সন্দর্শন করিয়া প্রফুল্ল মনে কৃতাঞ্জলিপুটে পুনরায় স্তুতি করিয়া প্রণাম করিলেন। তখন ভগবান্ ত্র্যম্বকেশ্বর প্রীত হইয়া কহিলেন, বৎস গৌতম! তোমার তপস্যায় পূর্ব্বেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, এখন আবার তোমার নমস্কার স্তোত্রে প্রীত হইলাম।

তুমি এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। গৌতম কহিলেন, হে ভগবন্! আপনার দর্শনে আমার শত মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে। তবে, যখন আপনি বরদ হইয়া আসিয়াছেন তখন আপনার জটাস্থিত গঙ্গাকে প্রদান করুন, আমি উহা লইয়া ব্রহ্মগিরি আশ্রমের ক্ষেত্রস্থিত মৃত গাভীকে পুনর্জ্জীবিত করিব। ভগবান্ তথাস্তু বলিয়া কহিলেন, বৎস গৌতম! তুমি নিঃস্বার্থ হইয়া লোক হিতার্থে এই প্রার্থনা করিতেছ, এখন তোমার নিজের জন্য দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর। গৌতম কহিলেন, ভগবন্! যদি দ্বিতীয় বর দিতে একান্ত অভিলাষী হন তবে আমার কৃত এই নমস্কার স্তোত্র পাঠ করিয়া যে কেহ আপনাকে নমস্কার করিবে তাহার সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধ হইবে এই আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা। ভগবান্ তথাস্তু বলিয়া কহিলেন, বৎস গৌতম! ইহাও লোক হিতার্থে প্রার্থনা করিলে অতএব তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। গৌতম কহিলেন, ভগবন্! এই গঙ্গা আমার আশ্রম দিয়া প্রবাহিত হইয়া মৃত গাভীকে পুনর্জ্জীবিত করত সাগরে পতিত হইয়া উহা আমার নামে বিখ্যাত হউক এবং উহার উভয় তীর পুণ্যতীর্থ হউক ও উভয় তীরে আপনি লিঙ্গরূপে সর্ব্বত্র অবস্থিতি করুন্। মহাদেব তথাস্তু বলিয়া কহিলেন, তুমি তিনটী বরই লোক হিতার্থে চাহিলে, যাহা হউক ইহা গৌতমী গঙ্গা ও গোদাবরী নামে বিখ্যাতা হইবে। আর, ভাগীরথী সাগর-সঙ্গমে পুণ্যপ্রদ, যমুনা ত্রিবেণী-সঙ্গমে পুণ্যপ্রদ, নর্ম্মদা অমর-কণ্টকে পুণ্যপ্রদ, কিন্তু গৌতমী গঙ্গা সর্ব্বত্র পুণ্যপ্রদ হইবে ও আমি ইহার উভয় তীরে লিঙ্গরূপে অবস্থান করিব।

অনন্তর, মহাদেব মস্তকস্থ জটা সহিত গঙ্গাকে গৌতমের হস্তে প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন, গৌতম ঋষিও প্রীতমনে জটা লইয়া ব্রহ্মগিরির আশ্রমে আসিল। এখানে গঙ্গা ত্রিধারা হইয়া এক ধারায় ব্রহ্মগিরি গৌতমাশ্রমের উপর দিয়া প্রবাহিত

হইয়া মৃত গোকে পুনর্জীবিত করিয়া দক্ষিণ সাগরে পতিত হইল, অপর ধারা ব্রহ্মগিরি ভেদ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল তৃতীয় ধারা আকাশ মার্গে "বিয়ৎগঙ্গা" নামে প্রসিদ্ধ হইল। কলিতে উক্ত ধারা মানবের অদৃশ্য হইয়াছে।

যে স্থানে মহর্ষি গৌতমের ক্ষেত্র ছিল তাহা অদ্যাপি 'কবুর' নামে প্রসিদ্ধ হইতেছে। উহা 'গোপুরমের' অপভ্রংশ মাত্র। ইহা গৌতমীর পশ্চিম পারে রাজ-মহেন্দ্র-বরমের সম্মুখে অবস্থিত। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তথায় ভাঙ্গণ-মাটি পড়িলে তাহাতে অদ্যাপি গোক্ষুরের দাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কবুর গ্রামে অনেকগুলি বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস, সেখানে পূর্ব্ব ঔপকুলিক রেলের ষ্টেসন হইতেছে। এই গ্রামের উপর হইয়া গোদাবরীর লৌহসেতু প্রস্তুত হইবার কথা হইয়াছে। কবুরের উত্তর ৬ মাইল দূরে একটী ক্ষুদ্র পাহাড় ব্রহ্মগিরি নামে খ্যাত, তাহাই পুরাণোল্লিখিত ব্রহ্মগিরি গৌতমাশ্রম।

ধবলেশ্বরের গৌতমী-খেয়াঘাটের সন্নিকট পাহাড়ের উপরস্থ বিষ্ণুধাম জনার্দ্দন স্বামী নামে অভিহিত। পাহাড়ে উঠিবার সোপান অতি পরিষ্কার। ধবলেশ্বরের অপর পারে বিজয়েশ্বর-গণ্ডগ্রামে বিজয়েশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। ধবলেশ্বর বিজয়েশ্বর হইতে গৌতমী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। উত্তর ভাগের স্রোত গৌতমী ; দক্ষিণদিকের স্রোত বশিষ্টা। গৌতমীর উত্তর ভাগে তুল্যা আত্রেয়ী ও ভারদ্বাজী শাখানদীত্রয় এবং দক্ষিণদিক হইতে বৃদ্ধগৌতমী শাখারূপে প্রবাহিত হইয়া, বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। বশিষ্ঠার বাম তীর হইতে কৌশিকী নামে শাখা নদী প্রবাহিত হইয়াছে। ইহাদিগের সঙ্গমস্থল সপ্ত গোদাবরী নামে বিখ্যাত। যেমন বঙ্গদেশে ভাগিরথী-সাগর-সঙ্গম পুণ্যতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত, সেইরূপ দাক্ষিণাত্যে সপ্ত গোদাবরী-

সাগর-সঙ্গম পুণ্যতীর্থ। তথায় মাঘমাসে ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক অনেকেই স্নান করিয়া থাকেন। অতএব, সপ্ত-গোদাবরী-সঙ্গম উৎপত্তির বিষয় ও তাহার মাহাত্ম্য ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত গৌতমীমাহাত্ম্য হইতে প্রদত্ত হইতেছে।

"তুল্যাত্রেয়ী ভারদ্বাজী গৌতমী বৃদ্ধগৌতমী।
কৌশিকী চ বশিষ্ঠা চ সপ্ত ভাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তেষাং নামানি মুনিভির্নির্দ্দিষ্টানি স্বনামভিঃ॥"

১। তুল্যাসঙ্গম। উহা সপ্ত-গোদাবরী-সাগর-সঙ্গম-মাহাত্ম্যের প্রথমাধ্যায়ে বর্ণিত আছে। উহা আপাততঃ কাকনাড়া হইতে দুই মাইল দূরে চোল্লঙ্গী গ্রামের নিকট বর্ত্তমান। ইহার নামোৎপত্তির বিষয়ে এইরূপ বিবরণ আছে। যথা,—

"সপ্তভির্গৌতমীভির্যৎ ফলন্তু কথিতং মহৎ।
একত্রৈব তু তৎ পুণ্যং তুল্যায়াঃ সঙ্গমে ভবেৎ॥
তস্মাৎ সা তুল্যাভাগেতি নাম্না খ্যাতাভবৎ ভুবি।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি বহুজন্মার্জ্জিতান্যপি।
স্নাত্বা তত্র বিমুচ্যেত সদৈব তু ন সংশয়ঃ॥"

চন্দ্র রোহিণীতে একান্ত আসক্ত ছিলেন, এজন্য অপর ষড়্‌বিংশতি স্বপত্নীদিগের উত্তেজনায় দক্ষ কর্ত্তৃক তিনি অভিশপ্ত হইয়া, ক্ষয়রোগ প্রাপ্ত হয়েন। অনন্তর, শাপমুক্তির নিমিত্ত বিষ্ণুর তপস্যা করেন। বিষ্ণু তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, চন্দ্রমাকে তুল্যার সঙ্গমে স্নান করিতে আদেশ দেন। চন্দ্রও তুল্যাসঙ্গমে দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিয়া, লিঙ্গ স্থাপন করণান্তর সঙ্গম-স্নান ও লিঙ্গপূজা করিয়া, দক্ষ শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন।

মাঘ, ফাল্গুন অথবা বৈশাখমাসে গৌতমী-সঙ্গমে যাত্রাবিধি উক্ত হইয়াছে। মাঘমাসের সোমবার অমাবস্যা হইলে, তুল্যা-সঙ্গমে স্নান করিয়া, সোমেশ্বর পূজা করিলে, কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে। সঙ্গমস্থলে মুণ্ডন করিয়া স্নান ও তৎপর দিবস

পুনঃ স্নান করিয়া পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধ করণানন্তর ব্রাহ্মণকে দান এবং ঈশ্বরের পূজা করিলে, দশ অশ্বমেধের ফল ও সহস্র জন্মের দুষ্কৃতি বিনষ্ট হয়। বর্ত্তমান সঙ্গমস্থলে চোল্লঙ্গীশ্বর মহাদেব বিরাজ করিতেছেন।

২। আত্রেয়ী। এই আত্রেয়ী-সঙ্গম কুরঙ্গনামক পুরাতন বন্দরের সন্নিকটস্থ উহা গৌতমীর উত্তর তীরে অবস্থিত। আত্রেয় ঋষি গৌতমী হইতে যে নদী আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাই স্বনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। উহার তীরে তিনি ইন্দ্রত্ব লাভ করিবার জন্য যাগ করিয়াছিলেন। কুরঙ্গ নামের উৎপত্তির বিষয় এইরূপ কথিত আছে। যথা,—

"যত্র পূর্ব্বং দুরাত্মা বৈ মারীচো নাম রাক্ষসঃ।
চক্রে কুরঙ্গরূপেণ তপঃ পরমদারুণম্॥
তস্য প্রসন্নো ভগবান্ মহাদেবঃ কৃপানিধিঃ।
তন্নাম্না প্রথিতস্তস্থাবাত্রেয়ীসঙ্গমো দ্বিজ॥
তত্র গত্বা ত্রিপুত্রো বৈ কুর্ব্বংস্তস্য প্রপূজনম্।
চকার যজ্ঞং ধর্ম্মাত্মা তত্র দেবাঃ সমাগতাঃ॥
বর্ত্তমানে মহাযজ্ঞে দৃষ্ট্বা তান্ লজ্জিতোঽভবৎ॥"
"যত্র তীর্থে সমাখ্যাতঃ কুরঙ্গেশো মহান্ স্থিতঃ।
যস্মাৎ প্রসন্নো ভূত্বৈব মৃগরূপস্য রাক্ষসঃ॥
তস্মিন্ তীর্থে যেন স্নানং প্রাণিনা ক্রিয়তেঽঞ্জসা।
ইন্দ্রাশ্চ ভবিতারো বৈ সুমনঃসুখভাগিনঃ।
তত্র পঞ্চসহস্রাণি তীর্থান্যাহুর্মনীষিণঃ।
অস্মিন্ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যানি দশ দানানি নারদ!॥"

এখানে স্নান ও দশবিধ দান করিতে হয়। (দশবিধ দান পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।) যথায় মারীচ কুরঙ্গরূপে মহাদেবের তপস্যা করিয়াছিল তাহাই বর্ত্তমান কুরঙ্গ-বন্দর।

এক সময়ে শত শত সমুদ্রগামী পোত সকল তথা হইতে পণ্যদ্রব্য লইয়া বঙ্গোপসাগরের অন্যান্য ঔপকুলিক বন্দরে যাতায়াত করিত। কাবেরীর পলীমাটীতে বন্দরঘাট পুরিয়া আসিলে কাক্‌নাড়ার ও চামার্লকোটা নেভিগেসন্‌ কেনেল দ্বয় (চামার্লকোটা ও কাক্‌নাড়া কেনেল) কাক্‌নাড়ার সম্মুখস্থ এলানদীতে প্রবাহিত হইলে, গোদাবরী ডেলটার উদ্বৃত্ত ধান্যাদি উক্ত খালদ্বয় দ্বারা কাক্‌নাড়ায় আসিতে থাকিলে, পূর্ব্ব-ঔপকূলিক বৃটীশ ইণ্ডিয়ান্‌ নেভিগেসন্‌ ষ্টীমার সেই সকল উদ্‌বৃত্ত শস্যাদি অন্যত্র লইয়া যাইতে থাকিলে, কুরঙ্গ-বন্দরের কার্য্য কমিয়া আসিয়াছে। কুরঙ্গ-বন্দরে এখনও প্রাচীন বণিক-দিগের বাসস্থান দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার দুই মাইল উত্তর-দিকে 'তল্লরেবু' নামে অপর পুরাতন বন্দর আছে। এখান হইতেও শত শত সামুদ্রিক পোত অন্যত্র যাইত, ইহাও কুরঙ্গ-বন্দরের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে।

৩। ভারদ্বাজী-সঙ্গম। সপ্ত-গোদাবরী-সঙ্গম মাহাত্ম্যের তৃতীয় অধ্যায়ে ইহা সবিস্তার বর্ণিত আছে। উহার অপর নাম রেবতী-সঙ্গম। ভরদ্বাজ মুনি গৌতমীর পূর্ব্ব-তীর হইতে ঋষি-কুল্যা আনয়ন করিয়া, তাহার তীরে পুরাকালে তপস্যা করিতে থাকেন। রেবতী নামে তাহার এক কুৎসিতা, বিকৃতা, ভীষণা, বিবর্ণা, ভগিনী থাকে। সেই ভীষণা ভগিনী বয়ঃস্থা হইলে, তাহার পাণিগ্রহণ করিতে কেহই স্বীকৃত হয় নাই। কদাচিৎ ভরদ্বাজ মুনি আপন আশ্রমে বসিয়া ভগিনীর সম্প্রদান বিষয়ে নানাবিধ ভাবিতেছেন, এমন সময় ষোড়শ বর্ষীয় 'কণ' নামে সুন্দর ব্রাহ্মণকুমার আগত হইয়া, ভরদ্বাজ মুনির পাদস্পর্শ করণানন্তর তাহার শিষ্য হইতে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিল। ঋষিবর তাহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া কণকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া ক্রমে সমস্ত বিদ্যা দান করিলেন। পাঠান্তে সমাবর্ত্তনের

পূর্ব্বে 'কণ্ব' গুরুকে দক্ষিণার বিষয় প্রশ্ন করিলে ভরদ্বাজ তাহাকে কহিল তুমি এই কন্যার পাণিগ্রহণ কর, ইহাই আমার পক্ষে গুরুদক্ষিণা হইবে। 'কণ্ব' তৎশ্রবণে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, হে গুরো! শিষ্যত্বহেতু আমি আপনার ভৃত্যপদবাচ্য অথবা পুত্রস্থানীয়, অতএব এই সম্বন্ধ কি প্রকারে সঙ্ঘটন হইতে পারে? ভরদ্বাজ কহিলেন, হে 'কণ্ব' আমার কথা সত্য বলিয়া জানিও, তোমাকর্ত্তৃক এই কন্যার পাণিপীড়নই আমার গুরু দক্ষিণা হউক। 'কণ্ব' তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল। তখন ভরদ্বাজ মুনি শাস্ত্রোক্ত-বিধানে কণ্ব-হস্তে ভগিনীকে সম্প্রদান করিলেন। কণ্ব কুরূপিণী ভার্য্যার সহিত ভারদ্বাজী-সঙ্গমতীরে জগদীশ লিঙ্গস্থাপন ও পূজা করিয়া, তাহার বেদোক্ত স্তুতি করিলেন। ঈশ্বর তুষ্ট হইয়া, ভারদ্বাজী সঙ্গমে স্বস্ত্রীক স্নান করিতে আদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। উভয়ে সঙ্গমস্থলে স্নান করিল, পরন্তু রেবতী স্নান করিয়া উঠিবামাত্রই সুন্দরী ও সুশ্রী হইল। রেবতী ঐ সঙ্গমে স্নান করিয়া সুশ্রী হইয়াছিল বলিয়া তদা প্রভৃতি ইহা রেবতী-সঙ্গম নামে প্রসিদ্ধ হইল। তথায় স্নান করিয়া জগদীশের পূজা করিয়া গো আদি দশবিধ দান কর্ত্তব্য।

৪। গৌতমী-সঙ্গম। ইহা সপ্ত গোদাবরী মাহাত্ম্যের চতুর্থ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ইহার অপর নাম অহল্যা-সঙ্গম। অহল্যাতে ইন্দ্রের গমন জন্য গৌতম-শাপে ইন্দ্রের সহস্রাক্ষত্ব এবং অহল্যার পাষাণত্ব-প্রাপ্তি আদি বিবরণ রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সঙ্গম-মাহাত্ম্যে ঐ বিবরণ কিছু প্রভেদ দৃষ্ট হয়। অহল্যা স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার কন্যা অতি সুন্দরী ছিলেন, অতএব ইন্দ্র অগ্নি বরুণাদি দেবগণ ও দেবর্ষি প্রভৃতি তাহার করপ্রার্থী হইলেও তৎপিতা গৌতম ঋষিকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় তাহার করে অহল্যাকে সমর্পণ করেন।

তদনন্তর, গৌতম অহল্যাকে লইয়া ব্রহ্মগিরির আশ্রমে আসিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে থাকেন। কিন্তু পুরন্দর অহল্যার রূপে বিমুগ্ধ হইয়াছিল, স্বর্গ ত্যাগ করিয়া কু-অভিপ্রায়ে গৌতম আশ্রম সমীপে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া সময় প্রতীক্ষা করিতে থাকিল; এক দিবস ঋষিবর নিত্যকর্ম্মোপলক্ষে আশ্রম বহির্ভাগে গমন করিলে, ইন্দ্র সুযোগ বুঝিয়া গৌতমের রূপ ধারণ করত পর্ণশালায় আসিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিল; অহল্যা তাহাকে গৌতম ভাবিয়া প্রিয় সঙ্গমে কোন আপত্তি করিল না, পরন্তু গৌতমরূপধারী ইন্দ্র তাহাতে সংযত হইল। ইত্যবসরে স্বশিষ্যে গৌতম ঋষি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পূজোপকরণ না দেখিয়া গৌতমীর নামোচ্চারণ করিয়া ডাকিল। সুরতরত গৌতমরূপী ইন্দ্র অহল্যাকে কহিল, অন্য কোন শঠ আমার স্বর অনুকরণ করিতেছে। এ দিকে গৌতম ঋষি অহল্যাকে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে থাকিলে, অহল্যা পর্ণশালার দ্বারদেশে আসিয়া প্রকৃত গৌতমকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। ইত্যবসরে ইন্দ্রও মার্জ্জার রূপ ধারণ করত অবস্থিতি করিতে থাকিল। গৌতম অহল্যাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া কহিল, পাপীয়সি এ কি সাহস করিয়াছ। তদনন্তর সেই মার্জ্জারকে দেখিয়া কহিল তুমি কে? সত্য কহ? নচেৎ এখনই ভস্ম করিব। তখন মার্জ্জাররূপধারী শচীপতি ভয়ে বেপমান হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক গৌতমের স্তুতি করিয়া কহিল 'আমি মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া এই পাপকার্য্য করিয়াছি। ভগবন্! আপনি দয়ানিধি, আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে রক্ষা করুন।' ঋষি ইন্দ্রকে শাপ প্রদান করিয়া কহিল 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তুমি সহস্র ভগযুক্ত হও।' তদনন্তর অহল্যাকে কহিল 'পাপীয়সি! তুমি অতি কুৎসিত পদার্থ হও।' তখন অহল্যা মুনিবরকে প্রসন্ন করিয়া কহিল, হে মুনিবর আপনি সর্ব্বজ্ঞ

আমি পাপিনী নহি; এই পাপিষ্ঠ আপনার রূপ ধারণ করিয়া আমাকে মোহিত করিয়া আমার এই দুর্দ্দশা করিয়াছে আমাকে ক্ষমা করুন।' তখন মুনিবর ধ্যানে তাহার বাক্য সত্য জানিয়া পুনরায় কহিল, 'অহল্যে! তুমি নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় আমার সহিত মিলিত হইবে।' তদনন্তর অভি-সপ্ত গৃহাগত ইন্দ্রকে স্বপদদ্বয়ে পতিত দেখিয়া পুনরায় কহিল 'পুরন্দর তুমিও গৌতমীতে অবগাহন করিয়া পাপ বিমুক্ত হইয়া সহস্রাক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবে।' অনন্তর, তিনি গৌতমী গঙ্গার নিকটে আসিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে অহল্যাও নদীরূপ ধারণ করত পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত মিলিত হইল; ইন্দ্রও সেই তীর্থে স্নান করিয়া সহস্রনেত্রে ভূষিত হইলেন।

"ইত্যুক্ত্বা তং মহাবাহুর্দ্দত্ত্বা ব্রহ্মগিরিং তথা।
জগাম গৌতমী যত্র গঙ্গাব্ধি আগতা পুরা॥
অহল্যা চ তথা তত্র নদীরূপেণ সঙ্গতা।
স্বীয়রূপং পুনঃপ্রাপ্তা পতিনা সহসঙ্গতা॥
তত্রাগত্য শচীভর্ত্তা স্নাত্বা ভগসহস্রতঃ।
মুক্তো ভুক্তা সহস্রাক্ষো বভূবামিতবিক্রমঃ॥

* * * *

ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থমহল্যাসঙ্গমং বিদুঃ।
ইন্দ্রতীর্থমিদং খ্যাতং সর্ব্বকামপ্রদং নৃনাম্॥"

এই তীর্থে স্নান করিলে গুরুতল্পগ ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক নাশ হয়।

বর্ত্তমান সঙ্গমস্থলে 'তীর্থলমণ্ডী' নামে গ্রাম দৃষ্ট হয়। কিংবদন্তী এইরূপ ইন্দ্র অহল্যা গমন জন্য পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া কোটি ফলীতে যে লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা কোটি লিঙ্গ নামে বিশ্রুত হইয়া অদ্যাপি পূজা পাইতেছেন।

৫। বৃদ্ধা সঙ্গম। ইহা সপ্ত গোদাবরী সঙ্গম মহাত্ম্যের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত। উহার উৎপত্তির বিষয়ে ইতিহাস এইরূপ আছে যে, গৌতম ঋষি কোন বৃদ্ধার পাণিগ্রহণ করেন। তদনন্তর বৃদ্ধাপত্নীর সহিত বশিষ্ঠাদির আশ্রমে আসিলে কোন মুনি বৃদ্ধাকে দেখিয়া গৌতমকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিল 'ওহে গৌতম! এই বৃদ্ধাতে তোমার পুত্রোৎপাদনের সম্ভাবনা নাই। ইহার পরিগ্রহে ফলোৎপত্তি হইবে না। অগস্ত্য মুনি তৎশ্রবণে গৌতমকে কহিল, 'হে গৌতম! দক্ষিণাম্বুধি তটে পাপ বিনাশী মহাপুণ্যা গৌতমী নামে তোমারই আনীতা নদী রহিয়াছে তাহার তীরে বৃদ্ধার সহিত ঈশ্বরারাধনা করিলে তুমি সিদ্ধমনস্কাম হইবে।' তৎশ্রবণে গৌতম বৃদ্ধার সহিত গৌতমী তীরে আসিয়া তীব্র তপস্যা করিয়া শিব, গঙ্গা ও বিষ্ণুকে পৃথক্ পৃথক্ স্তুতি করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা তাঁহার স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ রূপ ধারণ করিয়া আপন পবিত্র তীর্থবারি তাহাদিগের উভয়ের অঙ্গে অভিষিঞ্চন করিলে তীর্থাভিষিক্ত হইয়া বৃদ্ধা ও গৌতম উভয়েই সুন্দরকান্তি ধারণ করিয়াছিল। গঙ্গা কর্ত্তৃক অভিষিক্ত তীর্থ নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া সাগরে পতিত হয়; এবং তাহাই বৃদ্ধাগৌতমী নামে প্রসিদ্ধ হয়। গঙ্গাদেবীর প্রসাদে তৎসঙ্গম স্থান পুণ্যতীর্থ হইয়াছে। গৌতমঋষি তথায় লিঙ্গ স্থাপন করিয়া পূজা করেন, তাহা বৃদ্ধেশ্বর নামে অদ্যাপি বিশ্রুত হইতেছে। সঙ্গম-মাহাত্ম্যে এই বিষয়ের এইরূপ ইতিহাস আছে যে, ব্রহ্মা নারদকে কহিয়াছিলেন,'পুরাকালে আমি পঞ্চানন ছিলাম, আমার পঞ্চম বক্তুটী কুভাষণ প্রিয় ছিল, কোন কারণে সেই বক্তু মহাদেবের নিন্দা করিয়াছিল, তাহাতে তিনি রুষ্ট হয়েন এবং কালভৈরবরূপে আবির্ভূত হইয়া আমার সেই বক্তুটী ছিড়িয়া ফেলেন; আমার তাহাতে মৃত্যু হয়, কিন্তু বিষ্ণু মহাদেবকে

সন্তুষ্ট করিলে তিনি আমাকে পুনর্জীবন দান করেন। এদিকে ব্রহ্মহত্যা-জনিত বক্তুটী কালভৈরবের হস্ত সংলগ্ন হইয়া যাইলে তিনি কপালপাণি নামে বিশ্রুত হয়েন। অনন্তর, পাপশান্তির জন্য বহু পুণ্যতীর্থ ভ্রমণ করিয়া বৃদ্ধাসঙ্গমে আসিয়া তত্তীর্থে নিমজ্জন করিবামাত্র পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন ও তৎকালে তাহার পাণিস্থ কপাল পতিত হয়। আমি সেই সঙ্গমস্থলে যাইয়া মহাদেবের তুষ্টির জন্য লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করি, তাহা অদ্যাপি ব্রহ্মলিঙ্গ নামে বিশ্রুত হইতেছে। উহার পূর্ব্বভাগে ভৈরব-কাল-সঙ্গমক্ষেত্র; ঐ সঙ্গমস্থলে বন্ধ্যা নারী যথারীতি স্নান করিয়া কালভৈরবের পূজা করিলে পুত্রলাভ করিবে। তদা প্রভৃতি তৎক্ষেত্র ব্রহ্মসংবিদ্যা নামে অভিহিত ও তাহাতে ব্রহ্ম-হত্যাকারী স্নান করিয়া পাপ বিমুক্ত হইয়া থাকে।' এখানে বক্তব্য এই যে, সেতুমাহাত্ম্যে ব্রহ্মার পঞ্চমবক্তু বিষয়ের যে ইতিহাস দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহার বিবরণ ৪র্থাংশে রামেশ্বরের ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৬। কৌশিকা সঙ্গম। ইহা সপ্তগোদাবরী মহাত্ম্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত। ইহার উৎপত্তিবিষয়ে ইতিহাস, যথা। পুরাকালে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব পাইবার উদ্দেশে বশিষ্ঠ হইতে কুল্যা আনয়ন করিয়া তাহার তীরে উগ্র তপস্যাপূর্ব্বক গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া তৎমন্ত্র প্রভাবে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। কৌশিক কর্তৃক ঐ নদী আনীতা বলিয়া কৌশিকী নামে বিশ্রুতা হইয়াছে, উহার সঙ্গমস্থল রামেশ্বর ক্ষেত্র বলিয়া বিদিত। তাহার উৎ-পত্তির ইতিহাস, যথা,—ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন ব্যপদেশে রাবণবধ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আসমুদ্র রাজ্য বহু সহস্র বৎসর পালন করিয়া লোকশিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং নিত্যশুদ্ধ সচ্চিদানন্দরূপী হইলেও তীর্থযাত্রা করিয়া, পুষ্পরথে আরোহণ পূর্ব্বক গৌতমী তীরে আসিয়া তাহার উভয়

তীরে, লিঙ্গস্থাপন করেন। তদনন্তর তুল্যা আত্রেয়ী ভারদ্বাজী গৌতমী ও বৃদ্ধ-গৌতমীতে যথাক্রমে স্নান ও তত্রস্থ ঈশ্বরের পূজা করিয়া কৌশিকী সঙ্গমে আসিয়া তথায় মহাদেব প্রতিষ্ঠা করিতে উৎসুক হইয়া হনূমানকে সুন্দরলিঙ্গ আনয়ন করিতে আদেশ করিলে, আঞ্জনেয় লিঙ্গ আনিতে বারাণসীতে গমন করেন। তাহার প্রত্যাবৃত্ত হইতে বিলম্ব দেখিয়া রাজীবলোচন রাম কৌশিকীর পূর্ব্বভাগে স্বনামে দিব্য মৃৎলিঙ্গ স্থাপন ও পূজা করিয়া বেদমন্ত্রে স্তুতি করিয়া শিবকে সন্তুষ্ট করেন। শঙ্কর প্রত্যক্ষ হইয়া রামকে অভিলষিতবর প্রার্থনা করিতে কহিলে রাম কহিলেন, 'যে কেহ মৎকথিত এই স্তোত্র দ্বারা আপনার স্তুতি করিবে তাহার সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হইবে, তাহাকে নরকে যাইতে হইবে না। এই সঙ্গমে যে কেহ স্নান করিবে তাহার সমস্তপাপ নাশ হইবে, যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে অন্নাদি ষোড়শোপচারে আপনার পূজা করিবে, তাহার অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে, অধিকন্তু এই ক্ষেত্র আমার নামে (রামেশ্বর নামে) বিশ্রুত হউক' ইহাই আমার প্রার্থনা? মহাদেব 'তথাস্তু' কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তদাপ্রভৃতি কৌশিকী সঙ্গমের পূর্ব্বদিক রামেশ্বরক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হইয়াছে। অনন্তর, আঞ্জনেয় উত্তম লিঙ্গ লইয়া আসিলে, রামের আজ্ঞায় লক্ষ্মণ কৌশিকী সঙ্গমের উত্তরতীরে সেই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তদাপ্রভৃতি সেই ক্ষেত্র লক্ষ্মণেশ্বর ক্ষেত্র নামে অভিহিত হইতেছে।

৭। বশিষ্ঠা-সঙ্গম। বশিষ্ঠ মুনি গৌতমী হইতে কুল্যা আনয়ন করিয়া তাহার তীরে তপস্যা করেন বলিয়া, সেই স্রোতস্বতী তাঁহার নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছে। সাগর ও বশিষ্ঠার মধ্যগত ত্রিকোণাকৃতি ভূভাগ অন্তর্ব্বেদি নামে বিশ্রুত। তথায় নৃসিংহদেব বিরাজ করিতেছেন বলিয়া, তৎক্ষেত্র বৈকুণ্ঠসদৃশ পুণ্যভূমি। নৃসিংহদেবাভির্ভাবের ইতিহাস যথা,—হিরণ্যাক্ষের

পুত্র রক্তবিরোচন-দৈত্য বশিষ্ঠার তীরে উগ্র তপস্যা করিয়া, মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেন। মহাদেব বরদ ও প্রত্যক্ষীভূত হইয়া অভিলষিত বর লইতে কহিলে, দৈত্যপ্রবর কৃতাঞ্জলি-পুটে তাহার স্তুতি করিয়া প্রার্থনা করিল, 'হে প্রভো! যুদ্ধে বিপক্ষ আমাকে অঘাত করিলে, আমার রক্ত ভূমিতে পতিত হইবামাত্র আমার তুল্যরূপ অপর দৈত্য আবির্ভূত হইয়া শত্রু-নাশ করিবে, এই আমার প্রার্থনা।' শঙ্কর 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইল। বিশ্বামিত্র রক্ত-বিরোচনের বরপ্রাপ্তি-বিষয় অবগত হইয়া, বশিষ্ঠের সহিত পূর্ব্ব বিরোধ স্মরণপূর্ব্বক দৈত-প্রবরকে কহিল, 'অহো মহাবাহো! তুমি মহাদেবের বরে বর্দ্ধিত হইয়াছ। আপাততঃ আমার এক উপকার কর, বশিষ্ঠের শক্তি আদি শতপুত্র ভক্ষণ কর।' রক্ত-বিরোচন তাহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া, বশিষ্ঠের আশ্রমে আসিয়া, তাহার শক্তি আদি শত পুত্রকে ভক্ষণ করিল। অরুন্ধতী পুত্রনাশহেতু ক্রন্দন করিলে, বশিষ্ঠ তৎসমস্ত জানিতে পারিয়া, নৃসিংহদেবের স্মরণা-পন্ন হইল। নৃসিংহদেব তাহার ধ্যানে সন্তুষ্ট ও প্রত্যক্ষীভূত হইয়া কহিলেন, 'মুনে! তোমার ধ্যানে সন্তুষ্ট ও বরদ হইয়া আসি-য়াছি। অতএব বর প্রার্থনা কর।' বশিষ্ঠ স্তুতি করিয়া কহিল, 'হে ভক্তবৎসল! রক্ত-বিরোচন মহাদেবের বরে বর্দ্ধিত হইয়া, আমার শত পুত্র সংহার করিয়াছে। অতএব এই আশ্রমের উপদ্রব শান্তি করিয়া, আশ্রমে অবস্থিতি করুন।' ভগবান্ তথাস্তু বলিয়া, দৈত্যকে সংগ্রামে সংহার করিয়া, ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। তদবধি অন্তর্ব্বেদিতে স্ত্রীর সহিত অবস্থিত করিতে-ছেন, অতএব উহা উৎকৃষ্ট বিষ্ণুধাম।

অন্তর্বেদি অতি পুণ্যভূমি, রামচন্দ্র তথায় আসিয়াছিলেন ও তাহার পূর্ব্বে ভার্গব পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃহনন করিয়া তৎ পাপ-শান্তির জন্য বহু তীর্থ ভ্রমণান্তর অন্তর্বেদিতে উপস্থিত হইয়া

মাতৃবধজনিত মহাপাতক হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নৃসিংহদেবের তপস্যা করিয়াছিলেন।

মাঘমাসে রবিবারে শুক্ল একাদশীতে বশিষ্ঠ সঙ্গমে স্নান করিয়া নৃসিংহদেবের পূজা করিলে, মাতৃতল্পগ গুরুতল্পগাদি মহাপাতক নষ্ট হয়। মাঘমাসে তথায় পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ড দিলে গয়া শীর্ষে পিণ্ড প্রদানের ফল হয়।

১৭৬ পৃ। ভদ্রাচলের উত্তর ২০ মাইল দূরে পর্ণশালা নামে ক্ষুদ্র গ্রাম। তথায় রাম, সীতার সহিত কুটীরে বাস করিতেন; তাহা হইতে পর্ণশালা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তথায় সীতা রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল। ভদ্রাচলের ২৪ মাইল পূর্ব্বদিকে শবরী নামে উপনদী গোদাবরীতে মিলিয়াছে। রামায়ণে শবরী উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যায়, রাম শবরীর নিকট আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। শবরী-সঙ্গমের ৬ মাইল আগ্নেয় দিকে গোদাবরীর পূর্ব্ব তীরে একটী ক্ষুদ্র শৃঙ্গ শ্রীরামগিরী নামে খ্যাত। অতএব গোদাবরী অঞ্চলে রামচরিত্রে সম্মিলিত রহিয়াছে।

রাজমহেন্দ্রীর বায়ব্যদিকে গোদাবরীর পশ্চিম তীরে পট্টসম্ নামে গণ্ডগ্রামের সম্মুখে গোদাবরী-গর্ভে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর স্বয়ং ব্যক্ত অনাদি লিঙ্গ বিরাজিত। উহা তেলুগু প্রদেশোক্ত পঞ্চ স্বয়ং ব্যক্ত লিঙ্গের অন্যতম। যথা,—১ম কাশী। ২য় কেদার। ৩য় শ্রীশৈল। ৪র্থ পট্টসম্। ৫ম শ্রীকালহস্তী।

পট্টসমের দুই মাইল বায়ব্যদিকে গোদাবরী গর্ভের দ্বীপস্থ শৃঙ্গোপরি মহানন্দেশ্বরের মন্দির। মন্দিরের সন্নিকটে একটী বৃহৎ গুহা দৃষ্ট হয়, লোকপ্রবাদ ঋষিরা অদ্যাপি তাহাতে বাস করিতেছেন। রাত্রিকালে গুহা হইতে নির্গমনপূর্ব্বক গোদাবরী স্নান করিয়া, মহানন্দেশ্বরের পূজা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য রাত্রিকালে কোন ব্যক্তি দ্বীপে রাত্রিযাপন করে না।

১৮০ পৃষ্ঠা। কোটিফলী। ১৮৯২ খৃঃ ২৪ অক্টোবর রবিবারে আমরা কাকনাড়া হইতে জলপথে কোটিফলী সন্দর্শনে গিয়াছিলাম। ইহা গৌতমী তীরের উত্তর দিকে অবস্থিত। গৌতমী-মাহাত্ম্যে দেখিতে পাওয়া যায় ইন্দ্র গৌতমী-স্নানে অহল্যাগমন জন্য পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া কোটিফলীতে কোটীশ্বরের প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্র গুরুপত্নী-গমন-পাপ নাশের জন্য কোটি-ফলীতে ছায়া-সোমেশ্বর স্থাপন, গৌতমী-স্নান ও পূজাদি করেন। কশ্যপ ঋষি এই স্থানে জনার্দ্দন স্বামীর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার অপর নাম মাতৃগমনাপহারী। তদ্বিষয়ক ইতিহাস যথা,—

কাশ্মীর নিবাসী কোনও ব্রাহ্মণ বৃদ্ধবয়সে দুর্ম্মেধা নাম্নী তরুণী ভার্য্যায় সুভাবিত নামে একটী পুত্রোৎপাদন করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলে, তরুণী ভার্য্যা ভ্রষ্টা হইয়া পুত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বারবিলাসিনী রূপে ভ্রমণ করিতে করিতে কোটিফলীতে আসিয়া বারবিলাসিনীর বৃত্তি অবলম্বন করে। ব্রাহ্মণ পুত্র কোন আত্মীয়ের ঘরে পালিত হইয়া ষোড়শ বর্ষে কোন কারণ বশতঃ গৃহত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া ক্রমে কোটীফলীতে আইসে এবং তথায় পূর্ব্বোক্ত বারবিলাসিনীর হাব-ভাবে মুগ্ধ হইয়া আপন সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া তাহার নিকট প্রতিরাত্রে যাতায়াত করিতে থাকে; কিন্তু ঐ পুত্র প্রত্যহ তৎসংসর্গহেতু কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইত এবং প্রাতে গৌতমীতে স্নান করিবামাত্র রোগ বিমুক্ত হইত। অনন্তর, রোমশ নামে ঋষি, কোটিফলীতে আসিয়া গৌতমীর তীরে ব্রাহ্মণ কুমারকে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ও স্নানানন্তর সুপুরুষ রূপ দেখিয়া তাহাকে তদবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার নিকট হইতে সমস্ত অবগত হইলেন। পরে, তাহাকে কহিয়া দিলেন যে, যে বারবিলাসিনীতে তুমি গমন কর তাহার নাম-ধামাদি পূর্ব্ব-

বৃত্তান্ত জানিয়া আইস। ব্রাহ্মণ-কুমারও পূর্ব্ববৎ সন্ধ্যার সময় তথায় যাইয়া বারবিলাসিনীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায়, বারবিলাসিনী আপন পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল কহিলে, ব্রাহ্মণকুমার তাহাকে আপন মাতা বলিয়া জানিতে পারিয়া, ক্ষোভে দুঃখে হঠাৎ পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিল; তখন বারবিলাসিনী তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া, সমস্ত জানিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। পরে, উভয়ে মনোদুঃখে যামিনী অতিবাহিত করিয়া, প্রাতে রোমশ মুনিবরের নিকট আসিয়া সমস্ত বিষয় কহিল। মুনিবর পূর্ব্বাপর ঘটনা সকল ধ্যানে অবগত হইয়া, উভয়কে বিধিপূর্ব্বক গৌতমী-স্নান করিয়া ছায়া-সোমেশ্বরের পূজা করিতে আদেশ দিয়া সহসা অন্তর্হিত হইলেন। তাহারা মুনির আজ্ঞামত স্নান ও পূজাদি করিয়া, মহাপাতক হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। তখন হইতে এই তীর্থ মাতৃগমনাপহারী নামে বিশ্রুত হইয়াছে।

আমরা কার্ত্তিকী শুক্লপক্ষ তৃতীয়ায় সোমবার প্রাতে গৌতমীতে স্নান করি। তৎকালে ৩০ জনের অধিক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া, 'সঙ্কল্প-দক্ষিণা' পাইবার উদ্দেশে সঙ্কল্প মন্ত্র কহিয়াছিল, তাহারা অর্দ্ধ আনার হিসাবে দক্ষিণা পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল। তদনন্তর, পঞ্চামৃত ও নারিকেল দ্বারা ছায়া-সোমেশ্বরদেবের একাদশরুদ্রী নামক অভিষেক ও গৌতমী তীর্থের অভিষেক করাইয়াছিলাম। রাত্রিতে রাজরাজেশ্বরী-দেবীর শ্রীসূক্তমতানুযায়িক কুঙ্কুম অর্চ্চনা ও পূজা করাইয়াছিলাম।

সোমেশ্বরের মন্দিরটী মধ্যবিধ; স্তম্ভের আয়তন দৃষ্টে পুরাতন বলিয়া বোধ হইল। ভীমখণ্ডে ইহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখা যায়। কোটিলিঙ্গের ও জনার্দ্দন স্বামীর মন্দির ক্ষুদ্র। মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরে একটী ছোট গোপুর, গোপুরের সম্মুখে সোমকুণ্ড নামে বৃহৎ পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর পূর্ব্ব তীরে

গ্রাম, পশ্চিম তীরে তিনটী ব্রাহ্মণ-ঘর। নূতন আগন্তুকদিগের থাকিবার জন্য ছত্রবাটী আছে, গ্রামের পার্শ্ব দিয়া গোদাবরী-বোঙ্কট পয়োনালা গিয়াছে। উহার জল হইতে সম্মুখস্থ ধান জমী সকল আবাদ হইতেছে। কোটিফলী গ্রামখানি বিশাখপত্তনের অন্তর্গত বিজয়নগরের সমস্থানভুক্ত মহল। উহার রাজস্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ৬৯১২৲ টাকা ছিল, দেবালয়ের বাব কারণ ৩০০০৲ হাজার টাকা নির্দ্ধারিত আছে।

১৮১ পৃষ্ঠা। দক্ষারাম,—কোটিফলী হইতে ১৮৯২ খৃঃ ২৫ অক্টোবর তারিখে দক্ষারাম সন্দর্শনে আসি। এ প্রদেশে ইহা দ্বিতীয় কাশী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভীমখণ্ডে ইহার সবিস্তার বর্ণনা আছে, উহার অপর উদ্দেশ্য দক্ষারামের মহিমা বিস্তার করা। মহর্ষি বাদরায়ণ কাশী হইতে নিষ্কাসিত হইয়া অন্নপূর্ণার আদেশে দক্ষবাটিকাতে আগমনানন্তর ভীমেশ্বরকে তুষ্ট করেন। পুরাকালে প্রজাপতি দক্ষ এই ধামের বহির্ভাগে যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে সতীদেবী বিনা আহ্বানে আসিয়া পিতার কটূক্তিতে দেহ ত্যাগ করেন। গ্রামের দক্ষিণভাগে এক জলাশয় দৃষ্ট হয়, উহা দক্ষযজ্ঞকুণ্ড নামে বিশ্রুত। উহার দক্ষিণ পশ্চিমভাগে যে মৃত্তিকার ঢিপী দৃষ্ট হয়, তাহাই যজ্ঞালয় বলিয়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ইহা মুক্তিপ্রদ-ক্ষেত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। যথা,—

"তস্মাৎ দক্ষপুরং ভূমৌ মুক্তিক্ষেত্রমিতীরিতম্।
দক্ষস্ত ভবনারামো দক্ষারামঃ সদাশিবঃ।
তত্র সাক্ষাৎকরো নৃণাং ভোগমোক্ষফলং কিয়ৎ।"

পার্ব্বতীদেবী কোন সময়ে দক্ষালয়ে মহাদেবকে থাকিতে অনুরোধ করেন। মহাদেব মার্গশীর্ষ মাসে শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশীর শুভদিনে রোহিণীনক্ষত্রে সিদ্ধযোগে বৃষবাহনে তথায় আগমন করেন। তৎকালে ইন্দ্রাদি সকলে তথায় আসিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন; তদনন্তর তিনি তথায় জ্যোতীরূপে অবস্থিত

করিতে থাকেন। অনন্তর, ত্রিপুরবাসী দৈত্যদিগের প্রভাবে দেবগণ উৎপীড়িত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও দেবতাদিগের প্রার্থনায় তিনি ত্রিপুরদৈত্যকে সংহার করেন। তৎকালে ত্রিপুরবাসী-দিগের দিব্যলিঙ্গ পঞ্চমাংশে বিভক্ত করিয়া পঞ্চমারামে স্থাপন করেন। যথা, স্কন্দপুরাণান্তর্গত ভীমখণ্ডে ১৯ অধ্যায়ে।

"ততস্ত্রিপুরদৈত্যেয়গণানাং কুলদৈবতম্।
তৎ দিব্যলিঙ্গং পরমং লিঙ্গঞ্চ নিরুপদ্রবম্॥
পঞ্চাক্ষরি পঞ্চতত্ত্বং পঞ্চব্রহ্মময়ং প্রভুম্।
পঞ্চখণ্ডানি কৃত্বাথ পঞ্চমারামভূমিষু॥
অমরেশারামসোমারামক্ষীরবনানি চ।
কুমারারামবিখ্যাতাশ্চতুরারামপত্তনে॥
প্রতিষ্ঠাপ্য স্বয়ং ভীমো দক্ষিণাব্ধিতটোত্থিতে।
দক্ষারামপুরে রম্যে দক্ষিণানন্দকাননে॥
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাসং সর্ব্বলোকমনোহরম্।
সমস্তভুবনস্তুত্যমনন্তফলদায়কম্।
ভীমেশ্বরং মহালিঙ্গং প্রাপ ত্রিপুরসংহরঃ॥"

অতএব আমরা দেখিতে পাই কৃষ্ণা নদীর তীরে বিজয়বাড়া হইতে ৩০ মাইল দূরে অমরারামে অমরবৃন্দ কর্ত্তৃক ভীমেশ্বর প্রথম অর্চ্চিত হন। দক্ষারাম হইতে ৭ মাইল দূরে সোমারামে সোমদেব কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সোমেশ্বর নামে অভিহিত হইতেছেন, গোতমীর দক্ষিণ তীরে নর্সাপুর তালুকের পালকোল্লু গ্রামে ক্ষীরারামে ক্ষীরেশ্বর লিঙ্গ আছেন। (পালকোল্লু। পাল= দুগ্ধ। কোল্লামু=সাগর অর্থাৎ ক্ষীরসাগর।) তথায় দেবের অভিষেক দুগ্ধ দ্বারা হইয়া থাকে। মন্দিরটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে গোদাবরীর ডিষ্ট্রীক্টের অন্তর্গত যত দেব মন্দির আছে ক্ষীরারামের মন্দির-গোপুর সর্ব্ব বৃহৎ বলিয়া কথিত। সনকাদি সপ্তর্ষি কর্ত্তৃক উক্ত লিঙ্গ প্রথম পূজিত হন। চামার্লকোটের কুমারারামে

কুমারতটিনী নদীতটে কুমারস্বামী কর্ত্তৃক ভীমেশ্বর প্রথম পূজিত হন।

দক্ষবাটিকায় স্বয়ং ভীমনায়ক অবস্থিতি করিতেছেন বলিয়া অপর চতুরারাম অপেক্ষা দক্ষারাম পুণ্যতর হইয়াছে ও ভীমখণ্ডেও ইহাকে পুনঃ পুনঃ দ্বিতীয় কাশী কহা হইয়াছে। দক্ষারামকে ওঙ্কারপুরী বলা হইয়াছে। দক্ষবাটিকায় লিঙ্গ সংস্থাপিত হইলে বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষিরা দেবের অভিষেক করিবার উদ্দেশে সপ্ত-গোদাবরী তীর্থ আনয়ন করিতে যান; পথিমধ্যে দৈত্যদিগের সহিত তাহাদিগের বিরোধ উপস্থিত হয়। তুল্য নামে কোন দৈত্য তুল্যা তীরে তৎকালে তপস্যা করিতেছিল দৈত্যপ্রবর বিবাদ মিটাইয়া দিলে সপ্তর্ষিরা সপ্ত গোদাবরীকে অন্তর্বাহিনী করিয়া দক্ষবাটিকাতে আনয়ন করেন; পূর্ব্বোক্ত কারণে তাহাদিগের প্রত্যাবৃত্ত হইতে বিলম্ব হইলে শুভক্ষণ অতিক্রান্ত হইতেছে ভাবিয়া মুনিনির্দ্দিষ্ট সময়ে আদিত্য দেব প্রথম লিঙ্গার্চ্চনা করেন। মুনিগণ প্রত্যাগত হইয়া লিঙ্গকে অর্চ্চিত দেখিয়া বিস্মিত হইয়া অর্চ্চককে অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হইলে আদিত্যদেব তাহাদিগকে লিঙ্গপূজার কারণ কহিয়া বলিলেন. যেহেতু আপনারা সপ্তগোদাবরীকে অন্তর্বাহিনীরূপে আনয়ন করিয়া দক্ষবাটিকার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন সেইহেতু লিঙ্গ পূজার পুণ্যাংশ আপনারাও প্রাপ্ত হইবেন। মন্দিরের পূর্ব্বভাগে যে বৃহৎ হ্রদ তাহা পূর্ব্বোক্ত সপ্তগোদাবরী। উহা গৌতমী আদি সপ্তগোদাবরীর তুল্যরূপ পুণ্যতীর্থ, অতএব দক্ষবাটিকাতে যাইয়া সকলে বিধিপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিলে, সপ্তগোদাবরী স্নানের ফলভাগী হইয়া থাকে। উহার জলে ভীমেশ্বর মহালিঙ্গের অভিষেক হইয়া থাকে।

মন্দিরের গঠনাদি ও অবয়ব সর্ব্বপ্রকার কুমারারামের ভীমেশ্বরদেবের মন্দিরের সদৃশ, মন্দিরের বহির্ভাগে দেওয়ালের

মণ্ডপের উপর স্তম্ভে ভূরি ভূরি পুরাতন তেলুগু কানারি ও দেবনাগর অক্ষরে অনুশাসন ক্ষোদিত রহিয়াছে। মন্দিরের প্রাঙ্গণে ৪টী গোপুর; পশ্চিম গোপুরের বহির্ভাগে যে মণ্ডপ আছে তাহার গঠন দৃষ্টে মন্দিরটী চালোক্য রাজাদিগের সময়ে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হইল, এই মন্দির ও চামার্লকোটার কুমারারামের মন্দির একই সময়ে একই রাজার আদেশে একই আয়তনে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

প্রাঙ্গণের পশ্চিম উত্তর দিকে চতুরধিক সপ্ততি স্তম্ভবিশিষ্ট ও পশ্চিম দক্ষিণ কোণে অপর একটী পুরাতন মণ্ডপ রহিয়াছে। মূল-মন্দিরটী দ্বিতল ও কৃষ্ণবর্ণের গ্রেনাইট নামক প্রস্তরে নির্ম্মিত। লিঙ্গ দ্বিতল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, অতএব অভিষেক কার্য্য দ্বিতল হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে নিম্নতলে গর্ভগৃহে প্রদক্ষিণ করিবার ব্যবস্থা আছে। মন্দিরের পার্শ্বে ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের ধারে প্রদক্ষিণ মণ্ডপও দ্বিতল, তাহার নির্ম্মাণ-কার্য্যে লাল বর্ণের নেইস নামক প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, বহিঃপ্রাঙ্গণস্থ প্রাচীরও পূর্ব্বোক্ত লাল প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার ভিতর দিকে পুরাতন প্রস্তর সকল স্তম্ভ-কার্নিসাদিতে ব্যবহৃত হইয়াছে, উহাতে এক প্রকার স্থির বলা যাইতে পারে, গোদাবরীর অন্তর্গত বৌদ্ধ-দিগের সঙ্ঘারাম নষ্ট করিয়া তাঁহার প্রস্তর এই দেবালয়ের প্রাঙ্গণ প্রাচীরে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীরের আয়তন দীর্ঘপ্রস্থে ৫০০ শত ফুট মন্দিরটীর সংস্কারাভাব হইয়াছিল সম্প্রতি কাকনাড়া নিবাসী পি, বেনকন্না লক্ষ টাকা দিয়া মন্দিরটীর জীর্ণ সংস্কার ও মন্দির প্রাঙ্গণে দক্ষিণ প্রাচীরের দক্ষিণ ভাগে বৃহৎ ছত্রবাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন উহাতে সর্ব্বপ্রকার আগন্তুক স্থান পাইয়া থাকে, অধিকন্তু ব্রাহ্মণ যাত্রীরা আহার পাইয়া থাকে; অতএব এই ছত্রবাটী হওয়ায় যাত্রীমাত্রেরই বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। দেবালয়ের পশ্চিম ভাগে পুরাতন সহর, সহরাভ্যন্তরে মুসল-

মানদিগের অনেকগুলি আবাস বাটী মস্ক দৃষ্ট হইল। এক সময়ে এই পুণ্যক্ষেত্র বিধর্ম্মীদিগের অধিকারে ছিল তৎসময়ে হিন্দু-দিগের উপর যথেষ্ট অত্যাচার হইত, আপাততঃ মুসলমান অধিবাসীদিগের অবস্থা উন্নত নহে। এই সহরে অশীতি ঘর বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন, তাহারা সকলেই মন্দিরের আয়ে দিনাতিপাত করিতেছেন।

আমরা দক্ষবাটিকাতে প্রাতঃকালে আসিয়া পি, বেন্‌কন্নার ছত্রবাটীতে আশ্রয় লই। প্রাঙ্গণ প্রাচীরাদি দর্শন করিয়া সপ্ত গোদাবরীতে স্নান তৎপরে একাদশরুদ্রা অভিষেক, রাত্রিতে মাণিক্যাম্বার সহস্র নাম কুঙ্কুম অর্চ্চনা করি। এখানে বেদপাঠ ও সংগীতের ব্যবস্থা দর্শন করিলাম, কিন্তু দেবনর্ত্তকী দেখিলাম না। সম্ভবতঃ দেবাঙ্গনা এ মন্দিরে নাই।

ভীমখণ্ডের দশম অধ্যায়ে পঞ্চতীর্থের ও একাদশ অধ্যায়ে দ্বাদশ তীর্থের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ত্রিপুর সংহারের পূর্ব্বে পঞ্চতীর্থ ও পরে দ্বাদশ তীর্থ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ভগবান্ রাম-চন্দ্র লোক উপকারার্থে তীর্থযাত্রায় আসিয়া দক্ষবাটিকা সন্দর্শন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত সপ্তদশ তীর্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। কিন্তু এক্ষণে ঐ সমস্ত তীর্থ পূর্ব্বের ন্যায় আগ্রহের সহিত যাত্রীদিগকে সন্দর্শন করান হয় না।

১। দক্ষতীর্থ,—পুরাকালে যথায় দক্ষযজ্ঞকুণ্ডে সতী দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

২। সংসিদ্ধিতীর্থ,—তথায় নগেন্দ্রতনয়া তপস্যা করিয়া আশু-তোষকে তুষ্ট করেন। ইহা অবশ্য পূর্ব্বোক্ত তীর্থের অনতিদূরে অবস্থিত। তথায় স্নান করিলে স্নাতার অভিলাষ সিদ্ধ হয়।

৩। সোমেশ্বরতীর্থ,—সোমদেবকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

৪। হৈমতীর্থ,—হিমবান্ ইহার তীরে তপস্যা করিয়া সতী-দেবীকে কন্যারূপে পাইয়াছিলেন।

৫। সপ্ত গোদাবরীতীর্থ,—সপ্তর্ষি কর্ত্তৃক আনীত, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

৬। ঐন্দ্রেশতীর্থ,—ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

৭। সিদ্ধেশ্বরতীর্থ,—সিদ্ধগণকর্ত্তৃক এইস্থানে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৮। যোগীশতীর্থ,—এইস্থানে সনকাদি ঋষিগণকর্ত্তৃক যোগীশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৯। যমেশতীর্থ,—এইস্থানে যমরাজকর্ত্তৃক কালেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১০। বীরভদ্রেশতীর্থ,—বীরভদ্রকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

১১। ব্রহ্মেশতীর্থ,—ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

১২। কপালেশতীর্থ,—কপালভৈরবকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

১৩। কুক্কুটেশতীর্থ।

১৪। সোমনাথেশতীর্থ,—সোমনাথ ঋষিকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

১৫। শ্রীমহেশতীর্থ,—মহেশ্বর নামে ঋষিকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

১৬। রামেশ্বরতীর্থ,—ভগবান্ রামচন্দ্রকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

১৭। কালেশতীর্থ,—কালকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

সর্পবরম্। কাকনাড়া হইতে ৩ মাইল দূরে পুণ্যধারা এলার পশ্চিম তীরে এই দিব্য ক্ষেত্র অবস্থিত। সর্পবরম্ অর্থে সর্পপুরী; উহার উৎপত্তি বিষয়ের ইতিহাস যথা,—পূর্ব্বকালে কদ্রু উচ্চৈঃশ্রবার বর্ণ বিষয়ে বিনতাকে প্রবঞ্চনা করিয়া দাসীত্বে আবদ্ধ করিলে, বিনতা তাহা জানিতে পারিয়া, কদ্রুপুত্রদিগকে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন। অনন্ত নাগ সেই বিমাতৃশাপ শান্তির উদ্দেশে বিষ্ণুর তপস্যা করিয়াছিল। ইহার বিবরণ মহাভারত ও পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। যথায় অনন্ত নাগ বিষ্ণুর তপস্যা করিয়া তৎপ্রসাদ লাভ করিয়াছিল, তাহাই সর্পবরম্ ও সর্পপুরী।

তত্রস্থ ভাবনারায়ণ-স্বামীর উৎপত্তির বিষয়ের ইতিহাস

যথা,—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে। নারদ বিষ্ণুমায়ায় আবদ্ধ হইয়া স্ত্রীত্ব লাভ করত পীঠিকাপুরে নিকুণ্ঠ রাজার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। পরে, তৎসহবাসে শত পুত্র লাভ করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে থাকিলে সহসা দৈবযোগে কোনও প্রবল শত্রু পীঠিকাপুর আক্রমণ করে; এই ঘটনায় রাজা ও শত পুত্র বিনষ্ট হইলে রমণীরূপী নারদ শোকে অভিভূত হন। অনন্তর, ব্রাহ্মণবেশধারী বিষ্ণুর আদেশে মুক্তিকা-সরসে অবগাহন করিয়া পুনঃ স্বরূপত্ব লাভ করেন।* নারদ স্বরূপত্ব পাইয়া, পূর্ব্ব সমস্ত স্মরণ করিয়া, ভাব অর্থাৎ বিকারগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে ভক্তবৎসল নারায়ণ যে মূর্ত্তিতে নারদ সমীপে আগত হইয়া জ্ঞানোপদেশ প্রদানে নারদের ভাব অর্থাৎ মনোবিকার বিদূরিত করেন, তাহাই ভাবনারায়ণস্বামী। নারদ সেই মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, তাঁহার পূজা করেন।

সর্পবরম্ গ্রামের বহির্ভাগে নারদকুণ্ড বলিয়া একটী সরোবর ও দেবালয়ের উত্তরদিকে মুক্তিকাসরস্ নামে অপর সরোবর ও দেবালয়ের অভ্যন্তরে নারদ প্রতিষ্ঠিত ভাবনারায়ণস্বামী রহিয়াছেন। ঋষিবর পূর্ব্বোক্ত নারদকুণ্ডে নিমজ্জন করিয়া স্ত্রীত্ব পাইয়াছিলেন। এজন্য উহাতে হিন্দুমাত্রেই অবগাহন করে না। পরে বিষ্ণুরূপ ব্রাহ্মণের আদেশে মুক্তিকাসরসে নিমজ্জন করিয়া, স্বরূপত্ব পাইয়াছিলেন বলিয়া এক্ষণে উহা পুণ্যতীর্থ হইয়াছে। এই ক্ষেত্র অষ্টোত্তরশত স্বয়ংব্যক্ত দিব্য পুণ্য বিষ্ণুক্ষেত্রের অন্তর্গত। আমরা ১৮৯২ খৃঃ অক্টোবরে ২৭শে তারিখে শুক্রবারে উহা সন্দর্শন করিতে যাই।

মন্দিরটী নাতি বৃহৎ হইলেও পুরাতন, মণ্ডপস্তম্ভে অনেকগুলি অনুশাসন অঙ্কিত রহিয়াছে। আমরা ৪টী অনুশাসনের

---

* দেবীভাগবতে ৬ স্কন্ধে ২৮ অধ্যায় হইতে এই বিষয়ের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তথায় এই ঘটনাস্থল কান্যকুব্জ ও নৃপতির নাম তালধ্বজ বলিয়া দৃষ্ট হয়।

তারিখ পড়িতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ধ্বজস্তম্ভের অনুশাসন অঙ্ক অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রথম অনুশাসনটী ১৩১০ শালিবাহন অব্দে ভীমরেড্ডী কর্তৃক প্রদত্ত। দ্বিতীয়টী ১৩১৭ শালিবাহনাব্দে ঈশ্বর সংবৎসরে চৈত্রপূর্ণিমায় গুরুবারে গোলি-সোম-রেড্ডী কর্তৃক ভাবনারায়ণস্বামীর বৃন্দাবনোদ্যান-ভূমি-প্রদানের অনুশাসন। তৃতীয়টী ১৩২৩ শালিবাহন গতাব্দে বৃষ সংবৎসরে বৈশাখ বহুলা দশমী গুরুবারে ভাবনারায়ণস্বামীর বৃন্দাবনোদ্যান কারণ চোরে কারারেড্ডী কর্তৃক প্রদত্ত। তিনটী অনুশাসনই সাত শত বৎসরের অধিক হইবে অতএব মূলমন্দির ৭০০ সাত শত বৎসরের অধিক, তাহার সন্দেহ নাই। 'ভীমখণ্ডে' তৃতীয় অধ্যায়ে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বাদরায়ণ কাশী হইতে বিতাড়িত হইয়া, দাক্ষিণাত্যে আসিবার সময় সর্পবরমে আসিয়াছিলেন। যথা,—

"অথ সর্পবরং ক্ষেত্রং মুমুক্ষূণাং মলক্ষতম্।
ত্রিলিঙ্গং ক্ষৌণিবৈকুণ্ঠং সমাধিনিধিরৈক্ষত॥
তত্র নারদকুণ্ডাম্বুনিমজ্জৎপাপহারিণি।
ভাবনারায়ণং দেবং দদর্শ শুভদর্শনম্॥
সেবামহোৎসবালোকপ্রমোদেন হরেস্তদা।
কাশিকাবিরহক্লেশৈর্হারিতোঽভূন্ মহামুনিঃ॥
তস্মিন্ সর্পবরক্ষেত্রে মোক্ষস্থানে শুভাশ্রয়ে।
অষ্টোত্তরশতখ্যাতবিষ্ণুক্ষেত্রে সুবিশ্রুতে॥
শনিবারোৎসবং চক্রে শিষ্যব্রাতসমন্বিতঃ।
হৃদ্যৈর্ভক্ষ্যাবশেষৈশ্চ স্বাদুনা পায়সেন চ॥
কলমান্নেন শুভ্রেণ খণ্ডশকরয়া তথা।
রম্ভাফলৈঃ সুপক্কৈশ্চ তথান্যৈরপি বস্তুভিঃ॥"

ইহা পীঠিকাপুর রাজ্যের অন্তর্গত; অতএব, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত বিবরণটীর সহিত মিলিতেছে। এক্ষণে রাজারা ইংরাজ শাসনে

জমিদাররূপে পরিণত হইয়াছেন ও তাঁহাদিগের মন্ত্রগুরু ভাবনারায়ণ স্বামীর মন্দির প্রাঙ্গণের দক্ষিণদিকে দ্বিতল বাটীতে বাস করিতেছেন। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে অগ্রহায়ণী শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগের বাস, উত্তরদিকে মুক্তিকা-সরস্ ও পশ্চিমদিকে অনন্তকুণ্ড। মন্দির প্রবেশদ্বার পূর্ব্বদিক হইতে হইলেও বৃহৎগোপুরটী মুক্তিকা-সরসের সম্মুখে, প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে অবস্থিত। মূলমন্দিরে ভাবনারায়ণস্বামীর প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে, উহা সপ্ত প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। নারদ প্রতিষ্ঠিত মূল বিগ্রহ ভাবনারায়ণ স্বামী নামে অভিহিত হইয়া প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকের জমী হইতে ৬ ফুট নিম্নে একটী ক্ষুদ্রকক্ষে বিরাজিত আছেন। প্রধান পূজা তাঁহারই হইয়া থাকে রামানুজ স্বামী, মহাবাল, মহামুনি ও দ্বাদশ অল্বার আদি মূর্ত্তি নিত্য পূজা পাইয়া থাকেন। পূজা ও নিত্যভোগের বন্দোবস্ত উত্তম। তুলসী অর্চ্চনার সময় বেদপাঠ হইয়া থাকে, প্রসাদ ও ভোগান্ন যথেষ্ট বিতরিত হয়। স্মার্ত্ত বৈষ্ণব ও সৎশূদ্র সকল মন্দির প্রাঙ্গণে ভোগান্ন ভোজন করিয়া থাকেন। অনেকগুলি শ্রীবৈষ্ণব এই মন্দির উপলক্ষে প্রতিপালিত হইতেছে। পূজার সুবন্দোবস্ত দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছিলাম।

আর একটী বিষয় বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। মন্দিরটী অতি পুরাতন, ১৭৮৯ শালিবাহনাব্দে প্রভব সংবৎসরে বৈশাখ শুক্লপঞ্চমী শুক্রবারের প্রদত্ত অনুশাসন পাঠে দেখিলাম, পীঠাপুরের বিজয়-গঙ্গাধর রাওকর্ত্তৃক মন্দির, তৎপ্রাঙ্গণ, প্রাচীর, গোপুর, মুক্তিসরস্ আদি সংস্কৃত ও মহাবাল মহামুনির নূতন বিমান নির্ম্মিত হইয়াছে। গোপুরে সমুদ্র মন্থন, রামাভিষেক, অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ, দুঃশাসন কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণাদির দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে ; কিন্তু অনুতাপের বিষয় এই যে, অন্যান্য কদর্য্য শতাধিক মূর্ত্তি থাকিয়া শ্রীবৈষ্ণবদিগের কুরুচির পরিচয় দিতেছে।

ক্রোড়পত্র।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গত ভীমখণ্ডের ২৯ অধ্যায়ে যোগপ্রকরণে ভগবান্ মহাদেব পার্ব্বতীকে উপদেশ দিবার ছলে দক্ষারামস্থিত ভীমনাথের পূজাদি বিষয়ে যে সমস্ত বিধি বলিয়া ছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"সপ্ত গোদাবরীঃ স্নাত্বা ভীমনাথমহাপ্রভোঃ ।
সৌধাগ্রভাগসৌবর্ণকুম্ভং দৃষ্ট্বা সমুজ্জ্বলম্ ॥
জিহ্বাং ষড়ক্ষরীমন্ত্রং নয়ন্ সর্ব্বার্থনিস্পৃহঃ।
যো বর্ত্ততেঽনহঙ্কারঃ শিবযোগিশিখামণিঃ ॥
তস্য ঘোরতরাপার-সংসারমকরাকরে।
কথং শাতোদরি! স্যাতামুন্মজ্জননিমজ্জনে ॥
অহঞ্চ ত্বঞ্চ পুত্রাশ্চ প্রমথানাঞ্চ কোটয়ঃ।
নারায়ণশ্চ ব্রহ্মা চ দিনাধীশো নিশাপতিঃ ॥
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা দেববিদ্যাধরাদয়ঃ।
সর্ব্বে চ সর্ব্বলোকৈকসংসেব্যং সাস্রবৈভবম্ ॥
শ্রীদক্ষবাটীনগরীনায়কং ভদ্রদায়কম্।
ভজামো ভীমনাথেশং শ্রেয়সে ভূয়সে সদা ॥
সপ্তসিন্ধুতটাবাসং সপ্তসপ্তিপ্রতিষ্ঠিতম্।
গোপ্তারং সর্ব্বলোকানাং দীপ্তপাবকবিগ্রহম্ ॥
ভজনীয়ং ভবহরং ভক্তাভীষ্টফলপ্রদম্।
ভীমনাথেশ্বরং ভক্ত্যা ভজ ভদ্রেভগামিনি! ॥
ভীমনাথং মহাত্মানং সর্ব্বকামার্থসাধনম্।
সংবৎসরব্রতেন স্যাৎ সদ্যো মুক্তিপ্রদায়কম্ ॥
মেষস্থিতে রবৌ চিত্রানক্ষত্রে তপনোদয়ে।
সপ্তগোদাবরীঃ স্নাত্বা যথাভক্তিধনং নরঃ।

দত্ত্বা ধরিত্রীদেবেভ্যো ভক্ত্যা মাং ভীমনায়কম্।
সংপ্রদক্ষিণমানম্য নক্তং কুর্ব্বীত ভোজনম্॥
বৃষরাশিস্থিতে সূর্য্যে বিশাখায়াং তথৈব চ।
মিথুনস্থে দিনকরে মূলাখ্যে ভে তথৈব চ॥
কর্কটকস্থিতে ভানৌ নক্ষত্রে ভগদৈবতে।
সিংহরাশিস্থিতে সূর্য্যে নক্ষত্রে বৈষ্ণবে তথা॥
কন্যাস্থিতে পদ্মহিতে পূর্ব্বভদ্রাহ্বয়ে চ ভে।
তুলাস্থিতে সহস্রাংশৌ নক্ষত্রে দস্রদৈবতে॥
বৃশ্চিকস্থে চণ্ডকরে কৃত্তিকায়াং তথৈব চ।
ধনুরাশিস্থিতে সূর্য্যে নক্ষত্রে রুদ্রদৈবতে॥
মকরস্থে গ্রহপতৌ পুষ্যাখ্যক্ষে তথৈব চ।
কুম্ভরাশিস্থিতে ব্রধ্নে নক্ষত্রে চ মঘাহ্বয়ে॥
মীনস্থিতে লোকবন্ধৌ ফল্গুনীনামকে চ ভে।
যঃ পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ সপ্তসিন্ধুনি মজ্জনম্॥
যথাশক্তি ধনং দানং ভীমনায়কদর্শনম্।
নক্তঞ্চ ভোজনং ভক্ত্যা করোতি নিয়মান্বিতঃ॥
সংবৎসরব্রতমিদং কুর্য্যাম্মদ্ভক্তিতৎপরঃ।
স্বর্গার্থী লভতে স্বর্গং ধনার্থী লভতে ধনম্॥
মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং কৃত্বেদং ব্রতমুত্তমম্।
ক্ষেত্রেঽস্মিন্ মৎপ্রিয়ে ধাম্নি যত্র কুত্রাপি মানবঃ॥
মৃত্বা প্রাপ্নোতি কল্যাণি! কৈবল্যফলসম্পদম্।
সপ্তগোদাবরীতটে দক্ষারামপুরোত্তমে॥
অণুমাত্রস্বর্ণদানং মেরুদানং মৃগেক্ষণে!।
সর্ব্বং স্বাভাবিকং কর্ম্ম মৎসেবানিয়মব্রতম্॥
বচনানি চ সর্ব্বাণি পঞ্চাক্ষরজপস্তথা॥
ভোগমোক্ষনিবাসেঽত্র দক্ষাবাটীমহাপুরে।
মানবানাং নিবসতাং সর্ব্বদা সর্ব্বমঙ্গলে॥

ক্রোড়পত্র ।

শ্রীদক্ষারামমাহাত্ম্যমবাঙ্মনসগোচরম্ ॥
ভীমনায়কদেবস্য দিব্যশ্রীপাদসেবয়া ।
মোক্ষসাম্রাজ্যপদবীমৈশ্বর্য্যং মনোরমে ॥
মহোগ্রপাপকর্ম্মাপি মর্ত্ত্যঃ সমধিগচ্ছতি ।
সমস্তশাস্ত্রসিদ্ধান্তমতান্তরসুসম্মতম্ ॥
ইদং ক্ষেত্রং মহাদেবি ! সদ্যো মুক্তিপ্রদায়কম্ ।
সদ্যো সুজ্ঞানসদনং সদ্যঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধিদম্ ॥
শ্রীদক্ষারামনগরং উত্তমং তীর্থমীশ্বরি ! ।
ত্বয়া সম্প্রার্থিতঃ সম্যক্ কৃপয়া প্রোক্তবানহম্ ॥
ইদমর্দ্ধং ত্বমেতস্মিন্ সাবধানমনা ভব ।
ইত্যুক্তা হৃদয়েশেন সর্ব্বজ্ঞেনেন্দুমৌলিনা ॥
প্রণম্য তং হৈমবতী হর্ষোৎকর্ষমবিন্দত ।
ইদং রহস্যং পরমং শ্রুতং গুরুমুখাৎ ময়া ॥
কথিতং ব্রহ্মবাদিভ্যঃ ভবদ্ভ্যঃ সংযমীশ্বরাঃ ।
শ্রীদক্ষনগরস্থানং সদ্যো মুক্তিপ্রদায়কম্ ॥
মহেশ্বরেণ কথিতং বেদার্থোঽয়ং মনীষিণা ॥
যদ্যস্তি সদ্যো মুক্তীচ্ছা গচ্ছেদ্দক্ষপুরং নরঃ ।
স্যাৎ কালযাপনা চাস্য তীর্থে পুষ্পবনে যথা ॥”